ছাব্বিশ সেল

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

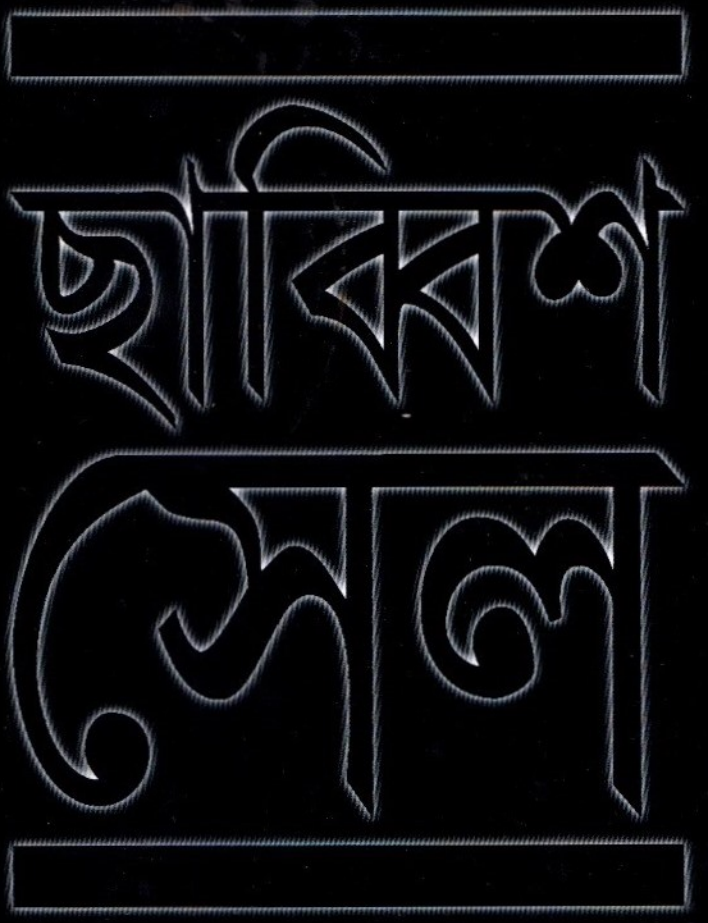

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নির্মিত 'ছাব্বিশ সেলে'র আত্মকাহিনী রচিত হলে শত বর্ষের চাঞ্চল্যকর সব রাজনৈতিক চালচিত্র উদ্‌ঘাটিত হত। ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলেপৃষ্ঠ বহু বন্দি স্বদেশীর নাম কালের স্রোতে আজ মুছে গেছে। ফের পট পরিবর্তনের ধারায় পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্রের কালো হাত বিস্মৃত হতে দেখি। তখনকার দিনে দেশদ্রোহিতার মিথ্যা অভিযোগে শেখ মজিবুর রহমানকে 'ছাব্বিশ সেলে' অন্তরীণ হতে হয়েছিল। শুধু তিনি কেন, বরণীয় ব্যক্তিত্ব তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবুল মনসুর আহমেদ, সত্যেন সেন, ধীরেন দাস, মণিসিংহ প্রমুখ নেতার বাইরেও অসংখ্য রাজবন্দির দীর্ঘ নিশ্বাস ব্যাপ্ত আজও 'ছাব্বিশ সেলে'র প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে।

পশ্চিমা নির্যাতনের কারণে বাঙালি প্রারম্ভেই স্বাধীকার সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিল। তাতে '৫২-র ভাষা আন্দোলন স্পষ্ট রূপ পায়। সেই সময়ের তরুণ স্কুল ছাত্র শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন এই ভাষা চাইতে গিয়েই প্রথম কারাবরণের আস্বাদন পেয়েছিলেন। সেই প্রতিবাদ অক্ষরে অক্ষরে ধ্বনিত হয় তাঁর 'নিত্য-কারাগার' গ্রন্থে। আর 'এখন যৌবন যার, যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়'-এর মতো রাজনৈতিক অজ্ঞানই হয়ে ওঠে মানুষটির প্রধান বিচরণ ভূমি। পরিণতিতে তিনি '৬২-তে এবং পরবর্তীতে পশ্চিমাদের কূটচালে 'ছাব্বিশ সেলে' বারবার কারারুদ্ধ হন রাজবন্দি হিসেবে।

অবশেষে মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে পাকিস্তানিদের পরাজিত করে বাঙালির কাঙ্ক্ষিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা হল। সেদিনেও সংগ্রামী রাজনীতিবিদ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন দেশকে

www.pathagar.com

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে অগ্রপথিকের দায়িত্বই পালন করেন। তৎকালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পক্ষে তাঁর যুক্তিমূলক ভাষণ বিদেশীদের পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছিল। অথচ মুক্তভূমেও ক্ষমতাসীনদের কালো থাবায় স্বাধীনতার অন্যতম এই স্থপতিকে বারেবারে আসতে হয় 'ছাব্বিশ সেলে'র কারাপ্রকোষ্ঠে। একমাত্র দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসী হওয়ার ফলে এই নেতাকে অনেকেই 'জেলবার্ড' নামে আখ্যায়িত করেন। এরই সামগ্রিকতা বিবৃত হয়েছে তাঁর বিশাল রাজনৈতিক গ্রন্থ বলেছি বলছি বলব'তে।

এই বইয়ে তিনি লেখেন : 'জীবন্ত মানুষের কবর যেন জেলখানায়। মানুষ এখানে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকে।' আবার তেমন উপলব্ধ জ্ঞান আত্মস্থ করেই শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন 'ছাব্বিশ সেলে'র মঞ্চে বসে অনেক উপস্থিতির সাক্ষ্যেভরা বহুতর সত্য ছবি আঁকেন। রাজনৈতিকভাবে সংঘটিত হওয়া অসংখ্য সূত্রের সন্ধানই উঠে এসেছে বইটির পাতায় পাতায়।

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন সুবক্তার খ্যাতি পেয়েছেন আগেই। আপন সংগ্রামে তিনি রাজনৈতিক অভিজ্ঞানপুষ্টও হলেন। সেই কথকতার ধার এবং অভিজ্ঞ পদচারণার মিশ্রণেই মূলত 'ছাব্বিশ সেলে'র আত্মপ্রকাশ। পাশাপাশি এই লেখনী আমাদের জাতীয় সত্তার প্রশ্নে পাঠককে নতুনতর বহু রহস্যের অতলে নিয়ে যাবার শক্তি ধারণ করে।

www.pathagar.com

ছাব্বিশ সেল

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছাব্বিশ সেল

শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন

ঐতিহ্য

www.pathagar.com

প্রকাশক
মোঃ আরিফুর রহমান নাইম
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪০৯
ফেব্রুয়ারি ২০০৩

স্বত্ব
রানা ও দিনা

প্রচ্ছদ
মিউচ্যুয়াল গ্রাফিক্স লিমিটেড

বর্ণবিন্যাস
রূপান্তর

মুদ্রণ
কমলা প্রিন্টার্স

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা

CHHABBISH CELL a memoir of prison life by Shah Mouzzam Hossain.. Published by Md. Arifur Rahman Nayeem Oitijjhya. Date of Publication February 2003.

Website : www. Oitijjhya.com

Price : 150.00 US $ 5.00

ISBN 984-776-179-5

www.pathagar.com

সালেহা

রাজনীতির দুর্গম পথে উৎকণ্ঠার জোয়ারে চিরদিন তোমাকে শুধু ভাসালাম। বিড়ম্বিত কারাবাসের অসহনীয় প্রহরগুলোয় তোমার ভালোবাসা, ধৈর্য্য, সাহস ও সান্ত্বনা নতুন আশার আলো জ্বাললো। তারই উৎসারণে লিপিবদ্ধ 'ছাব্বিশ সেল' তোমাকেই অর্পিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দিনভর সেলের বারান্দায় চেয়ার-টেবিল নিয়ে পড়ে থাকি। 'নেই কাজ তো খই ভাজ।' আমার অবস্থা অনেকটা তা-ই। জেলখানার নিরবচ্ছিন্ন অবসরকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছি। টেবিল-চেয়ার রয়েছে, ব্যক্তিগত ক্যাশ থেকে খাতা-কলমও আনিয়েছি। এখন সেখানে আঁকি-বুকি করাই বিবেচনাপ্রসূত। কিন্তু লেখালেখির কাজের সঙ্গে মনের প্রফুল্লতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মন প্রসন্ন থাকার প্রশ্নই আসে না। জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মতো মনের পর্দায় বিষাদের কালোছায়া পরিব্যাপ্ত। ভাবের মাথায় আঘাতে করলেও সে সাড়া দেয় না। তবুও কলম চালাচ্ছি। অন্যকিছু করার নেই। অনেক ভেবেছি, অন্যরা যা করে বা যেভাবে সময় কাটায় তা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। অগত্যা, পারি বা না-পারি চেষ্টা করতে দোষ কী!

অলক্ষ্যে কটাক্ষ শুনি, মহাসাহিত্যের কী হল? নোবেল পুরস্কার পেতে আর কত দেরি?

শুনেও শুনি না। ওদের দোষ নেই। সবসময় বারান্দায় খাতা-কলম নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে দেখাটা বোধহয় দৃষ্টিকটু লাগে। চোখের পীড়ন। মুখে সামান্য ঝাল ঝাড়বে না!

ছাব্বিশ সেলের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ তার বড় টানা বারান্দা। পূর্বে এখানে গ্রিল ছিল না। খোলা বারান্দায় দিনমানে এখানকার বাসিন্দারা একত্রে সময় কাটাত। তাস খেলে, গল্প করে, আড্ডা মেরে, নামাজ পড়ে, তর্ক-বিতর্কের আসর জমিয়ে বারান্দা সরগরম করে রাখত। কখনও সেখানে দ্বিপ্রহরে সকলের একসঙ্গে পঙ্‌ক্তিভোজে বসার আয়োজন করা হত। এখন সম্মুখভাগে মোটা লোহার শিকের অপ্রয়োজনীয় গ্রিল লাগাবার ফলে বারান্দার আকর্ষণ বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। তবুও দিনভর এটিই সকলের অবস্থানস্থল, সেলের বাইরে নিশ্বাস ফেলার স্থান।

দিবাভাগে বারান্দায় বসেই বইপত্র পড়া হয়। কোরান শরিফ তেলওয়াত করা হয়। গাল-গল্প, আড্ডাও চলে। কেউ কেউ যার যার টেবিলে বসে সকালের নাস্তা, দুপুরের ভাত এবং বিকেলের চা খেয়ে থাকে। জোহর এবং আছরের নামাজও জামাতে পড়া হয়। তার পরই সেলে ঢোকার পালা। ফালতুবা চলে যাবে। তাদের লক-আপ কিছুটা পূর্বেই হয়ে থাকে। টেবিল-চেয়ার ঘরে ঢুকিয়ে সমস্ত কাজ-কর্ম চুকিয়ে ওরা যার যার লক-আপে চলে যায়। আমরা চেয়ার নিয়ে তখনও বারান্দায়। কেউ কেউ ছাব্বিশ

www.pathagar.com

সেলের চৌহদ্দির মধ্যে যতটা সম্ভব হাঁটাহাঁটি করে শরীরের জড়তা কাটাবার চেষ্টা করে।

জমাদার মিয়াসাবরা চাবির গোছা নিয়ে ঘোরাঘুরি করে, সাহেবরা সেলের মধ্যে প্রবেশ করলেই দরজায় তালা মেরে ওরা নিশ্চিন্ত। দিনের মতো কাজ শেষ। এখন বদলি না আসা পর্যন্ত রাজা-উজির মেরে পরচর্চা-পরনিন্দায় খোশহালে সময় ক্ষেপণ করা যাবে।

বারান্দার নিচে কিছুটা বাগান করার স্থান রয়েছে। অনিচ্ছুক কয়েদি-বাগানিদেরকে দিয়ে এ জায়গায় বিভিন্ন মৌসুমি ফুলের গাছ লাগাবার চেষ্টা করা হয়। অনেক সময়ই বেড তৈরি এবং বাগান প্রস্তুত করার মধ্যে দীর্ঘ বিরতি প্রত্যক্ষ করা যায়। ফুল ফোটার সময়ের চাইতে বিরতির কালই দীর্ঘতর। কার বা গোয়াল, কে-বা দেয় ধোঁয়া!

তবে আমার একটা সুবিধা আছে। ছাব্বিশ সেলের একমাত্র জবাফুল গাছটি আমার কক্ষের সম্মুখভাগে অবস্থিত। গাছটি বেশ বড় এবং অনেক ফুল ফোটে। অন্য কাজের খবর নেই। এই গাছটি কাটছাঁট করার জন্য প্রায়ই কয়েদি আর মিয়াসাবদের যৌথ আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অন্য সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ থাকলেও এই গাছটিতে আমি সহজে ওদের হাত দিতে দিই না। যখনই ওরা দা-কাচি প্রভৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়, আমার প্রবল বাধার সম্মুখে টিকতে না পেরে সহাস্যে পশ্চাদপসরণ করে।

গাছটির গোটা দুই ডাল শিক গলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তারা ফুলও ফুটিয়েছে। আমি সকলকে ডেকে ডেকে দেখাই, আমার প্রাকৃতিক ফুলদানি দেখে যান।

পুলিশের সহকারী কমিশনার, রুবেল মার্ডার কেস বলে খ্যাত মামলার অভিযুক্ত আকরাম সাহেব, সময়ে সময়ে এসে ডালগুলোকে বিন্যাস করে আমার ঘরমুখী করে দিয়ে যায়। বারান্দায় হাঁটাহাঁটির সময় ফুলগাছটির এই অনুপ্রবেশে সেও উদ্দীপ্ত। বলে, স্যার, আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি। প্রকৃতি আপনার ফ্লাওয়ার-ভেসের ব্যবস্থা করেছে।

তার কথা শুনে হাসি। ভাগ্যবানই বটে। আজ দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতার উন্মাদনায় মত্ত এক মহিলার ক্রোধানলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যূপকাষ্ঠে বলি হয়ে কারা-নির্যাতন ভোগ করছি। এটা নাকি একটা সভ্যদেশ! এই দেশের তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান, উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত ক্ষমতাধর প্রধানমন্ত্রী বিদেশ থেকে পিঠ-চুলকানো শান্তি পদক, পড়শি দাদাদের অনুকম্পায় 'দেশি কুত্তম' উপাধি লাভে বেসামাল। তার তর্জন-গর্জনে টেকা দায়। নির্লজ্জ খোসামদের প্রতিদানে, অপর্যাপ্ত লবিইংয়ের ফলশ্রুতিতে ও তদবিরের ফলে একটি অর্থহীন হাস্যাস্পদ খেতাব বা পুরস্কার সংগ্রহের উদ্যোগ-আয়োজনের অবিশ্বাস্য বাড়াবাড়িতে বিদগ্ধজনের লজ্জার অবধি নেই।

www.pathagar.com

কথায় বলে, কর্তা বলেছে শালার ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই। বড় দেশের বড় কর্তাদের সানুগ্রহ-আশীর্বাদস্বরূপ এইসব শিশুতোষ পুরস্কারলাভের সংবর্ধনায় বেসামাল নর্তন-কুর্দন দেখে সুধীজন হতবাক।

অত্যাচার আর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার মাথায় কুঠারাগাত করে, সরকারি সন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিদিন ভিন্ন মতাদর্শীদেরকে শায়েস্তা করে, জেল-জুলুম, মামলা আর হামলায় বিরোধীদের কোণঠাসা করে, কথায় কথায় অস্ত্রধারী দলীয় মাস্তান লেলিয়ে হত্যা, ছিনতাই ও নারী-নির্যাতনের রেকর্ড সৃষ্টি করে, শাসনযন্ত্রের যদেচ্ছা অপব্যবহার ও পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারি বাহিনীর দ্বারা যত্রতত্র লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও বেয়োনেট চার্জ করে এবং সর্বোপরি বেপরোয়া গুলিবর্ষণের মাধ্যমে অহরহ নিরীহ জনসাধারণকে অপরিসীম নির্যাতন করার পুরস্কারস্বরূপ ধামাধরা উদ্যোক্তাদের শান্তি পদক প্রদান শান্তির প্রতি উপহাস প্রদর্শনের নামান্তরই কেবল নয়, সত্যিকারের শান্তি-প্রচেষ্টার প্রতি এক চরম অবমাননাকর প্রহসনও বটে। রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় সন্ত্রাসের প্রধান উদ্যোক্তা বলে পরিজ্ঞাত, অস্ত্রধারী ক্যাডারদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ের নির্ভরযোগ্য ভরসাস্থল দলীয় প্রধান বা সরকার-প্রধানকে দেয় এইসব পুরস্কার আর খেতাব শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনগোষ্ঠীর পৃষ্ঠে পদাঘাতেরই শামিল।

এমনই এক মহিলার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে দীর্ঘকাল এক নির্জলা মিথ্যা অভিযোগে আমাদের মতো মানুষদের এই বয়সে কারাগারে নিক্ষেপ করা সকল সভ্যতা-ভব্যতার প্রতিই কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন নয়, একক ও সীমাহীন ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্তহীন ঘৃণ্য উদাহরণও বটে।

যখন ভাবি, এদেশটি স্বাধীন করার জন্য সেই স্কুল জীবন থেকেই জীবনের সর্বাত্মক ঝুঁকি নিয়ে একের পর এক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও একতিল পিছপা হইনি, সারাজীবন জেল-জুলুম, অত্যাচার সহ্য করে হাতে অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে সমর্থ হই, সেদেশেই আমাদের কী চমৎকার সকৃতজ্ঞ প্রতিদান। দেশের স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতিদের প্রতি ক্ষমতাসীনদের কী চরমতম অবমাননা! আমরা যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ করি তখন কোথায় আজকের প্রধানমন্ত্রী! লোকে বলে, সন্তান উৎপাদনের কর্মে নিয়োজিত থাকা ছাড়া সেদিন তার আর কিছু করণীয় ছিল না। লাখ লাখ মানুষ যখন জীবন দিয়েছে, সম্পদ, সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছে তখন তাদের ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য। বাবা পাকিস্তানিদের জেলখানায় পাইপ টানছে, মা এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা পাকিস্তান সরকারের সযত্ন হেফাজতে তাদের ভরণ-পোষণে ঢাকায় বহাল তবিয়তে দিনাতিপাত করছে। মহানন্দে

www.pathagar.com

স্বামীসঙ্গ ভোগ করা ছাড়া যার আর কোন অবদান ছিল না সেই মেয়েমানুষটিই আজ পৈতৃকসূত্রে বাংলার মসনদে সমাসীন। মলমূত্র ত্যাগই যার একমাত্র ত্যাগ। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা!

আমরা কেন তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে 'আহা বেশ বেশ' করি না, আমরা কেন ভিন্ন রাজনৈতিক দল গঠন করি, সেদিনের সেই অরাজনৈতিক মেয়েটির রাজনৈতিক উত্তরাধিকারে কেন দ্বিমত পোষণ করি! প্রথম সুযোগেই আমাদেরকে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করা আশু কর্তব্য। দেশ স্বাধীন করেছে, তাতে কী হয়েছে? এখন সেই স্বাধীন দেশের কারাগারেই জীবনপাত হোক।

রাজনীতি করি, জেলখাটায় চিরঅভ্যস্ত। কিন্তু এবারের জেলখাটার সঙ্গে যে নিদারুণ অপমান জড়িয়ে আছে তার কোন তুলনা হয় না। সে নিজেও জানে এবং সারা পৃথিবীর মানুষ জানে কারা জেলখানায় প্রবেশ করে চার জন স্বাধীনতা যুদ্ধের শ্রেষ্ঠতম নায়ককে হত্যা করে যায়। সে হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আমরা সেদিন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করি। শুধু তা-ই নয়, আমরা এত বছর ধরে প্রতিটি সভা-সমাবেশে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে এসেছি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আমরাই সে মামলায় আজ অভিযুক্ত। অপরাধ কী? নিশ্চয়ই ওরা খুনিদের সঙ্গে সঙ্গোপনে কথা বলেছিল, কানাকানি করেছিল। সাক্ষীও যোগাড় হয়ে যায়। সেদিনের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমাদেরকে নাকি কথা বলতে দেখেছে বঙ্গভবনের টি-বয় বা খেদমতগার!

মা ধরণী তুমি দ্বিধা হও, আমি লাফ দিয়ে গাছে উঠি! সেদিন বঙ্গভবনে আমাদের থাকার প্রশ্নই আসে না। তবুও যুক্তির আলোকে বিশ্লেষণ করলে যদি আমাদেরকে সেখানে দেখাও যায়, সেটা কি অপরাধ? রাষ্ট্রপতির সাথে মন্ত্রীদের কথা বলা অপরাধ? তিন জন প্রতিমন্ত্রীকে ধরেছেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা যে সেখানে উপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করেছে তারা অপরাধী নয় কেন? দায়ী নয় কেন? রাষ্ট্রপতির সর্বাক্ষণিক সঙ্গী তাঁর দক্ষিণ হস্ত উপরাষ্ট্রপতি বা তাঁর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বা অন্য উপদেষ্টামণ্ডলী দায়ী নয় কেন?

তারা আওয়ামী লীগ করে। তারা তাকে নেত্রী মানে। কাজেই তারা নিরপরাধ। এই তিন জন মানে না কেন? এরা নিশ্চয়ই অপরাধী! এদের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে কী? হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ওদেরকে গ্রেপ্তার করো। ওদের বড় বাড় বেড়েছে। টিট করতে হবে। আমার নেতৃত্ব মানে না, এত বড় আস্পর্ধা! সুযোগ পেলে আমি ওদের জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম। ক্ষমতামদমত্ত মহিলার সেকী আস্ফালন! ওদের অবিলম্বে জেলে ঢুকিয়ে দাও। জামিন? কক্ষণও নয়। এদেশে বিচার বিভাগ প্রতিপদে সরকারের উপর নির্ভর। প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে যেভাবেই হোক সেটা ঠেকিয়ে রাখা যাবে। ন্যায়-নীতি? বিচার বিভাগের

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতা? সভ্যতা, ভদ্রতা, বিবেচনা? ওসব ভুলে যাও। এটা আওয়ামী সরকার। তাই '৯৮-তে গ্রেপ্তার হয়ে আজ ২০০০ সালেও হাজতবাস করছি। ভাগ্যবান বৈকি!

আকরাম সাহেব নিজেও কম ভাগ্যবান নয়। একজন সফল পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য চারবার রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্ত এই অফিসার আজ ভাগ্যের কারণেই হত্যা মামলার আসামী হিসাবে বিচারাধীন।

জবাগাছটিকে যতই দেখি, সৃষ্টির মৌলিক চিন্তা মনকে ততই নাড়া দেয়। মানুষ কত কী আবিষ্কার করছে, কত কী নির্মাণ-বিনির্মাণ করছে! কত সূক্ষ্ম মারণাস্ত্র তৈরি করছে। আন্ত-মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বহু পূর্বেই তারা প্রস্তুত করেছে। অ্যাটম বোম, হাইড্রোজেন বোম, নাপাম বোম, গ্যাস বোম কত কি তৈরি করেছে। চন্দ্রগ্রহে সফল অভিযান শেষে মঙ্গল গ্রহে পদার্পণের পাঁয়তারা করছে। এত ক্ষমতাধর মানুষকে কিন্তু কোনকিছু সৃষ্টির ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। সৃষ্টিকর্তা একজনই। পবিত্র কোরান মহাগ্রন্থের পাতায় পাতায় বলা হয়েছে, আসমান এবং জমিনে যা-কিছু আছে সবকিছুর নিয়ন্তা সেই বিশ্বপিতা। তিনিই একক খালেক, সৃষ্টিকর্তা। একটি গমের দানা, একটি চাল বা যে-কোন শস্যকণা, একটি টমেটো বা সামান্যতম শাক-সবজিও মানুষ প্রস্তুত করতে সক্ষম নয়। সৃষ্টিবিনাশের নব নব কৌশল আবিষ্কার সম্ভব, অত্যাশ্চর্য কলকবজা তৈরি করে প্রকৃতির লীলাখেলার এই পৃথিবীকে জটিল থেকে জটিলতর করে ফেলা সম্ভব, কিন্তু একটি খাদ্যকণা উৎপাদনের সামর্থ্য তাদের কস্মিনকালেও হবে না। এক খাদ্য থেকে সহস্র প্রকারের খাদ্য প্রস্তুতে তারা সক্ষম কিন্তু মূল জিনিসটির সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং বিধাতা এককভাবে বিরাজমান। সেখানে তাঁর কোন অংশীদারের প্রশ্নই আসে না। সবচাইতে নিকৃষ্ট একটি শস্যকণাও এত প্রতাপশালী মানুষের প্রস্তুতের ক্ষমতাবহির্ভূত। সৃষ্টিকর্তার এই একক মাহাত্ম্য যতই চিন্তা করা যায়, মনে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

শত কোটি মুদ্রা ব্যয় করেও এমনি একটি সামান্য জবাগাছ কোন ক্ষমতাধর মানুষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। গাছ দূরের কথা, তার একটি বীজ সৃষ্টি করাও সম্ভব নয়। সে নিজেই সৃষ্ট, সৃষ্টির ক্ষমতা কোথায় পাবে! সৃষ্টিকর্তার কী অপার মহিমা! বৃক্ষের মূল একপ্রকার, কাণ্ড অন্য প্রকারের। তার রং-রূপ-রস সবই পৃথক। পাতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফুলটি কত সৌন্দর্যমণ্ডিত! ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে কেবল সেই পরম শক্তিমান মহা-বিজ্ঞানী ও মহাকুশলী বিশ্বস্রষ্টার অসামান্য কর্মনিপুণতার কথা ভেবে অধিকতর আশ্চার্য্যন্বিত হতে হয়। মানুষ তার আবিষ্কারের কত দম্ভ করে থাকে। সৃষ্টিকর্তার সামান্যতম সৃষ্টির মোকাবেলায় তার অহমিকা যে কতটা হাস্যাস্পদ, নিবিড় চিন্তায় তা সম্যক উপলব্ধিতে আসে। তৃণভোজী চতুষ্পদ

www.pathagar.com

জন্তুর শরীরে রক্ত-মাংস, মলমূত্র এবং একই সঙ্গে মানুষের আদর্শ খাদ্য, সুপেয় পানীয় দুধও প্রস্তুত হচ্ছে। সবই তাঁর লীলা!

জবা গাছটির জন্যই কি না জানি না, আমার সেলটি চড়ুই পাখিদের প্রায় অভয়ারণ্য। ফুলগাছটির শাখায় বসে একগাদা পাখি সারাক্ষণ কিচিরমিচির করছে। সময়ে-অসময়ে ফুড়ুত করে আমার সেলের অভ্যন্তরে ঢুকে যাচ্ছে। সারাদিন এদের আনাগোনার বিরাম নেই। ভিতরে কড়িবর্গার ফাঁকফোকরে তারা বাসা বেঁধেছে। বাচ্চা দিয়েছে। শিশু চড়ুইয়ের শ্রান্তিহীন ডাকাডাকি লেগেই আছে। পাখিদের পারিবারিক বন্ধনের বৃত্তান্ত জানি না। কিন্তু অনেকগুলো পাখিই আমার ঘরে ছুটে ছুটে আসে। মুখে কখনও সামান্য আহার, আবার কখনও ঘরবাঁধার খড়কুটো। সর্বক্ষণই কি এরা ঘর বাঁধে! এক বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য দল বেঁধে যাতায়াত করে! হয়ত তা-ই হবে। নতুবা অন্য ঘরে তাদের উপদ্রব নেই কেন? সারাক্ষণ আমার ঘর নষ্ট করছে। তাদেরকে যে এত ঘনঘন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয় জানা ছিল না। আমার ঘরের কাপড়চোপড় এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তাদের মলত্যাগে বিনষ্ট হচ্ছে। সেদিন নামাজান্তে মোনাজাত করছি, দুই হাতের মধ্যে অপকর্মটি করে দিল। জামাকাপড় প্রায়ই বারবার ধুতে হচ্ছে। ফালতু রাগ করে, কিন্তু করার কিছু নেই। তার রাগে ওদের কিছু যায় আসে না। সে বলে, স্যার বাসাটা ভেঙে দিই, তা হলে এদের অত্যাচার কমবে।

সম্মত হতে পারি না। আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় ওদেরও স্থান আছে। আমি এই ঘরের মালিক নই। অস্থায়ী অতিথি—আজ আছি, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম হলে কাল চলে যাব। ওদের বাসস্থান ভাঙার আমার অধিকার নেই। তা ছাড়া বাচ্চা রয়েছে, কোথায় যাবে, কী করবে! বাসা ভাঙার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারি না।

সে একটা পুরনো মশারির কাপড় যোগাড় করে এনে আমার ঘরের লোহার শিকের দরজায় লাগিয়ে দেয়। পিছনের দরজা বন্ধ করে দিলে আর ঢোকার সাধ্য নেই। দিনকয়েক দেখলাম। ভিতরে রাত্রি-দিন বাচ্চাটির আহাজারিতে ঘরের আবহাওয়া বিষণ্ন। বারান্দার কাপড় শুকাবার তারে এবং জবাগাছের ডালে বসে বাচ্চার পিতা-মাতা এবং তাদের গোষ্ঠী-জ্ঞাতির চিৎকার-চেঁচামেচিতে টেকা দায়।

একসময় মনে হল, কাজটা নিষ্ঠুরতার পর্যায় পড়ে। ঘরে ঢোকার জন্য ওদের সেকী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা! কখনও একা, কখনও জোড়ে আবার কখনও দল বেঁধে উড়ে আসে। কিন্তু মশারির নেটের কারণে ভিতরে প্রবেশের সুযোগ পায় না। সামনের তারটিকে আশ্রয় করে অনর্গল আমাদের উদ্দেশে তারস্বরে অভিযোগ জানাতে থাকে। কিচিরমিচিরের মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়।

ফালতুকে বলি, দরজা খুলে দে, নেট অপসারণ কর। সন্তানের জন্য

www.pathagar.com

আমাদের যেমন স্নেহ-মমতার অবধি নেই, পাখিদের ক্ষেত্রেও হয়ত সেকথা প্রযোজ্য। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেও অফুরন্ত অপত্যস্নেহ প্রদানে কার্পণ্য করেননি। দরজা সারাক্ষণ খুলে রাখার ব্যবস্থা করলাম। ওদের আনন্দ ধরে না। দল বেঁধে উড়ে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। ওদের বিজয় সূচীত হয়েছে। পিতা-মাতার স্নেহের দাবির কাছে মানুষের নিষ্ঠুরতা হার মেনেছে। কখনও দুই পাখিতে বা দুই দলে তুমুল বিবাদ বেধে যায়। মারামারি করতে করতে তারা বারান্দা বা ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। একসময় ক্ষান্ত দিয়ে আবার ফুড়ুত।

আমার নাকের ডগায় তারের উপর বসে অবিশ্রান্তভাবে মলত্যাগেও তাদের বিরাম নেই। আশ্চর্য ব্যাপার! তারটি জেল কর্তৃপক্ষই টানিয়েছে। বারান্দার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত লম্বা। বারোটি সেলের বাসিন্দাগণ এতে তাদের বস্ত্রাদি মেলতে পারে। অন্য কোথাও তারা যাচ্ছে না। আমার ঘরের সম্মুখের তারটিকে আশ্রয় করেই তারা সারাক্ষণ এ কাজটি সারছে। কেন তাদের এ স্থানটি পছন্দ হল জানি না। কিন্তু এটি প্রায় তাদের পাবলিক টয়লেটে পরিণত হয়েছে।

ফালতুর কাজ বেড়েছে। দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার সেসব পরিষ্কার করতে হচ্ছে। স্বভাবতই তার বিরক্ত হবার কথা। কিন্তু আমার কারণে কিছু করতে পারে না। এর পূর্বে যে ফালতুটি ছিল, সে একদিন একটি পাখি মেরে বিড়ালকে খেতে দিয়েছিল। তার উপর অতিশয় রাগান্বিত হয়েছিলাম। সকলেই তা জানে। তাই এখন আর বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না।

অনেক সময়ই আমি ওদের কাণ্ডকীর্তি লক্ষ্য করি। চড়ুই পাখিরা খুবই কামুক। প্রতিদিনই তারা ডালে এসে পাশাপাশি স্থান করে নিয়ে ভাব-ভালোবাসায় লিপ্ত হয়। পুরুষ পাখির গলার কাছে কালো বর্ডার। মেয়েগুলো অপেক্ষাকৃত সুশ্রী ও ছিমছাম। এক পর্যায়ে পুরুষটি তার প্রস্তাব রাখে। মেয়ে পাখিটি স্বভাববশত প্রথমে নিরাসক্ত থাকার ভান করে। পুরুষটির শৃঙ্গার প্রচেষ্টায় সঙ্গিনীকে প্রলুব্ধ করার প্রয়াসের অভাব নেই। সঙ্গিনীর মন জয় করতে প্রচুর সময় ক্ষেপণ করে। মেয়ে পাখিটির যে আগ্রহের কমতি নেই তা দেখেই প্রতীয়মান হয়। তার ইচ্ছা না থাকলে সে উড়ে চলে যেতে পারত। কিন্তু সে যাচ্ছে না। পাখা ছড়িয়ে, ঠোঁট নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে, আওয়াজ দিয়ে দিয়ে সে সঙ্গীকে প্রলুব্ধ করছে। কিন্তু সহজে ধরাও দিচ্ছে না। অভিজ্ঞজনরা অবহিত, মানবকুলেও একই রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

উজ্জীবিত সঙ্গী বারবারই তার প্রেয়সীর কাছে প্রেম ভিক্ষা করছে, রতি প্রার্থনা করছে। কিন্তু ছলনাময়ী সঙ্গিনীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে নির্বিকার। সঙ্গী লাফিয়ে লাফিয়ে তার উপর উঠে আসছে, কিন্ত সঙ্গিনীর সহযোগিতার অভাব। সে নিজেকে তুলে ধরছে না। সঙ্গীরও ক্লান্তি নেই।

www.pathagar.com

একবার-দু'বার বহুবার সে এগিয়ে আসছে। সঙ্গিনীর উপর চড়ে বসছে, কিন্তু অপরপক্ষ গ্রীবা উঁচিয়ে সঙ্গীকে তাকিয়ে দেখা ছাড়া অন্যকোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। পুরুষটি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে সফলতা অর্জন করতে না পেরে একসময় অভিমানে বেশ দূরে গিয়ে অবস্থান নেয়। তার পৌরুষে আঘাত লেগেছে। এবার সঙ্গিনীর টনক নড়ে। হয়ত সময় হয়েছে। এখন দুয়ার খুলে দেওয়া যায়। রমণের সময় আসন্ন। সে প্রণয়-প্রবৃত্ত হয়ে সঙ্গীর দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করে অনেক উত্তাপ ছড়িয়ে তাকে আহ্বান করে। কেবল ঠোঁটের কিচির-মিচিরই নয়, মাথা নেড়ে, গ্রীবা সঞ্চালন করে মোহময় ভঙ্গীমায় সে এবার সাথীকে সপ্রেম আহ্বান জানায়। কিন্তু বারবার প্রত্যাখিত সঙ্গীর অহমিকায় লেগেছে, তার আত্মশ্লাঘা জেগে উঠেছে। সে এগিয়ে যায় না, সাড়া দিতে সময় নেয়।

মেয়ে পাখিটি আরও বেশি করে মোহ বিস্তার করে। নানা অঙ্গভঙ্গি করে সাথীকে কামোন্মাদনায় আপ্লুত করে তোলে। পুরুষ পাখিটি আর ধৈর্য ধরতে পারে না। তার অভিমান তিরোহিত হয়ে যায়। এক লম্ফে সঙ্গিনীর উপর চেপে বসে। এবার আর তাকে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। তার প্রচেষ্টা সার্থক হয়। হাসিমুখে মেয়ে পাখিটি তার পশ্চাৎভাগ তুলে ধরে। সাথী তার কাজ সেরে দ্রুত নেমে আসে। তার বিশেষ সময় ক্ষেপণ হয় না। পূর্ব থেকেই সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত ছিল।

কার্য শেষ। ডালে বসে দু'জনই বিনা জলে স্নান করে নেয়। বাতাসে শরীর ঝেড়ে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। দু'জনই তৃপ্ত, আনন্দিত। গাছের ডালে ঠোঁট ঘষা, শরীর দোলানো দেখেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দিনের মধ্যে একাধিকবার আমাকে তাদের এই মিলনপর্বের নীরব সাক্ষী হতে হয়। অনেক সময় মনে করি, তাকাব না। কিন্তু নিজের অজান্তেই সেদিকে চোখ চলে যায়। মানবকুলের মিলনপদ্ধতির সঙ্গে প্রথাগত খুব একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণত মানুষ যা রেখে-ঢেকে করে, ওরা তা প্রকাশ্যে সমাধা করে—এইটুকুই তফাত।

আধুনিক বিশ্বের অনেক সুসভ্য ও উন্নত দেশে কেবলমাত্র ব্যবসায়িক কারণে মানবসমাজের এই একান্ত গোপনীয় বিষয়টিকে যেভাবে প্রকাশ্য প্রমোদানুষ্ঠানে রূপান্তরিত করে বাজারজাত করা হয়েছে তাতে পক্ষীকুলের সঙ্গে সৃষ্টির সেরা জীবের খুব একটা প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোন সময় একটি পাখি একা-একাই তারের উপরে বসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুটি চক্ষু দিয়ে অভিনিবেশ সহকারে আমাকে পর্যবেক্ষণ করে। তারও হয়ত বুঝে আসে না, লোকটি বারান্দায় বসে সারাক্ষণ কী করছে! আমি যেমন তাকে দেখি, সেও অবাক দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। কখনও মুখে কী শব্দ করে, বুঝি না। তবুও সবিনয়ে নিবেদন করি, আমার কোন ত্রুটি হলে বলুন, সংশোধন

www.pathagar.com

করছি। আসুন নির্বিবাদে ঘরে ঢুকুন, অপেক্ষা কিসের? মনের আনন্দে নিজেকে ভারমুক্ত করুন। আপনার টয়লেট প্রস্তুত।

সে অবিশ্বাস্য ভঙ্গিতে এদিক-সেদিক দেখে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। আমাকে ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে পুনরায় ফুড়ুত করে উড়ে যায়।

ছাব্বিশ সেলের একটা বিশেষত্ব আছে। সারাদেশে যেমনি ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের পৃথক মর্যাদা, ঢাকা জেলখানার মধ্যেও এই সেলটির একটি স্বকীয় মূল্য রয়েছে। ছাব্বিশ সেলের অধিবাসীরা জেলখানার অন্যান্যদের ঈর্ষার পাত্র। ছাব্বিশ সেল মানেই একটা বিশেষ মর্যাদা। শুধু এখন নয়, বহুকাল থেকেই স্বীকৃত। এই ভবনটির বয়স প্রায় শ' বছর ঘনিয়ে এল। নির্মিত হওয়ার পর থেকেই এটি ডিভিশনপ্রাপ্তদের আবাসস্থল। ইংরেজ আমলে এখানে স্বদেশীদের আনাগোনাই ছিল অধিকতর। তাদের মধ্যে সেসময় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হত। জেলের পরিভাষায় 'ছিরকুটি বাবু' অর্থাৎ সিকিউরিটি আইনে বন্দি বাবুরা এখানে মূলত অবস্থান করত।

পাকিস্তানি শাসনামলের প্রথম দিকেও একই নামে ডাকা হত। ধীরে ধীরে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে বাবুর স্থলে সাব বলে সম্বোধন করা হত। কয়েদি এবং স্বল্পশিক্ষিত কারারক্ষীদের মুখে-মুখে এভাবেই শব্দচয়ন হত।

আমার প্রথম কারাগারে আসা '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে। তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। শতাধিক ছাত্রের সাথে সেবারের কারাবাস ছিল নতুন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, উত্তেজনায় ভরপুর। ছাব্বিশ সেলের সন্নিকটেই শকুন তলার চার নম্বরে আমাদের রাখা হয়েছিল। তখনই শুনতে পাই, জেলখানার অভিজাত বন্দি তথা রাজবন্দিরা বসবাস করে ছাব্বিশ সেলে। রাজার বন্দির নাম রাজবন্দি। রাজা বা রাজ্য না থাকলেও গালভরা রাজবন্দি নামটি ঠিকই চালু রয়েছে। সেখানে তখন আমাদের ঢোকার সুযোগ ছিল না। ভাবতাম, জেলখানায় সেলের সংখ্যার অনুসারে যেভাবে নাম রাখা হয়, এখানে নিশ্চয়ই ছাব্বিশটি সেল রয়েছে। তাই হয়ত এর নাম ছাব্বিশ সেল। কিন্তু পরে যখন এখানে এসে থাকার সুযোগ ঘটল তখন প্রত্যক্ষ করলাম বারোটি কক্ষবিশিষ্ট এই সেলের নাম ছাব্বিশ সেল হওয়ার মাত্র একটিই যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে, হয়ত এখানে ছাব্বিশ জন লোক রাখার ব্যবস্থা থাকার কারণে এর নাম ছাব্বিশ সেল হয়েছে।

www.pathagar.com

এক নম্বর এবং বারো নম্বর রুম দুটি সেলের সর্ব পূর্বে ও সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত। অন্য কক্ষগুলোর চাইতে সামান্য প্রশস্ত বিধায় এই সেল দুটিতে তিন জন করে স্থানসঙ্কুলান করা যায়। অন্য সব রুমে দু'জন করে। সে কারণে এটি ছাব্বিশ সেল।

এখন অবশ্য জেলখানা বিস্তৃতি লাভ করেছে। বসবাস করার লোক যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সে পরিমাণে না বাড়লেও এখানে অনেক নতুন ভবন নির্মিত হয়ে ঢাকা জেলের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও কয়েকটি স্থানে ডিভিশনপ্রাপ্তদের রাখার ব্যবস্থা থাকলেও, তাদের আদি বাসস্থান হিসাবে ছাব্বিশ সেলই চিহ্নিত। অতি পুরাতন ভবনের ছাদ ফেটে বৃষ্টির পানি পড়ে, দু'-একটি রুমের বিম খুলে গেছে। বাসযোগ্য রুমে একজন করে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। মাঝে মাঝেই গণপূর্ত বিভাগের লোকজন এসে দেখে যায়। সেই ছোট সময় থেকেই শুনে আসছি, এটি ভেঙে নতুন করে নির্মিত হবে। বৃদ্ধ হয়ে পরকালে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, এটা পূর্ববৎই আছে। অধুনা কক্ষগুলোর অভ্যন্তরে টয়লেট ও গোসলের ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে। ছোট্ট কক্ষের এক প্রান্তে এসবের ব্যবস্থার দরুন এখন একজনের বেশি বাস করা সম্ভব নয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি থাকার সময় প্রথম যেবার এখানে আনা হয় তখন আমাদেরকে দিবাভাগে সম্মুখের শেডে বাথরুম সারতে হত। রাতে প্রতি ঘরে একটি টিনের টুকরি দিয়ে দেওয়া হত। জরুরি প্রয়োজনে ঘরের কোনে রক্ষিত সে টুকরিতে কাজ সারার ব্যবস্থা। সাথীরা তখন বিছানায় চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত বা বন্ধ দরজায় শিক আঁকড়ে দাঁড়িয়ে নাক-মুখ ঘুরিয়ে রাখত।

প্রথম যেবার এলাম, আমাদের পাঁচ জনকে পাঁচটি সরু ও নিচু লোহার কট দিয়ে এক নম্বর ঘরে স্থান করে দেওয়া হয়। '৬২-র সফল ছাত্র আন্দোলনের পর আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য সরকার হন্যে হয়ে পড়েছিল। হুলিয়া জারি করে, গেজেট নোটিফিকেশন করে হুলস্থুল কাণ্ড।

আন্দোলন করলাম আমরা ছাত্ররা। ভিতরে এসে দেখি অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিকে সে অজুহাতে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। তারা নাকি ছাত্রদের প্ররোচিত করেছিল। ছাত্রদের সে আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে আমার ভালো করেই জানা ছিল, তাদের প্ররোচনা দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। উপরন্তু আমরাই তাদের রাজনৈতিক স্থবিরতা কাটিয়ে উঠে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করতাম। তাদেরকে ছাত্র-আন্দোলনের পটভূমিকায় পরিপূরক দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেতাম। বস্তুত সে আন্দোলনে ছাত্রসমাজের বহির্ভূত কোন দল বা ব্যক্তির তেমন কোন ভূমিকা ছিল না।

কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে দেখি ঠাঁই নেই। সরকারের আমলারা নিজেদের

www.pathagar.com

ইচ্ছামাফিক ছাত্রদের সাথে সম্পৃক্ততা আবিষ্কার করে অনেককেই ধরে এনেছে। দেখে আমরা হেসে বাঁচি না। বাসায় গেলে এরা অনেকে আমাদের সাথে দেখা করতে দ্বিধা করত। সে ধরনের নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিদেরকে ধরে এনে জেলখানার ঘর ভর্তি করা হয়েছে।

আমি এবং শেখ ফজলুল হক মনি একসঙ্গে গ্রেপ্তার হই। মনি তখন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। দু'জন ভিতরে প্রবেশ করে দেখি আসর জমজমাট। বিকেলবেলা আমাদেরকে আনা হয়। তখন ছাব্বিশ সেলে ভলিবল খেলা হচ্ছিল। শেখ মুজিবর রহমান লম্বা মানুষ, নেটে খেলছিলেন। আমাদের দেখে খেলার বিরতি হয়ে গেল। আমরা দু'জন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে সালাম করলাম। তিনি আমাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সহাস্যে বললেন, তোরা কীসব ঝামেলা বাধালি আর এই বেচারাদেরকে ধরে এনে জেলে পুরে দিয়েছে।

আমি আর মনি দৃষ্টিবিনিময় করি। এদেরকে আমাদের আন্দোলনের কারণে গ্রেপ্তারের কী হেতু থাকতে পারে! অবাক কাণ্ড!

বারান্দায় বসে যারা খেলা দেখছিল তাদের মধ্যে জনাব আবুল মনসুর আহমেদ, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, কফিলউদ্দীন চৌধুরী প্রমুখকেও দেখতে পেলাম। কোরবান আলী, শফিউদ্দীন আহমেদ, সত্যেন সেন, ধীরেন দাস, ওজিউদ্দীন, কামাল লোহানি প্রভৃতি আমাদের পূর্বপরিচিতেরা ব্যতিরেকেও অনেক অপরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। তারা হয়ত স্বীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য খ্যাত, কিন্তু আমাদের আন্দোলনের সঙ্গে তাদের কী সম্পর্ক বোধগম্য হল না। বিক্রমপুরের যে তিন জনকে আনা হয়েছে তাদের মধ্যে জনাব শফিউদ্দীন আহমেদ মফস্বল সাংবাদিকতা এবং সম্ভবত কমিউনিস্ট পার্টিতে কিছুটা সক্রিয়। কিন্তু কফিলউদ্দীন চৌধুরী ও কোরবান আলী সেসময় সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন না। দু'জনই ওকালতি করছিলেন। চৌধুরী সাহেব সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতি করতেন না, কৃষক-শ্রমিক পার্টিতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কোরবান আলী আওয়ামী লীগের একসময় সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন, পার্লামেন্টারি পার্টির হুইপ ছিলেন। সেসময় তিনি দীর্ঘদিন ধরে নীরব। কোন কর্মকাণ্ডে উপস্থিত থাকতেন না। কিন্তু এখানে তাকে ঠিকই দেখা গেল। মুজিব ভাইয়ের সঙ্গে বারো নম্বর ঘরে সে থাকে। মুজিব ভাই তখনও বঙ্গবন্ধু হতে অনক বিলম্ব। তিনি বললেন, কোরবান, এখন থেকে মোয়াজ্জেমের সবকিছু তুই দেখবি। তুই তার দেশি মানুষ এবং মুরব্বি।

সে সঙ্গে সঙ্গে সোৎসাহে দায়িত্ব গ্রহণ করে। ভালোই দেখেছিল! সে অন্য কাহিনী। সেসবের উল্লেখ অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক।

www.pathagar.com

ছাত্রলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতা-কর্মীকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। এক নম্বর কক্ষে আমরা তখন পাঁচ জন থাকি। আমি, মনি, মীর হোসেন চৌধুরী, মঞ্জু এবং আরও একজন। তার নাম এখন স্মরণে আসছে না।

রাজনীতিক এবং সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদের সঙ্গে তার পুত্র দারাকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়। পিতা-পুত্র একঘরে থাকে। দারা অতি প্রাণবন্ত হাসিখুশিভরা নবীন যুবক। কারারুদ্ধ পিতাকে পরিচর্যা করার জন্য এক সেলে অবস্থান করলেও সারাদিনমান সে আমাদের সঙ্গেই কাটায়। দিনেরবেলা মনসুর ভাইও তাকে বিশেষ ডাকেন না। তখন ফালতু রয়েছে।

আবুল মনসুর আহমেদ, কফিলউদ্দীন চৌধুরী এবং তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এই ত্রয়ীর দিনব্যাপী যে আসর বসে আমরা অল্পবয়স্করা সযত্নে সে আড্ডা পরিহার করে চলি। তাঁরা যেখানে বসে তাঁদের দৈনন্দিন বৈঠক করেন আমরা তার সাথে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রাখি। খুব প্রয়োজন না হলে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমও করি না। মাশাআল্লাহ্ তিন জনের মুখই পাশ করা। একটি বিষয়ে কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারবেন না। গালাগালি কত প্রকার এবং কী কী, এর যদি কোন প্রতিযোগিতা হত তা হলে তাঁদের মধ্যে থেকেই প্রথম তিনটি পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটত। বস্তুত তাঁদের আলাপচারিতা কানে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। খিস্তি খেউড়ের চরম উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করতে হলে এই তিন মহারথীকে খানিকক্ষণ শ্রবণ করতে হবে।

ছাত্রদের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আইয়ুব খাঁ তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে এনেছে। সকাল-সন্ধ্যা এবং দিনের অন্যান্য সময় তাঁরা আইয়ুব খাঁর চতুর্দশ পুরুষকে উদ্ধার না করে জল স্পর্শ করেন না। হেন জন্তু-জানোয়ার নেই যা আইয়ুব খাঁর অতি নিকটজনদের উপর চড়াও না করাচ্ছেন। তাঁদের ভাষা এবং শব্দচয়ন কেবল তাঁদেরকেই মানায়। অন্যের পক্ষে সেসব উচ্চারণ বা তার বর্ণনা প্রদান কেবল অসম্ভবই নয়, অকল্পনীয়। বিশেষ ভাষা প্রয়োগে তিন জনই ডক্টরেট পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

আবুল মনসুর আহমেদের কথা বিশেষ করে বলা নিষ্প্রয়োজন। সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল রাজনৈতিক জীবনে প্রভূত গৌরবোজ্জ্বল কর্মকাণ্ডের প্রথম সারির এই স্বনামধন্য মানুষটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি তাঁর অনবদ্য সাহিত্য-প্রতিভার জন্য এদেশের মানুষের কাছে সমাদৃত থাকবেন। বহু গ্রন্থের প্রণেতা এই বরেণ্য সাহিত্যিক-রাজনীতিক তাঁর রম্যরচনা 'ফুড্ কনফারেন্সের' জন বহুলপ্রশংসিত। রাজনৈতিক সম্মেলনে প্রদত্ত তার লিখিত ভাষণও প্রভূত সাহিত্যরসাসৃত।

এনডিএফ বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের এক অধিবেশন বসেছিল ঢাকার গ্রীন রোডের আম্রকাননে। মুজিব ভাই এবং তাঁর অনুসারীরা এতে অংশ

www.pathagar.com

নিচ্ছিলেন না। তিনি আমাদের কয়েকজনকে নির্দেশ দিলেন সেখানে উপস্থিত থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করার জন্য।

গতানুগতিক সে সম্মেলনে জনাব আবুল মনসুর আহমেদের লিখিত বক্তব্যটি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। ভেবেছিলাম, অন্যদের রেখে আমি শীঘ্র চলে আসব। কিন্তু তাঁর বক্তব্য শুরু হলে সেটি এতটাই আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক হয় যে আমার আর চলে আসা হল না। দীর্ঘ সময় নিয়ে সেদিনের রাজনীতির পটভূমিকায় বিভিন্ন দল এবং রাজনীতিবিদদের প্রসঙ্গে তিনি যে সুতীব্র সমালোচনা ও তীর্যক মন্তব্য রেখেছিলেন সেসময়ের জন্য সেটা ছিল অতিশয় সময়োপযোগী এবং বাস্তবমুখী। এতদিন পর সবকিছু মনে পড়ছে না। কিন্তু একটি কথা আজও আমার স্মরণে গেঁথে আছে। পাকিস্তানের তদানীন্তন সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান তখন বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে যাচ্ছিল। সে-লক্ষ্যে কিছু ছাড় দেবার উপক্রম করতে রাজনীতির অঙ্গনে কিছুটা রেষারেষির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত স্থবির রাজনীতির সেই পরস্পরবিরোধিতা ও শিথিলতাকে ব্যবহার করে স্বীয় বা দলীয় কার্যোদ্ধারে অধিকতর উৎসাহী কতিপয় দল ও ব্যক্তির কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে গিয়ে মনসুর সাহেব বলেন, কথায় আছে গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। কিন্তু এদের কার্যকলাপে প্রতীয়মান হচ্ছে, শুধু তাহাই নহে, পরস্পরের গোঁফ ধরে টানাটানিরও অন্ত নেই।

রাজনৈতিকভাবে তার সেদিনের বক্তব্য অবশ্যই তাৎপর্যমণ্ডিত ছিল। সাহিত্য-রসঘন সেই সুচিন্তিত অভিমত অনেকের মধ্যে চিন্তার খোরাক যোগাতে সমর্থ হয়েছিল।

ছাত্রজীবনের অবসানে আমরা কিছু উৎসাহী কর্মী মিলে একটি যুব সংগঠন দাঁড় করাবার উদ্যোগপর্বে একদিন জনাব আবুল মনসুর সাহেবের বাসস্থানে গিয়েছিলাম। তাঁকে নিবেদন করলাম, আপনি একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক। আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুন্দর নাম দিন।

তিনি বললেন, নওজোয়ান লীগ রাখতে পার।

অন্যতম উদ্যোক্তা ফরিদপুরের মোশাররফ আলী খান আমাদের সঙ্গে ছিল। সে মন্তব্য করল, নামকরণেই সাবোটেজ করা শুরু করলেন!

বস্তুত, আমাদের কারোই সে-নাম পছন্দ হয়নি। তিনি তা হৃদয়ঙ্গম করলেন। বললেন, ঠিক আছে, পরে চিন্তা করে আমি তোমাদেরকে জানাব।

এ নিয়ে অবশ্য তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। জনাব আবুল মনসুর আহমেদের সঙ্গে আমাদের খুব একটা যোগাযোগ হত না।

পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন কিছু কর্মকাণ্ডের জন্য পরবর্তী সময়ে সামরিক আইনে তাঁর বিচার হলে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে শাস্তি হয়। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর এই সহকর্মীর মামলা

www.pathagar.com

পরিচালনা করার জন্য আগমন করেন এবং ঢাকা হাই-কোর্টের ফুল বেঞ্চে বেশ কয়েকদিন ধরে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিপক্ষে সেদিন মামলা লড়েছিলেন তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল ব্যারিস্টার বি. এ. সিদ্দিকী। আমি সেসময় ছাত্র। আইনবিষয়ক আগ্রহের চাইতেও মহান নেতা এবং উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজীবী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আইনের যুক্তি-তর্ক শোনার বিরল সুযোগ আমাকে এবং আরও অনেককে সেদিন কোর্টের দিকে আকর্ষণ করত। আমি প্রতিদিনই যেতাম। শহীদ সাহেব তখন শাহবাগ হোটেলে অবস্থান করতেন। সময় সময় সেখানে উপস্থিত হয়ে এবং তাঁর সামান্য সাহচর্য লাভ করে, দু'একটি আদেশ-নির্দেশ পালন করে কৃতার্থ হতাম। ছাত্রাবস্থা থেকেই তিনি আমাকে জানতেন এবং স্নেহ করতেন। জীবনে অনেক প্রখ্যাত আইনজীবীর যুক্তি-তর্ক শ্রবণের সুযোগ আমার ঘটেছে, কিন্তু সে ক'দিন জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর যে অনবদ্য বিশ্লেষণমূলক এবং অকাট্য যুক্তিতর্ক শুনেছিলাম তার আর তুলনা হয় না।

প্রতিটি পয়েন্টের উপর দীর্ঘ সময় নিয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উচ্চতর আদালতের রায়ের নজির উত্থাপন করে একটির পর একটি আইনের বই ঘেঁটে তিনি যে বক্তব্য দাঁড়া করাতেন, বেঞ্চের সমস্ত বিচারকমণ্ডলী, আইনজীবীগণ এবং উৎসাহী দর্শক-শ্রোতারা বিমুগ্ধ হত। তাঁর বক্তৃতার সময় ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা বিরাজ করত। কেবল সে-মামলার সাথে সম্পৃক্ত বিষয়বস্তু নিয়েই নয়, মামলাবহির্ভূত নানা জটিল আইনের প্রশ্নেও বিজ্ঞ বিচারপতিগণ তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জানতে চাইতেন। তিনি ধৈর্যসহকারে প্রতিটি প্রশ্নের উপরে তাঁর অভিমত প্রদান করতেন। আইনের ব্যাখ্যা দিতেন।

বিচারপতিগণ তাঁকে এতটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিলেন যে এক পর্যায়ে তাঁরা বললেন, মি. সোহরাওয়ার্দী, আমরা সম্মানিত যে আপনি আমাদের কোর্টে উপস্থিত হয়েছেন। আপনি চেয়ারে বসে আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন।

তিনি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আপনাদের এই সহৃদয় মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু আইনের এই পীঠস্থানে আমি কোন ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই না। আদালতকে সম্মান জানিয়ে আমি দাঁড়িয়েই আমার বক্তব্য তুলে ধরব।

তাই তো দেখতে পাই, নেতার মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ যখন হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়, সেদিন সমস্ত বিচারকগণ একযোগে সেখানে এসে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে মন্তব্য করেছিলেন, To day high court premises is sanctified.

জনাব আবুল মনসুর আহমেদ সে-মামলায় বেকসুর খালাস পান। আমার কেবলই মনে হয়েছে, দোষক্রটির প্রশ্ন নয়, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো

www.pathagar.com

একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যারিস্টার এবং বি.সি.এল.-এর অকাট্য যুক্তিতর্কের কারণেই সেটি সম্ভব হয়েছিল।

ছাব্বিশ সেলের কথায় ফিরে আসা যাক। মানিক ভাই সংবাদপত্র জগতের মানুষ। সেলে কাগজ এলে সর্বাগ্রে সবক'টি তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সবগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে তাঁর নিজস্ব পত্রিকা 'ইত্তেফাক' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েন। অন্য দু'জন আরসব কাগজে মনোনিবেশ করেন।

আমাদের পত্রিকা পড়ার জন্য ব্যাকুলতা কম নয়। কিন্তু ওখানে গিয়ে কাগজ আনা অসম্ভব। আমরা দারাকে ধরি, তুমি আমাদের ম্যানেজারও বটে। পিতার টেবিল থেকে কাগজ এনে দাও।

দারা বলে, ভাই, তার চাইতে আপনারা আমাকে দু'-চারটে চড়-চাপড় মারুন, সেটাও অনেক ভালো। ওখানে গিয়ে কাগজ আনার চাইতে সেটা হজম করা সহজতর।

আমরা তার পিতাকে ভাই বলে সম্বোধন করি। সে আমাদেরকেও একইভাবে সম্বোধন করে থাকে। আমরা তার সমস্যা উপলব্ধি করে আর তাকে বিব্রত করি না।

দারা জেলখানায় একজন আনন্দদায়ক সঙ্গী। সবসময় কিছু-না-কিছু নিয়ে ব্যস্ত আছে। প্রতিমাসে একজন করে ম্যানেজার নির্বাচিত করতে হয়। আমাদের সকলের পছন্দ দারা। সে সকলের অভিযোগ হাসিমুখে শুনবে এবং প্রয়োজনে হাসিমুখেই তাদেরকে কঠিন প্রতিউত্তর করতে পিছপা' হয় না। তার কেবল একটাই অনুরোধ, দিনমানে কোন কারণেই যেন তাকে তার পিতাসহ তিন মহারথীর ব্যূহের মধ্যে প্রেরণ করা না হয়।

দারা যে কোন সময় হাজির জবাবে কুশলী। কী কারণে একদিন তাদের পাশের ঘরের বাসিন্দা শফিউদ্দীন আহমেদ তাকে বলে, তুমি জানো এ ঘরে কারা থাকে?

সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিউত্তর, জানি, জানি। ঐ ঘরে তিনটা কমিউনিস্ট থাকে!

সকলে তার কথা উপভোগ করে।

সেদিন কী কারণে মিসেস আবুল মনসুর আহমেদকে নিয়ে বাকি দু'জন লেগেছেন। সে নাকি এর মাঝে গাউন পরিধান করেছিল। মানিক ভাই এবং চৌধুরী সাহেব তা নিয়ে যেসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিচ্ছেন, তা দূর থেকে শ্রবণ করে দারা এসে বলে, ভাই, এই তিন জনকে কোন নির্জন সেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করা যায় না! এদের যন্ত্রণায় আর টিকা যাচ্ছে না।

www.pathagar.com

তার অবস্থা উপলব্ধি করি। কিন্তু কিছু করার নেই।

দারা পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেনি। সে রাজনীতি বা সাহিত্য-অঙ্গনের বাইরেই বিচরণ করছে।

চৌধুরী সাহেবের কথা অন্যত্রও উল্লেখ করেছি। মজার মানুষ তিনি। বাহ্যিক কাঠখোট্টা ধরনের হলেও তাঁর ভিতরে একটি শিশুসুলভ মন বিরাজমান। দেওয়ানি আদালতের একজন ঝানু পেশাজীবী। কিন্তু শুধুই উকিল। তিনি অ্যাডভোকেট নন। সেও এক কাহিনী।

সেসময় অ্যাডভোকেট হতে হলে বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হত। জনশ্রুতি এরূপ, চৌধুরী সাহেব সেখানে উপস্থিত হলে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন তুলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ ধরনের একটি মামলা হলে, তার জুরিসডিকশন কোন আদালতে বর্তাবে?

উত্তর করেন, ওটা আমার ক্লার্ক বলতে পারবে।

একটি অর্থের অঙ্ক উল্লেখ করে দ্বিতীয় প্রশ্ন, এত টাকার দাবিতে যদি মামলা দায়ের করতে হয় তা হলে কত টাকা কোর্ট ফি দিতে হবে?

চৌধুরী সাহেবের নির্বিকার উত্তর, আমার ক্লার্ক জানে।

বিচারকগণ বলেন, পরবর্তী সময়ে আপনার ক্লার্ককেই পরীক্ষার জন্য পাঠাবেন। আপনার আর আসার প্রয়োজন নেই।

চৌধুরী সাহেবের আর অ্যাডভোকেট হওয়ার সুযোগ হয় না। কিন্তু স্বীয় কর্মক্ষেত্রে তিনি একজন দক্ষ সিভিল ল'-ইয়ার হিসাবে পরিচিত ছিলেন। নিজের নির্বাচনী এলাকাতেও তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। লোকজন তাঁর কাছে নাম বলে বিব্রত হয়ে পড়ত।

নামটি পছন্দ না হলে তিনি মন্তব্য করতেন, তোমাদের পিতা-মাতা আর নাম পেল না! সোনা মিয়া, ধনামিয়া এসব কোন নাম হল!

মানুষজন লজ্জায় পড়ে গেলেও তারা তাঁর বিদ্রূপ গায়ে মাখে না। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে '৫৪ সালের নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তিনি স্বল্পকালের জন্য পূর্তমন্ত্রী হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান সেদিন সংবাদপত্রে প্রসঙ্গান্তরে কটাক্ষ করেছে, অল্পদিনের মন্ত্রিত্বের সুবাদে প্রভূত সয়-সম্পত্তির সঙ্গে ঢাকায় কয়েকটি প্লট ও বাড়ি এবং মুন্সীগঞ্জের বেতকায় কোল্ড স্টোরেজ ও জুট মিলের মালিক হয়ে আর যা-ই বলা যাক, তাকে সৎ লোক বলে কোনদিনই দাবি করা যাবে না। এই বিতর্কে প্রবেশের কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি না। তবে কাচের ঘরে বসে অন্যের প্রতি ঢিল ছোড়ার প্রবণতা বিধেয় নয়। সংশ্লিষ্ট মানুষজন জানে রাজনৈতিক অঙ্গনের মেরুদণ্ডহীন এই মানুষটির নিজস্ব সক্রিয়তা না থাকলেও কেবলমাত্র স্ত্রীর কারণে তার অবস্থান ছিল সুরক্ষিত। তার কি এসব মন্তব্য সাজে!

চৌধুরী সাহেব মজার মানুষ। প্রথম এক মাসের ডিটেনশন শেষ হতে

www.pathagar.com

নতুন আটক আদেশ এসে উপস্থিত। এবারের মেয়াদ দীর্ঘতর। চৌধুরী সাহেব মহাখাপ্পা। এক হাতে ডিটেনশনের কাগজ অন্য হাতে পরিধেয় লুঙ্গি ঠিক করতে করতে তিনি চিৎকার করতে থাকেন, এটা কী অসভ্যতা! ধরে এনেছ, এক মাস খেটে দিয়েছি। আবার বাড়তি মেয়াদ কেন? এটা স্রেফ অসভ্যতা।

অর্ডারটি পৌঁছে দিতে আসা ডেপুটি বেচারা বিব্রত। চৌধুরী সাহেবকে শান্ত করা তার কম্ম নয়।

আর একদিন সাপ্তাহিক পরিদর্শনের সময় কী কারণে ডিআইজির উপর মহা চটে গেলেন। রাগান্বিত কণ্ঠে তাকে বলে দিলেন, If you treat me like this, I am not going to stay here. I am just going to walk out.

শুধু বলাই নয়, তিনি গেটর দিকে হাঁটা দিলেন। জেলখানা থেকে ওয়াক-আউট করবেন!

আমরা ক'জন গিয়ে অনেক বুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে আনি। বলি, স্যার, এই অসময়ে কোথায় যাবেন। এটা যাবার সঠিক ক্ষণ নয়। পরে ধীরেসুস্থে বিবেচনা করে ওয়াক-আউট করলেই হবে।

আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি অগত্যা সে-যাত্রায় ফিরে এলেন। এ নিয়ে তার দুই বন্ধু মনসুর ভাই এবং মানিক ভাইয়ের টিকা-টিপ্পনীর অন্ত ছিল না।

শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক সাহেবের ভাবশিষ্য চৌধুরী সাহেব কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গেই সম্পৃক্ত ছিলেন। শেরে বাংলা নামের মোহে দলটিকে এদেশের মানুষ ভিন্ন চোখে দেখত। তা না হলে জনগণের মধ্যে দলটির তেমন কোন প্রসার ঘটেনি। কিন্তু বাংলার মানুষের নিকট শেরে বাংলা স্বয়ংই ছিলেন একটি আদর্শ, একটি কর্মসূচি বা প্রতিষ্ঠান। তাঁর কোন বিকল্প এদেশের মাটিতে সৃষ্টি হয়নি। কোনদিন হবে বলেও মনে হয় না। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁর সুবিশাল ব্যক্তিপ্রভাব ভাঙিয়েই সংশ্লিষ্ট মহল এই প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যবহার করত। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর এটি কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ.এস.এম সোলায়মান সাহেব এই সেদিন পর্যন্ত নামটি ধরে রেখেছিল। তার মৃত্যুর পর সেটাও শেষ।

চৌধুরী সাহেব ছিলেন কুশলী ব্যক্তি। '৭০-এর নির্বাচনের পূর্বাহ্নে ঝোপ বুঝে কোপ দিলেন। মনোনয়নের আশ্বাস নিয়ে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করে বসলেন। আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল কেন্দ্রীয় আসনে আমাকেই মনোনয়ন দেওয়া হবে। আন্দোলন, জেল-জুলুম সব সহ্য করে বছরের পর বছর খাটা-খাটুনি করে এলাকা প্রস্তুত করার পর ফসল আর একজনের গোলায় চলে যাবে এটা সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

আমি মুজিব ভাইকে সব জানালাম। তিনি দোটানায় পড়লেন। তাজউদ্দীন

www.pathagar.com

সাহেব চৌধুরী সাহেবকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দলে এনেছেন তাই মুজিব ভাই খানিকটা বিব্রত। তিনি সর্বান্তঃকরণে আমাকে সাব্যস্ত করে রেখেছিলেন।

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর শ্যালক বাবলুর বন্ধু বলে আমি তাঁকে দুলাভাই বলে সম্বোধন করতাম। তিনি এসে সঙ্গোপনে আমাকে বললেন, ওরা কেন্দ্রে যাক। তুমি-আমি প্রাদেশিক পরিষদে থাকি। কেন্দ্রে কী হবে জানি না, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে আমরাই মন্ত্রিসভা গঠন করব। আমি মুখ্যমন্ত্রী, তুমি হবে আমার মন্ত্রিসভার সবচাইতে প্রভাবশালী সদস্য।

বুঝলাম, হাই কমান্ড চৌধুরী সাহেবকেই মনোনয়ন দেবে। আমাকে প্রাদেশিক পরিষদে দেওয়া হল। কোরবান আলী বাদ পড়ল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও চৌধুরী সাহেবের ভূমিকা সহায়ক ছিল। একসময়ে কলকাতায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার স্বল্পকাল পরই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামবহুল ইতিহাসে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'দৈনিক ইত্তেফাক' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মানিক ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই স্কুলজীবন থেকে। তখন 'ইত্তেফাক' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হত। হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেসে ছিল তার কার্যালয়। ছাত্রলীগ নেতা এম.এ. আউয়াল, আবদুল ওয়াদুদ, নুরুল ইসলাম ও মিজানুর রহমান সেখানে কাজ করতেন। আউয়াল ভাই একদিন আমাকে এডিটার সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, স্কুল পর্যায়ে ওর মতো এত ভালো কর্মী আমাদের দুটি নেই। মোয়াজ্জেম সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলের ছাত্র।

সাহেবদের স্কুলের ছাত্র শুনে তিনি আমার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। নানা খোঁজখবর নিলেন। সেই থেকে তাঁর সাথে আমার পরিচয়। উত্তরোত্তর সে পরিচয় স্নেহ-মমতার নিবিড় বন্ধনে আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি আমাকে তাঁর বিশাল হৃদয়ের ভালোবাসায় অভিষিক্ত করলেন।

'সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে'র প্রধান আকর্ষণ ছিল মোসাফিরের কলম 'রাজনৈতিক ধোকাবাজী'। মানিক ভাইয়ের সে-লেখা সাধারণ মানুষের কাছে অতীব সমাদৃত ছিল। তাঁর ভাষা, বিষয়বস্তু এবং পরিবেশনের স্বকীয় পদ্ধতি প্রতিটি সংখ্যাকে আকর্ষণীয় করে তুলত। রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত মানুষের

www.pathagar.com

কাছে মোসাফিরের সেসব রচনা খুবই আকর্ষণীয় ছিল। আগ্রহী পাঠককুল সপ্তাহ ধরে মোসাফিরের কলমের অপেক্ষায় থাকত।

মুসলিম লীগের তখন শাসনামল। পুলিশ দোকানে গিয়ে বলে আসত, 'ইত্তেফাক' যেন রাখা না হয়।

ইংরেজি স্কুলের ছাত্র হয়েও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমি আরও দু'একজন বন্ধু জুটিয়ে পত্রিকাটির পুশিং সেলের চেষ্টা করতাম। দোকানদারগণ আমাদের মতো ছাত্রদেরকে শখের ফেরিওয়ালারূপে দেখে কাগজ ক্রয় করতে ইচ্ছা প্রকাশ করত। কিন্তু ভয় পুলিশকে। তারা পত্রিকাটি ক্রয়ে নিষেধ করত।

আমরা বলতাম, পুলিশকে বলবেন তাদের নিষেধাজ্ঞাটি কাগজে লিখে দিতে। সরকারের অনুমতি নিয়ে প্রকাশিত পত্রিকা সম্বন্ধে একথা বলা আইন-বিরোধী।

পুলিশকে তারা সেকথা বলতে পুলিশ লিখে দিতে সম্মত হয় না। দোকানিরা আমাদের নিকট থেকে পত্রিকা নিতে শুরু করে।

আজ সেই সাপ্তাহিকের পথ বেয়ে 'ইত্তেফাক' কত বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 'ইত্তেফাক' সাম্রাজ্যের বর্তমান অধিপতি দুই যুধ্যমান তনয়ের সেকথা জানা নেই। তাদের পিতা তা জানতেন। রুপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মগ্রহণ না করলেও তাদের ছাত্রাবস্থায় এসেই তারা সোনার চামচের নাগাল পেয়ে যায়। আজ পরস্পরের প্রভাববলয় সৃষ্টির প্রয়াসে স্বার্থের সংঘাতে মহান নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আশীর্বাদপুষ্ট ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইত্তেফাক' অফিসে তাঁরই পুত্রদ্বয়ের কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়, সেখানে মানুষ নিহত হয়।

মানিক ভাইয়ের আত্মা নিদারুণ কষ্ট পাবে ভাবাটা অসঙ্গত নয়। আমরা যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর কলমকে ভালোবেসে সেদিন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সামান্য হলেও অবদান রেখেছিলাম তাদের অন্তর ব্যাথায় ভরে ওঠে।

মানিক ভাইকে জেলে আবদ্ধ করে একাধিকবার তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার ধন 'ইত্তেফাক' পত্রিকাকে সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। তার প্রকাশ নিষিদ্ধ করে অফিস সিল করে দিয়েছে। বিস্মিত হয়ে আমরা লক্ষ্য করতাম মানিক ভাইয়ের মধ্যে তেমন ভাবান্তর নেই।

তিনি হাসিমুখে বলতেন, একদিন আমার কিছুই ছিল না। আবার যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেব সেদিন কিছুই সঙ্গে যাবে না। মাঝখানে এই স্বল্প সময়ের জন্য নীতির প্রশ্নে আপস করতে চাই না।

বস্তুত তিনি যদি সামান্যতম আপস করতে সম্মত হতেন তা হলে তাঁর প্রতিষ্ঠানের উপর উপর্যুপরী সরকারি আঘাত নেমে আসত না। কোন নির্যাতন-নিপীড়ন তাঁকে স্তব্ধ করতে সক্ষম হয়নি। সারাটি জীবন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শাসককুলের সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে স্বীয় ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ও

www.pathagar.com

প্রতিবাদের বাণীকে সোচ্চারে প্রকাশ করে গেছেন। নিজে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও এদেশের মানুষের কল্যাণের রাজনীতির তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক, পরামর্শদাতা এবং অভিভাবক। বহু রাজনৈতিক নেতার তিনি ছিলেন Friend, philosopher and guide. সকল অর্থেই তা প্রযোজ্য।

শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের সঙ্গে কখনও তাঁর মতের অমিল হলেও মুজিব ভাইয়ের কর্মদক্ষতা, সাহস এবং ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতাকে তিনি সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি তাঁকে মজিবর মিয়া বলে ডাকতেন।

মুজিব ভাইও যা-ই করুন না কেন শেষ পর্যন্ত মানিক ভাইকে ঠিকই মানিয়ে নিতেন। এই কাজটিতে তাঁকে কখনও অবহেলা করতে দেখিনি। কারণও ছিল। 'ইত্তেফাকে'র প্রবল জনমত সৃষ্টির ক্ষমতা ছাড়াও এর পশ্চাতে উভয়ের অভিন্ন অভিভাবক ও নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভূমিকা ছিল অধিকতর কার্যকর। তিনি মানিক মিয়া ও শেখ মুজিবকে তাঁর দুটি বাহুর সমতুল্য বিবেচনা করতেন। শহীদ সাহেব পরের দিকে ঢাকায় এসে মানিক মিয়ার কাকরাইলস্থ বাসভবনে অবস্থান করতেন।

জেলের অভ্যন্তরে থেকেও মানিক ভাই অকাতরে অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হতেন না। একবার তাঁর কাছে কোন আবদার পৌঁছাতে পারলেই হল, মানিক ভাই নিশ্চয়ই তার ব্যবস্থা করবেন। কারো কোন সম্ভবপর আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ থাকত না। আমাদের চাহিদামতো মাছ এবং খাসির মাংসও গেট পেরিয়ে চৌকায় চলে আসত। মানিক ভাইয়ের ফালতুর দেশের বাড়িতেও নিয়মিত সংসার-খরচ প্রেরিত হত। বস্তুত এ ধরনের মন-মানসিকতার মানুষ খুবই বিরল। নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

জেলে আমরা ব্রিজ খেলার কম্পিটিশন করতাম। নাম দিতাম মানিক মিয়া টুর্নামেন্ট। উদ্দেশ্য, তাঁর কাছ থেকে পুরস্কারের সামগ্রী বাগিয়ে নেওয়া। তিনি হাসিমুখে আমাদের আবদার রক্ষা করতেন। কলম, অ্যাশস্ট্রে, ফুলদানি প্রভৃতি পুরস্কার প্রদান করতেন। নিজে খেলতেন না। কিন্তু বসে বসে খেলা উপভোগ করতেন এবং কখনও-সখনও মজার মজার টিপ্পনী কাটতেন।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও তিনটার্ম সভাপতি থাকাকালীন আমি তাঁর যে সহযোগিতা এবং সহায়তা লাভ করেছি তার তুলনা ছিল না। হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে গেলে দেখেছি তিনি ছুটে কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। আইনজীবীদের নিয়ে জামিনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর সামনে ধূমপানের প্রশ্ন আসে না। তবুও তিনি জেলগেটে এসে অন্যান্য খাবারের সঙ্গে সিগারেটও জমা দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কখনও তাঁর বাড়ি থেকে না খেয়ে আসতে পারিনি। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি এসব খেয়াল রাখতেন।

www.pathagar.com

মানিক ভাইয়ের সঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছি। তিনি প্রধান অতিথি। কোনটায় আমি হয়ত প্রধান বক্তা। তাঁর সঙ্গী হয়ে ভ্রমণ করা ছিল অতীব আনন্দদায়ক। তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল বিস্তৃত। পথে যেতে যেতে তিনি নানা ঘটনা বর্ণনা করতেন। কত সরস মন্তব্য করতেন। আমাদের কাছে তা খুবই হৃদয়গ্রাহী বিবেচিত হত।

অন্যত্র তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। মানিক ভাই সকল অর্থেই আমার একান্ত আপনজন, অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর সে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার আর কেউ ছিল না।

মনে পড়ে, পরম্পরায় শহীদ সাহেবের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছি মানিক ভাইকে নিয়ে, মানিক ভাইয়ের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেছি সিরাজউদ্দীন হোসেনকে নিয়ে। আবার সিরাজউদ্দীন হোসেনের মৃত্যুবার্ষিকীও পালন করেছি তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে। আমার মৃত্যুদিবস কেউ পালন করবে কি না জানি না-করুক বা না করুক কিছু যায়-আসে না, আমি তা দেখতে আসছি না!

ছয় দফা আন্দোলনের কালে '৬৬ সালে মানিক ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন দশ সেলে অবস্থান করেছি। 'নিত্যা-কারাগারে' পুস্তকে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। তাঁর দুই পুত্রের সঙ্গেই আমার সুসম্পর্ক ছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন আমাদের সঙ্গে ডেমোক্রেটিক লীগ করেছে। আমাদের সাথে একবার জেলও খেটে গিয়েছে। অধুনা মহিলা নেতৃত্বাধীন একটি রাজনৈতিক দলের সোচ্চার সমর্থক হওয়ার কারণে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাকেও যদি জেলহত্যা মামলায় অভিযুক্ত করে আটক করা হত অবাক হতাম না। এরা সব পারে! কনিষ্ঠ পুত্র আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ছাত্রজীবন থেকেই আমার সঙ্গে হৃদ্যতায় সম্পর্কিত। সে এরশাদ সাহেবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টিতেই প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসে। দীর্ঘদিন আমরা একসঙ্গে মন্ত্রিসভায় ছিলাম। এরশাদ সাহেব তাকে জাতীয় পার্টির মহাসচিবও নিযুক্ত করেছিলেন। এরশাদ সাহেবের দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মওদুদ আহমেদ ও কাজী জাফরের পরই তার নাম আসে। এখন সে বঙ্গবন্ধু-তনয়ার মন্ত্রিসভার যোগাযোগ মন্ত্রী। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সম্পাদকীয় লিখে হত্যাকারীদেরকে সূর্যসন্তান বলে আখ্যায়িত করে সে কাজটিকে অভিনন্দন জানাবার পরও কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থের কারণেই জাতীয় পার্টিকে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় নিপতিত করে তাকে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। গরজ বড় বালাই! ফলে, সম্ভাবনাপূর্ণ জাতীয় পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এখন দোটানায় ভুগছে। সরকারি অনুকম্পা ও নগদপ্রাপ্তির আশায় তাকে কেন্দ্র করে দলের এই বিভ্রান্তি অতীব ক্ষতিকর। এ প্রশ্নে অবশ্য এরশাদ সাহেবও ধোয়া তুলসী পাতাটি নন। তাঁর কারণেই মূলত দলটির আজ এই অবস্থা।

www.pathagar.com

যে প্রবৃদ্ধ ত্রয়ীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা উঠে এল, তারা কেউ আজ ইহজগতে নেই। মানুষকে অবশ্যই মৃত্যু বরণ করতে হবে। জীবদ্দশায় সে যে কীর্তি স্থাপন করে যায় তাই তাকে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট অমর করে রাখে।

বঙ্গবন্ধুও আজ আমাদের মাঝে নেই। সময়ে তাঁর যদি স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটত তা হলে তাঁকে নিয়ে হয়ত এত কথা হত না। কিন্তু তাঁর ঘটেছিল এক চরম দুঃখজনক মৃত্যু। তাকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে। এ ধরনের পরিণতি কারো জন্যই কাম্য হতে পারে না।

তাঁর সঙ্গে কয়েকবারই দীর্ঘদিন জেল খেটেছি। কিন্তু ছাত্রাবস্থায় ছাব্বিশ সেলের সে দিনগুলোর কথা কোনদিন ভোলা যাবে না। যেমনি বহির্জগতে তেমনি জেলের অভ্যন্তরেও তিনি ছিলেন নির্ভরশীল অভিভাবক। ছাত্রলীগের প্রতিটি কর্মীর তিনি নেতা, অগ্রজ এবং একনিষ্ঠ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। জেলের অভ্যন্তরেও আমাদের প্রতিটি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার দিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে বারান্দায় সকলে খেতে বসলে তিনি ম্যানেজারকে নির্দেশ দিলেন, মাছের মাথা আজ যারই বরাদ্দ থাক না কেন ওটা মোয়াজ্জেম ও মনিকে দেওয়া হোক।

তাঁর নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে পালিত হয়। বিকেলে ভলিবল খেলার সময় তিনি আমাকে তাঁর পক্ষে নামালেন, শুনেছি তুই মিডিলে ভালো খেলিস। আমাকে বল তৈরি করে দিবি। চাপ মেরে ওদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেব।

ছেলেমানুষের মতো তিনি খেলা নিয়ে মেতে উঠতেন। লম্বা মানুষ, নেটে ভালোই খেলতেন। এদিকে বল এলেই তিনি চিৎকার করে উঠতেন, মোয়াজ্জেম, একটা বল, একটা বল। আমি চেষ্টা করতাম তাঁকে বলটি বানিয়ে দিতে। যেবার একটি সুন্দর চাপ মেরে বিপক্ষ দলকে পরাস্ত করতেন ছেলেমানুষের মতো খুশিতে উল্লসিত হয়ে উঠতেন। যতদিন ছাব্বিশ সেলে ছিলাম, আমাকে সবসময়ই তিনি তাঁর দলভুক্ত করে নিতেন। বেশিরভাগ দিন আমরা জয়ী হতাম।

বোধগম্য কারণেই জেলখানায় বামপন্থীদের আনাগোনা সর্বদাই উল্লেখযোগ্য। সেসময় ছাব্বিশ সেলেও তাদের উপস্থিতি উপেক্ষণীয় ছিল না। মুজিব ভাই ছিলেন ছাব্বিশ সেলের বন্দিদের স্বীকৃত প্রতিনিধি। কোন সমস্যার উদ্ভব হলে বা কর্তৃপক্ষের বরাবরে বন্দিদের কোন বক্তব্য থাকলে

www.pathagar.com

প্রতিনিধিই তা সাপ্তাহিক ফাইলের দিন সুপারের বরাবরে পেশ করেন। প্রয়োজনে অন্য সময়ও তাঁকেই দেন-দরবার করতে হয়। বামপন্থীদের কেউ কেউ এটা পছন্দ করছিল না। একদিন তাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সত্যেন সেন তাদের উপর ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি তাদের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করে বলেই ফেললেন, বড় বড় কথা বললেই হবে না। মুজিব সাহেবের মুখের একটি কথায় যা হবে, তোমরা সকলে মিলে অনশন ধর্মঘট করেও তা অর্জন করতে পারবে না। তোমাদের ভাগ্য ভালো যে, সে তোমাদের প্রতিনিধিত্ব করছে।

সেন বাবুর কথায় তারা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সেই '৬২ সালেই প্রবীণ বামপন্থী নেতাটি শেখ সাহেবের প্রকৃষ্ট মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাল্লু শেঠ ছিল ঢাকার একজন নামকরা ব্যক্তি। তার দুই নম্বরের নানা ধান্দা রয়েছে। ঘোড়দৌড়ের বিকল্প জুয়া তার প্রধান উপজীবিকা। তাকেও ছাত্র আন্দোলনের পরপর গ্রেপ্তার করে এনে নিরাপত্তা আইনে ফেলে আমাদের সঙ্গে ছাব্বিশ সেলে রাখা হয়েছে।

প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অত্যন্ত মজার মানুষ এই কাল্লু শেঠ। আমাদের ঘরে এসে চুপিচুপি বলে, কিছু প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলবেন। জেলখানার মধ্যে আমি সব যোগাড় করতে সক্ষম। কেবল পারি না একটা জিনিস আনতে। ওটাই আবার আমার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন।

আমরা জিজ্ঞেস করি, কী জিনিস শেঠ?

তার নির্বিকার উত্তর, মেয়েমানুষ।

সে নিজেই আমাদেরকে জানায়, এই জিনিসটি ছাড়া বোতলে মজা পাই না। বাড়িতে আমার দুই-দুইটা মেয়েমানুষ আছে। নাইচা নাইচা আমারে গ্লাস ধরাইয়া দেয়। যদি নাচতে সম্মত না হয়, সোজা বলে দিই, তা হলে চললাম পাড়ায়। তারা সুড়সুড় করে নাচ শুরু করে। স্বামীকে কোন মেয়েমানুষই সেখানে পাঠাতে চায় না।

কাল্লু শেঠ গমগম করে হেসে ওঠে। বয়সে নবীন শেঠের স্বাস্থ্য দেখার মতো। এত অনাচারেও তার শরীরের কোন ঘাটতি নেই। সে প্রায়ই গুনগুন করে অশ্লীল একটা গানের কলি ভাঁজে, মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, নতুন বউয়ের শাড়ি ভিজল কিসে?

একদিন বললাম, শেঠ, অন্য জিনিস প্রয়োজন নেই। হাজীর তেহারি এনে খাওয়ান।

শেঠ হাসিমুখে বলে, এটা কোন ব্যাপারই না। কালই তেহারি খাবেন।

সত্যি সত্যি পরদিন সকালে আমাদের ক'জনের জন্য কয়েক প্যাকেট গরম তেহারি এসে উপস্থিত। চুপিচুপি বলে, নেতা যেন জানতে না পারেন। তা হলে গাল দেবেন।

www.pathagar.com

সেও মুজিব ভাইকে খুব মানত। তা-ই নিয়েও বামপন্থীরা টিপ্পনী কাটতে দ্বিধা করত না। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হত। তর্কসর্বস্ব বামপন্থীগণ তাঁর নামে দু'মুষ্টি ভাত বেশিই খেত।

পাকিস্তানের আমলে জেলখানায় খাওয়া-দাওয়ার খুব সুবিধা ছিল। নিরাপত্তা বন্দিদেরকে মাথাপিছু যা বরাদ্দ দেওয়া হত তা ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বিভিন্ন কাজের লোকজন, বাবুর্চি, ফালতু কারারক্ষীদেরকে তার মধ্য থেকেই আপ্যায়ন করতে হত। সে কারণে আমরা জেল-চিকিৎসককে অনুরোধ করে অনেক মেডিক্যাল ডায়েট ব্যবস্থা করে নিতাম। বাঙালি ডাক্তারদের প্রচুর সহানুভূতি ছিল আমাদের প্রতি। যা চাওয়া যেত, তা-ই বরাদ্দ হয়ে যেত। কৈ, শিং প্রভৃতি লিভিং ফিশ পথ্য হিসাবে দেওয়া হত। আমরা মুরগিও নিতাম। তাছাড়া পেঁপে, ডাব, কলা, দুধ, রুটি, মাখন প্রভৃতি প্রয়োজনের বেশিই পাওয়া যেত। দিনভর খাওয়ার বিরাম ছিল না। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেকের দেখায় অনেক খাবারদাবার আসত। সেসময় বিধি-নিষেধের এত কড়াকড়ি ছিল না। রান্না করা খাদ্য দেখার দিন আনা যেত। খাদ্যদ্রব্যের এত ছড়াছড়ির মধ্যেও দুপুরে খেতে বসে দেখা যেত ভোজনবিলাসী কোরবান সাহেব তার পেছনে গোটা দুই বাটি নিয়ে বসেছে। অন্যদের অগোচরে সেসব বাটি থেকে মাছ-মাংস নিয়ে আনন্দ করে খাচ্ছে।

একদিন শুনতে পাই মুজিব ভাই তাকে বলছেন, তুই এখন থেকে ভিতরে বসে খাবি। লোকজনকে দেখিয়ে এভাবে খাওয়াটা বিসদৃশ।

সেই থেকে সে দুপুরে একা-একাই খাওয়া পছন্দ করত।

দ্বিপ্রহরের একসঙ্গে লাইন করে বসে খাওয়ার মধ্যে একটা ভিন্নতর আমেজ ছিল। মনে হত আমরা কোথাও নিমন্ত্রণে গিয়েছি, একত্রে মেজবানি খাচ্ছি। মাঝে মাঝে ম্যানেজারের কিঞ্চিৎ ভাষণ থাকত। খাবারের মেনু, সময় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে তার নাতিদীর্ঘ ভাষণকে আমরা থালা-ঘটি-বাটি বাজিয়ে স্বাগত জানাতাম। ধীরেন দাস বলতেন, যাত্রাদলের অধিকারীর ভাষণ!

ধীরেন দার মতো মানুষও সহজে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে কৈশোরে জড়িত এই বিপ্লবী অকৃতদার পুরুষটির একটিই ধ্যান-জ্ঞান। তা হচ্ছে বাগান করা। ছাব্বিশ সেলের কোথাও এক ইঞ্চি মাটি খুঁজে পাওয়া যেত না যেখানে তাঁর খুরপির ছোঁয়া না পৌঁছেছে। সমগ্র এলাকাটিকে একটি পুষ্পউদ্যানে পরিণত করার একক কৃতিত্ব বাগানি বাবু ধীরেন দার। তাঁর নাম খুব কম লোকই জ্ঞাত ছিল। বাগানি বাবু বলেই তিনি সকলের নিকট পরিচিত। অতি প্রত্যুষে সেলের লক-আপ খোলার পর থেকে পুনরায় তালাবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঘুরে ঘুরে সর্বক্ষণই ফুলগাছগুলোর তত্ত্ব-তালাশ করছেন।

www.pathagar.com

স্নান-আহারের জন্য তাঁর ফালতু তার পিছে পিছে ঘুরত। অনেক বলে, অনেক অনুরোধে তাঁকে এসব করাতে হত। বস্তুত তাঁর মতো বাগানপাগল মানুষ আর দুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর কারণেই ঢাকা সেন্ট্রাল জেল পুষ্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

পুরনো বিশ সেলে একবার আমি তাঁর সাথে বছর দেড়েক জেল খেটেছি। শিশুর মতো এই প্রবীণ মানুষটি আমাকে কী ভালোই না বাসতেন! সেবার তাঁকে রেখে যখন মুক্তি পাই, সেদিন তাঁর যে অঝোর কান্না দেখেছিলাম সেকথা কোনদিন ভুলব না। মুক্তির আনন্দ ছাপিয়ে ধীরেন দার বিচ্ছেদ সেদিন আমাকে অস্বাভাবিক মর্মযাতনা দিয়েছিল।

এই ছাব্বিশ সেলেই একদা বাম রাজনীতির সিংহপুরুষ মণি সিংহের সঙ্গে একবার অনেকদিন কারাবাস করি। তাঁর যৌবনের কর্মকাণ্ডের কথা শুনেছি, দেখার সুযোগ হয়নি। এখন তিনি বয়সে প্রবীণ। শারীরিক দিক থেকে ম্রিয়মাণ থাকলেও মনটি তাঁর তখনও তাজা। পরাধীন যুগের অনেক কাহিনী তার কাছ থেকে আমরা আগ্রহভরে শ্রবণ করতাম। তিনি নিজেও ছিলেন অনেক ইতিহাসের এক প্রধান চরিত্র।

শেখ মুজিবের উত্থান বাংলাদেশ এবং এ জাতির সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর নিজের ভাষায়, সেদিন যদি নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সুদৃষ্টিতে না পড়তাম, তা হলে মহকুমা শহরের কাপ্তানিতেই জীবন অতিবাহিত হত।

শহীদ সাহেব ছিলেন প্রকৃত জহুরি। তিনি এক নজরেই শেখ সাহেবকে চিনে নিতে পেরেছিলেন।

গোপালগঞ্জ শহরে শহীদ সাহেবের জনসভা নস্যাৎ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়েছিল স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। দশম শ্রেণীর ছাত্র শেখ মুজিবর রহমান হালকা-পাতলা গড়নের হলেও সাহসিকতার অভাব ছিল না। শহীদ সাহেবের বক্তৃতা শুনতে এসে মাঠে হিন্দু কংগ্রেসীদের গোলযোগ সৃষ্টির প্রয়াস তাঁর অনভিপ্রেত মনে হয়। আরও বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের ধাওয়া দিয়ে মাঠ থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। মঞ্চে বসে নেতা সবই পরিলক্ষণ করেন। এক ফাঁকে শেখ সাহেবকে ডেকে পরিচয় নেন এবং কলকাতায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

সেই থেকে শুরু। শেখ সাহেব তাঁর সুদৃষ্টিতে পড়লেন। সবকিছু দ্রুত

www.pathagar.com

পরিবর্তন হয়ে গেল। মন-মানসিকতায় প্রভূত রূপান্তর করল। শহীদ সাহেবের বিশাল ব্যক্তিত্ব, সম্মোহনী নেতৃত্ব এবং তাঁর বিবিধ মহৎ গুণাবলি শেখ সাহেবকে প্রবলভাবে নাড়া দিল। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে এসে তাঁর স্নেহ ও আস্থা অর্জন করে অচিরেই এক নতুন মানুষের অবির্ভাব ঘটল। সেই মানুষটিই ঘটনাবহুল জীবন পাড়ি দিয়ে, অসংখ্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শত অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করে একদিন এই দেশের অবিসম্বাদিত নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর জীবন-চরিত রচয়িতাগণ নিশ্চয়ই বিস্তারিত লিখবেন। বেশি ছাড়া কম লিখবেন না। আমি সে প্রচেষ্টায় রত নই। একান্ত নিকট থেকে দেখে, তাঁর স্নেহধন্য হয়ে, তাঁর আমৃত্যু আস্থাভাজন কর্মী থাকার সৌভাগ্য লাভ করে তাঁর সম্বন্ধে যে মূল্যায়নে পৌঁছেছি সেটা অনেকের নিকট অপছন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু কিছু করার নেই। মূল্যায়ন নিজস্ব। অন্যের বিচারে নয়, বরং আমি তাঁকে যেমন দেখেছি তারই ইঙ্গিত এখানে সন্নিবেশিত করেছি। একই কথার চর্বিত চর্বণ বাঞ্ছনীয় নয়।

নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পেয়ে, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো মজলুম জননেতার সংস্পর্শে এসে, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহমেদ, আবদুস সালাম খান, তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া প্রভৃতি গুণী দিকপালের সহকর্মীরূপে দীর্ঘকাল কাজ করে স্বীয় সাহসিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে চিরটাকাল অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং সর্বোপরি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ন্যায্য দাবিদাওয়া ও অধিকারের প্রশ্নে কোনদিন আপস না করে এবং ফলশ্রুতিতে বহু অত্যাচার নির্যাতন জেলজুলুম সহ্য করে এমনকি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এই মানুষটি একদিন বাংলাদেশের আপামর জনগণের সংগ্রাম ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীকে পরিণত হন।

শেখ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ভাষা-আন্দোলনের সূচনা লগ্নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবি নিয়ে সংগ্রাম করতে গিয়ে সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ছাত্রজীবনের ইতি টেনে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সার্বক্ষণিক জড়িয়ে যান।

'৪৯ সালে ঢাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের সূচনা হয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। ঢাকার রোজ গার্ডেনে অনুষ্ঠিত সে বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সেদিন মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং টাঙ্গাইলের কৃতীপুরুষ শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তরুণ শেখ সাহেব ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক। একসময় শামসুল হক সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর মানসিক ভারসাম্য লোপ পায়। সহকারী শেষ সাহেব ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকার মুকুল সিনেমা

www.pathagar.com

হলে আওয়ামী লীগের পরবর্তী কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ সাহেবকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

ঢাকার ইয়ার মোহাম্মদ সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সিরাজুল ইসলাম স্কুল-জীবন থেকেই আমার বন্ধু। ঢাকা থেকে পরে সে একবার পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল। সে আমাকে একটি প্রতিনিধির কার্ড দিয়ে সে অধিবেশনে যোগদানের ব্যবস্থা করে দেয়। বলে দেয়, শেখ সাহেবকে সমর্থন করতে হবে। আমাকে বলাই বাহুল্য, আমি সর্বদাই তাঁর গুণগ্রাহী ও সমর্থক।

সম্ভবত সেটা '৫৩ সালের ঘটনা। মাওলানা ভাসানী সাহেব সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কর্মকর্তা নির্বাচনের মুহূর্তে সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য শেখ সাহেবের নাম প্রস্তাব হলে প্রতিনিধিবৃন্দ দীর্ঘক্ষণ ধরে হাততালি, হর্ষধ্বনি ও স্লোগানে স্লোগানে হল মুখরিত করে রাখে। এক পর্যায়ে মাওলানা সাহেব খামোশ বলে ধমক দিয়ে সে উল্লাস কিঞ্চিৎ হ্রাস করতে সমর্থ হন।

নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানে এসে করাচি শহরেই মূলত বাস করতেন। তিনি সেখানে জিন্না আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একসময় পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একীভূত হয়ে পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানের পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাহেব কর্মীদের অকুণ্ঠিত সমর্থন ও ভালোবাসায় একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠক ও অনলবর্ষী বক্তারূপে অপরিসীম জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বস্তুত তাঁর জনপ্রিয়তার সম্মুখে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সারির অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে ম্রিয়মাণ বলে মনে হত। কর্মীদের নিকট, বিশেষ করে তরুণ-সমাজের নিকট শেখ সাহেবের আকর্ষণ ছিল অপ্রতিরোধ্য। কর্মীরা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত, বীরের মর্যাদায় তাকে অভিষিক্ত করত। তিনিও কর্মীদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাদের দুঃখ-দুর্দশায় পাশে দাঁড়াতেন। তাঁর সবচাইতে বড় গুণ ছিল, তিনি কর্মীদের নাম মনে রাখতে পারতেন। বছরের পর বছর দেখা না হওয়া কর্মীদেরকে হঠাৎ দেখে চিনে ফেলতেন, নাম ধরে ডাকতেন। বিগলিত কর্মীরা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জনেও কুণ্ঠিত হত না। কর্মীদের নিকট তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রবাদতুল্য।

'৫৪ সালে এদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সূচনায় '৫২-র ভাষা-আন্দোলনের পথ বেয়ে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের ধ্বস নামতে থাকে। ষোল টাকা সের নুন খাইয়ে, ভাষা-আন্দোলনের ছাত্র হত্যাকারী মুখ্যমন্ত্রী, খুনি বলে চিহ্নিত নুরুল আমিনের জনপ্রিয়তা তখন বিয়োগের কোঠায়। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-বিরোধী জোট যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। খোদ নুরুল আমিন প্রাক্তন ছাত্রনেতা

www.pathagar.com

খালেক নেওয়াজের নিকট পরাজিত হয়। যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটাধিক্ষে জয়লাভ করে পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করে। শেরে বাংলার নেতৃত্বাধীন সেই মন্ত্রিসভায় শেখ মুজিবর রহমানও স্থানলাভ করেন। দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে এক সভায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা দেন, তিন পয়সার এক পোস্টকার্ডে অভিযোগ জানাবেন। বিচার করে দোষীর শাস্তি বিধান করব।

যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্র দীর্ঘদিন সহ্য করে না। তারা এক পর্যায়ে এই প্রদেশে শাসনতন্ত্রের '৯২ ক' ধারা প্রবর্তন করে শেরে বাংলার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করে কেন্দ্রের শাসন জারি করে। জনাব ইস্কান্দার মির্জাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করে প্রেরণ করে। অনেক টানাপোড়েনের পর '৫৬ সালে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। শেখ সাহেবকে অবশ্য বেশি দিন মন্ত্রিত্ব করতে দেওয়া হয় না। একসময় হাই-কমান্ডের নির্দেশে দলের প্রয়োজনে পদত্যাগ করে তাঁকে দলীয় কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতে হয়। '৫৮ সালে এদেশে সামরিক আইন জারি হলে শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সংখ্যক দুর্নীতির মামলা রুজু হয়েছিল। তিন পয়সার পোস্টকার্ডের বক্তব্য মানুষের মনে গেঁথে রইল।

অনেক পরে, দেশ স্বাধীন হলে জাতির পিতা এবং সরকার-প্রধান হিসাবে তিনি যখন বরিশাল যান এক জনসভায় ভাষণ দিতে, দুর্নীতির পঙ্কিলে নিমজ্জিত সমাজের এক বিদগ্ধ শ্রোতা সে-সভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছিল, একসময় তিন পয়সার পোস্টকার্ডে অভিযোগ দায়েরের কথা আপনি বলেছিলেন ; এখন যে চারদিকে দুর্নীতির এত আধিক্য, সরকার-প্রধান হিসাবে আপনি তার কী বিহিত করছেন?

শেখ সাহেব সে-প্রশ্নটিকে ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ক্ষুব্ধ চোখে প্রশ্নকর্তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই আওয়ামী লীগ সভাপতির পুত্র রেজাউল মালিক মনু ছুটে গিয়ে সেই প্রশ্নকর্তার মুখে এক ঘুসি মারে। স্বাস্থ্যবান যুবক মনুর ঘুসি খেয়ে লোকটি রক্তাক্ত জখম হয়। মনু হৃষ্টচিত্তে মঞ্চে আরোহণ করে বলে, মামা, বেটারে উচিত শিক্ষা দিয়ে এসেছি!

বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নের সুবাদে সেও তাঁকে মামা ডাকত। মামাকে খুশি দেখে ভাগ্নেরও খুশির সীমা নেই।

এই অন্যায় আচরণের জন্য যেখানে জাতির পিতার তাকে ভর্ৎসনা করা উচিত ছিল সেখানে স্মিত হেসে তাকে প্রশংসা উপহার দিয়ে অত্যন্ত মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। গুণীরা যে বলে, ক্ষমতা দুর্নীতির বাহন, একচ্ছত্র ক্ষমতা একচ্ছত্রভাবেই দুর্নীতির জন্ম দেয়, কথাটি সর্বৈব সত্য।

'৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খান সারা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। রাজনীতিকদের অত্যধিক দলাদলি এবং

www.pathagar.com

সরকারের স্থিতিহীনতার কারণে জনমনে সামগ্রিকভাবে রাজনীতির উপর যে ভীতিশ্রদ্ধা তৈরি হচ্ছিল তাকে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বহু গুণে বৃদ্ধি করে গণমানুষের চিন্তা-চেতনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে খান সাহেব নিরুদ্বেগে দেশ শাসন করতে থাকে। Friend not master লিখে সামরিক কর্তা জনগণকেও নছিহত করতে দ্বিধা করে না। বছর চারেক প্রায় বিনা প্রতিবাদেই চলে।

প্রথম গর্জে উঠলাম আমরা। পূর্ব পাকিস্তানের অদম্য ছাত্রসমাজ। আমি তখন ছাত্রলীগের সভাপতি। যে-স্থানে দাঁড়িয়ে একদিন ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খান দম্ভভরে বলেছিল, Gone are the days of slogans and processions... সে-স্থানে দাঁড়িয়েই ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেছিলাম, স্লোগান ও শোভাযাত্রার ক্ষণ আবার শুরু হল, অত্যাচারী সামরিক শাসকের অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এদেশের ছাত্রসমাজও ঘরে ফিরে যাব না।

সেদিন প্রথম বারের মতো রাজধানীর সমস্ত দোকান থেকে ফিল্ড মার্শালের প্রতিকৃতি ভেঙে রাজপথে ছুড়ে ফেলা হয়।

সেই আন্দোলনের সূত্র ধরেই আমরা সেবার ছাব্বিশ সেলে। আমাদের পূর্বেই অন্যান্যদেরসহ মুজিব ভাইকেও এনে আটক করা হয়। ক্রমে নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সারা পাকিস্তানব্যাপী একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত রচিত হলে তাঁকেও সেখানে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়।

ছাত্রবন্দিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমাদেরকে ছাব্বিশ সেল থেকে পুরনো হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্যদেরকে ছাব্বিশ সেলেই রাখা হয়। সেবার আমাদের মুক্তি পাওয়ার বেশ পরে মুজিব ভাই মুক্তি পান। নেতা শহীদ সাহেব তখনও কারারুদ্ধ। মুজিব ভাই কারাগারের বাইরে পা রেখে বলেছিলেন, নেতা এখনও আটক, আমি মুক্তি পেয়ে স্বস্তি পাচ্ছি না।

মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ তখন আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভাপতি। মাওলানা ভাসানী পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেছেন। ভাষা-আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সফেদ চাপদাড়িতে সর্বক্ষণ শুভ্র পোশাক পরিহিত সৌম্যদর্শন মাওলানা তর্কবাগীশকে একসময় অব্যাহতি দিয়ে শেখ সাহেব নিজে আওয়ামী লীগের সভাপতি হন। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার আর তখন কেউ নেই। নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরলোকগমন করেছেন। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ নীতিগত প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। জনাব তাজউদ্দীন আহমেদকে দলের সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

www.pathagar.com

অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর এদেশের মানুষের স্বাধিকার আন্দোলনের এক পর্যায়ে '৬৬ সালে শেখ সাহেব করাচীতে সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের স্বাধিকারের দাবিসম্বলিত ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

এই দাবি নিয়ে আমরা জনমত সংগঠনে ছড়িয়ে পড়ি। পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিপুল সাড়া পরিলক্ষিত হয়। শেখ সাহেবের ওপর ওদের আক্রমণ নেমে আসে। তাঁকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে ঢাকা জেলের দেওয়ানিতে রাখা হয়। তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমিও গ্রেপ্তার হয়ে যাই। মনে আছে, সেদিন বায়তুল মোকাররমে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। কেউ সাহস করে সামনে এগিয়ে আসে না। দশ-বারো জন লোকের সমাবেশে আমি একটি রিকশায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা শুরু করতে লোকজন ভিড়তে থাকে। অচিরেই সেটা সমাবেশের রূপ লাভ করে। আমার পর ওবায়েদ কথা বলতে দাঁড়ায়। তারপর সিরাজুল আলম খান।

সেই দুর্দিনের কথা আওয়ামী লীগের ওরা নিশ্চয়ই এতদিনে ভুলেছে। এটাই ওদের চরিত্র!

অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে সেবার দীর্ঘ সময় দশ সেলে কাটিয়ে যাই। 'নিত্য কারাগারে' সেসময়ই রচিত হয়। একসময় আটকাদেশ হাইকোর্টে অবৈধ ঘোষিত হলে মুক্তির আদেশ পেয়েও মুক্তি পাই না। একটি বক্তৃতার মামলায় জামিন না হওয়ার কারণে হাজতি হিসাবে দশ সেল ত্যাগ করে পুরনো বিশ সেলে স্থানলাভ করি। লাভ হল এইটুকু, দিনমান মুজিব ভাইয়ের সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। তাঁর প্রভাবে জেলের কর্তৃপক্ষ দেখেও না-দেখার ভান করে।

দেওয়ানিতে বসে আমরা স্মৃতিচারণ করি। পূর্ব পাকিস্তান মুক্তি ফ্রন্ট নাম দিয়ে মুজিব ভাই নিজে লিফলেট কম্পোজ করে ছাপিয়ে এনে দিতেন। আমি কয়েকজন বিশ্বস্ত সহকর্মী নিয়ে রাতভর সেসব বিতরণ করতাম। দেশে সামরিক আইন, ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড! কিন্তু নেতার নির্দেশে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবনকে হাতের মুঠায় নিয়ে সেদিন কাজ করেছি। আজ স্বাধীনতার সূচনার প্রশ্নে কত গাল-গল্পের অবতারণা লক্ষ্য করি। দেখেশুনে হাসি পায়। সেদিন কোথায় এসব রথী-মহরথীরা! কারো টিকিটিও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

মুজিব ভাইয়ের জীবন ও স্বপ্নের অনেক অজানা কথাই সেসময় আমার গোচরে আসে। সময়ে পুত্রও বন্ধুবৎ হয়ে যায়। সেসময় জেলখানায় একাকিত্বের মাঝে তিনি আমাকে তাঁর মনের অর্গল খুলে দিয়েছিলেন। একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াদি প্রকাশ করা হবে নীতিবির্গহিত। আমি তা করব না। জাতীয় রাজনীতি ও দেশের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়াদিই কেবল এই

www.pathagar.com

আলোচনায় স্থান পাবে। একসময় আমার মুক্তির আদেশ এসে যায়। নেতাকে কারাভ্যন্তরে রেখে আমিও অস্বস্তির মধ্যে বহির্জগতে পা রাখি।

পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র পুনরায় দানা বেঁধে ওঠে। আগরতলা ষড়যন্ত্র নাম দিয়ে এক ষড়যন্ত্রমূলক মামলা চালু করে। এই মামলাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এটা বুমেরাং হয়ে শেখ সাহেবের পক্ষে এবং পাকিস্তানি শাসকদের বিপক্ষে তুমুল জনমত গড়ে ওঠে। দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলনের মুখে এ মামলা প্রত্যাহৃত হয়ে বিচারক পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। শেখ সাহেব বীরের বেশে মুক্ত মানুষ হিসাবে বের হয়ে আসেন।

দলমত নির্বিশেষে দেশের আপামর জনসাধারণ তাঁকে তাদের মুক্তির দিশারি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতারূপে স্বীকৃতি দেয়। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে।

'৭০-এর নির্বাচনে তাঁর দলের একক বিজয় খুবই সহজ হয়। বস্তুত আওয়ামী লীগের মোকাবেলায় শেখ সাহেবের মনোনীত প্রার্থীর বিপরীতে নির্বাচনে দাঁড়ানো ছিল বাস্তবতাবিবর্জিত।

কিন্তু সেদিনের পাকিস্তানে নির্বাচনে জয়লাভই ক্ষমতায় যাওয়ায় মাপকাঠি বলে পরিগণিত হয় না। ষড়যন্ত্র তখনও শেষ হয়নি। জনগণের রায়কে অস্ত্রের শক্তিতে পদানত করতে ওরা পরাঙ্মুখ নয়। অন্যত্র সবিস্তারে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

অসহযোগ আন্দোলনের চরম মুহূর্তে কৌশলে সময়ক্ষেপণের প্রয়োজনে শেখ সাহেবকে ধোঁকায় ফেলে একটি সংলাপের আয়োজন করে পাকিস্তানের সেদিনের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ঢাকার আজকের 'সুগন্ধা'য় অনুষ্ঠিত সে আলোচনায় পশ্চিম পাকিস্তানে নির্বাচন বিজয়ী পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোও অংশ নেয়।

আমার কাছে শেখ সাহেবের মূল্যায়ন একজন অসম সাহসী নেতা, আপসহীন সংগ্রামী এবং বিশাল অন্তঃকরণের মানুষ হিসাবে।

ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক ক্ষোভ থাকলেও আমি সেটাকে বড় করে দেখার পক্ষপাতী ছিলাম না। ছাত্রজীবন শেষে দলে আমার যে-অবস্থান হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। দেশব্যাপী আমার যে গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তা ছিল সেটা যদি তাঁর মতো বড় নেতার পক্ষেও ঈর্ষার বস্তু হয় তা হলে এই রোগের আর কোন ঔষধ নেই। যোগ্যতা প্রাপ্যতার মাপকাঠি ছিল না, বরং ওটা ছিল এক প্রকারের অভিশাপ।

দ্বিতীয়ত, ছাত্রজীবনের সমাপনে আমি সমমনাদের নিয়ে একটি যুব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। কাঠামোও দাঁড় করিয়েছিলাম। তিনি একদিন নির্দেশ দিলেন যুব সংগঠনের প্রয়োজন নেই, তোকে মূল দলেই কাজ করতে হবে।

তিনি নেতা। তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য।

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানটি আঁতুড়েই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানই ভাগ্নে শেখ মনি যখন উদ্যোগ নিয়ে দাঁড় করায় তখন তিনি সানন্দে সেটি উদ্বোধন করেন এবং দলের অন্যতম অঙ্গ-সংগঠনের স্বীকৃতি দেন।

আমি ভাগ্নে নই, এটাই একমাত্র অযোগ্যতা। অথচ, একদিন তাঁর এই ভাগ্নেকে যখন আমি ছাত্রলীগের সম্পাদক করি, তিনি আমাকে ডেকে বলেছিলেন, ওর পদত্যাগ নিয়ে নে। সরকার আমার সঙ্গে তোদের সম্পর্ক দাঁড় করিয়ে অহেতুক হয়রানি করবে।

তাঁর সম্মুখে স্বীকার করেও আমি মনিকে পদত্যাগ করাইনি। আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে তিনি ভাগ্নের অবস্থানে সন্তুষ্ট রইলেন, আর উচ্চবাচ্য করলেন না।

জাতির পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে বঙ্গবন্ধু হিসাবে বরণ লাভ করে দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষে এতটা আত্মীয়তোষণ নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের বহু প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু সেসব বড় নয়। বিবেচ্য বিষয়, সারা দেশের মানুষের ভাগ্যের চাবিকাঠি যাঁর হাতে ন্যস্ত, তিনি কী করে এক অবিমৃশ্য ছেলেখেলায় মগ্ন হলেন পশ্চিমা স্বার্থবাদীদের মিষ্ট কথায় তুষ্ট হয়ে। কিছুই বোধগম্য হয় না। সবটাই সাজানো নাটক? বিষয়টি কী?

আজ দীর্ঘদিন পরে, নিরবচ্ছিন্ন মন নিয়ে শান্তচিত্তে ভাবতে বসলে একথাটিই কি সর্বাগ্রে মনে উদিত হবে না যে, সেদিন শেখ সাহেব হয় একটা বড় ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, নয় নিজের স্বার্থে সমগ্র জাতিকে তাতে নিক্ষেপ করেছিলেন!

তাঁর নিজের স্বার্থের প্রশ্নটি অনেকে সোচ্চারে বললেও আমার কেন যেন বিশ্বাস করতে দ্বিধা জাগে। এটা ঠিক, সম্ভব হলে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে বিদ্যমান থাকাটা অমূলক ছিল না। বিভিন্ন সময় আলাপ-আলোচনায় সেটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠত। তাঁর স্ত্রী অবশ্য সর্বদাই গুরুত্বসহকারে ঘোষণা করতেন, আমি কস্মিনকালেওও পিন্ডী যাব না। পিন্ডী চটকাবার আমার কোন খায়েশ নেই।

মুজিব ভাই পাইপ টানতে টানতে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুক করে কবিতার লাইনটি আওড়াতেন '...ও দুটি চোখ, চিরদিন মোরে হাসাল, কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।'

পান চিবুতে চিবুতে ভাবি উত্তর করতেন, ফাঁকি এটুও দেই নাই।

এটা বোঝা যেত, সবকিছু স্বাভাবিক পথে চললে এবং ক্ষমতা হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ পন্থায় অনুষ্ঠিত হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনটি লাভ করার বাসনা অবান্তর ছিল না।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বাস্তবে তাঁর শাসনই পূর্ব পাকিস্তানে প্রবর্তিত হয়েছিল। নতুন পতাকায় নতুন নামে দেশটি তখনই অনানুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়েছে। অন্য আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ওদের সঙ্গে

www.pathagar.com

আলোচনার ফাঁদে পা না দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে আগ্রহী প্রতিবেশী দেশটির সহায়তায় নিম্নতম ক্ষয়ক্ষতিতে ও স্বল্প প্রচেষ্টায় অচিরেই স্বাধীনতা অর্জন করা যেত। সেক্ষেত্রে সোয়া দুই শত বছরের পরাধীনতার অভিশাপে জর্জরিত, অর্থনৈতিকভাবে পর্যুদস্ত এই মৃতপ্রায় জাতিকে এত বিরাট মূল্য দিতে হত না। আমরা তো প্রতিবেশী দেশটির স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য নিয়েই দেশ স্বাধীন করেছি। একথা স্বীকার না করা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। সেদিন এর চাইতে কম সাহায্য-সহযোগিতায় অনেক রক্তক্ষয় ও ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে এই নতুন দেশটির জন্ম সম্ভব ছিল।

কিন্তু জন্মলগ্নেই যদি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা হলে পরবর্তীকালে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। কথায় বলে, জন্মকালে বাবা নাম রেখেছে দুখ্যা, সুখ হবে কী করে!

বাংলাদেশের মানুষের ললাটেও সেদিন এই গ্লানি লেখা হয়ে গিয়েছিল। তাকে খণ্ডানো সম্ভব ছিল না। তা না হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ-বিসর্জন, অগণিত মা-বোনের সম্ভ্রমহানি, বিপুল জাতীয় সম্পদের বিনাশ ঘটত না। পোড়ামাটির নীতি অনুসরণ করে যেভাবে দেশটাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করেছিল তা হয়ত সংঘঠিত হত না।

চরম মুহূর্তে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সুবিবেচনাপ্রসূত যে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত আসা উচিত ছিল তাতে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। জাতি এক ধাক্কায় অনেক পশ্চাতে চলে যায়। তার জের আজও এদেশের মানুষকে টানতে হচ্ছে।

নিজেদের যখন বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি ছিল না, চরম বিপদের মুহূর্তে যখন অপরের সাহায্য নিতেই হবে তখন এই ভুল সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্তহীনতার অর্থ কী!

মুখে-মুখে হাতি মারি, বাঘ মারি। কার্যত ঠনঠন। বাক্‌সর্বস্ব নব্য-বিপ্লবীদের স্লোগানেই যদি দেশ স্বাধীন করা যেত তা হলে বহু পূর্বেই তা সাধিত হতে পারত।

কমান্ডোদের মোকাবেলায় ওরাও নাকি প্রস্তুত! নিক্ষিপ্ত গ্রেনেড মুঠিতে ধরে পুনরায় শত্রুকে ছুড়ে মারার সংকল্প ওদের কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত হয়। বাস্তবে ওদের কাছে একটা সেভেন-ও-ক্লক ব্লেডও নেই। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, সব নিধিরাম সর্দার!

শেখ সাহেব কি প্রকৃত অবস্থা জানতেন না! ওদের চিৎকার আর গালভরা বুলি মূলধন করেই কি তিনি স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন! স্বাধীনতার ডাক কি সে-অর্থে তিনি দিয়েছিলেন! বা দিতে পেরেছিলেন!

সত্য কথা বললে মা মার খায়, সত্য গোপন করলে বাবা হারাম খায়। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে তথৈবচ! রেসকোর্সের মাঠে তিনি বলে এলেন, "আর যদি একটা গুলি চলে...।"

www.pathagar.com

তিনি বেশ ভালো করেই জানেন, এরপর একটা নয়, অনেক গুলি চলেছে। অগণিত নিরীহ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে। তাঁর নাকের ডগায় বসেই দিনের পর দিন জল ও আকাশপথে মারণাস্ত্রবোঝাই জাহাজ এসেছে। নারী-পুরুষ ও শিশুর রক্তে বারংবার রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা আর কর্ণফুলির ঘোলা পানি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু কাগজে বিবৃতি আর মুখে হুঙ্কার প্রদান ব্যতীত অন্য কিছুই করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন, যার হাতে যা আছে তা-ই নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

তিনি কি জানতেন না মানুষের হাতে কী আছে! মুখে লম্বা বোলচাল আর পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। এই তো এদেশের অধিকাংশ মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার! তা-ই নিয়েই একটি আধুনিক কনভেনশনাল সেনাবাহিনীকে মোকাবেলা করতে হবে! কী চমৎকার উপদেশ! কী অপূর্ব সমরপ্রস্তুতি! নেতৃত্বের এই অমার্জনীয় দৈন্য চরম আবেগের মুহূর্তে বিবেচনায় আনা সহজ ছিল না।

'৭১ সালের ২৫শে মার্চ তথাকথিত সংলাপ থেকে ব্যর্থতা নিয়ে স্বীয় বাসভবনে ফিরে এসে তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো সকলকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, প্রতিরোধ গড়ে তোলো। আজ রাতেই আর্মি ক্র্যাক ডাউন হবে।

আমরা স্তম্ভিত হয়ে নেতার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোন পূর্ব-পরিকল্পনা নেই, বিকল্প ধ্যান-ধারণা নেই, বিন্দুমাত্র প্রস্তুতিও নেই। একটা শলাপরামর্শও নেই, আমাদেরকে আজ পাক সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে! আমি রাত প্রায় আটটা পর্যন্ত তাঁর বাসভবনে। ওবায়েদ এসে কী জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, ফরিদপুর গিয়ে যুদ্ধ কর।

সে আমার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলে, ভাই, নেতা এসব কি বলছেন? ফরিদপুর তো আমাদেরই নিয়ন্ত্রণে। ওখানে গিয়ে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব?

তাকে কোন উত্তর দিতে পারিনি। সকলকেই নেতা তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

স্বাধিনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হল না। পরে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক ঝামেলা করে চট্টগ্রাম বেতারের ঘোষণাকে যেভাবে প্রচার করা হয় সেটাও তাঁর বক্তব্য হিসাবে আর একজন পাঠ করে শোনায়। সেখানেও অনেক অকথিত কথা রয়ে আছে। এখন ডামাডোলের কারণে ঘোষণার পাঠককেই একদল স্বাধীনতার ঘোষকের মর্যাদা দিতে বদ্ধপরিকর। সুষ্ঠুভাবে কোন কার্য সম্পাদিত না হলে 'দশচক্রে ভগবান ভূত' কথাটির সম্যক অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়েও কি এতসব দুই নম্বরির প্রয়োজন ছিল!

সময়ের এক ভুল পরে শত ভুলের জন্ম দেয়। তারপর কেবল ভুলই ভুল!

www.pathagar.com

এদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ সেদিন বুকে করে বঙ্গবন্ধুকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দিত। আমরা যে তেমন কিছুই নই, আমাদেরকেই কত যত্নে, কত নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় ওপারে পৌঁছে দিয়েছে!

তিনি বাসায় বসে রইলেন। কেন? সকল সহকর্মীকে সরিয়ে দিয়ে তিনি কেন ওদের আগমনের অপেক্ষায় রইলেন! যদি কোন চুক্তি না থাকত তা হলে প্রথম আক্রমণের সূচনায় তাঁকে প্রাণে বধ করা হলে তার কি প্রতিবিধান করা যেত! তিনি কি তা বোঝেননি? নিশ্চয়ই সব বিবেচনা করেই তিনি ড. কামালের পরামর্শমতো আত্মসমর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিলেন। ড. কামাল আর একবার কামাল করল। শোনা যায়, এদের সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে তাঁর ও নিজের ব্যবস্থা পাকা করে আত্মসর্ম্পণ করেছিল। তাই সবশেষে উভয়েই বহাল তবিয়তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে কোন অসুবিধা হয়নি। ইচ্ছা থাকলে সর্বাগ্রেই তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়া সম্ভব ছিল। সেটাই কি যুক্তিসঙ্গত ছিল না! তাই তো অনেকেই বলে, তাঁকে ওরা বাঁচিয়ে রাখতে চুক্তিবদ্ধ ছিল। হয়ত তৃতীয় কোন বৃহৎ শক্তি এ বিষয়ে মধ্যস্থতা করেছিল, কে জানে!

এ পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানিদেরকে অপূর্ব সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।

তাজউদ্দীন সাহেব নিজে নিজেই প্রধানমন্ত্রী বনে গেলেন। এ বিষয়ে পূর্বে বা অবস্থাদৃষ্টে জরুরি ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। ভারতে পৌঁছে তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে একটা অন্তবর্তী সরকার ঘোষণা করে দেন। ভিন দেশে অবস্থান করে সেদেশের অনুমত্যানুসারে একবার একটা ঘোষণা দিয়ে দিলে তাকে বোধগম্য কারণেই পরিবর্তন করা সহজসাধ্য নয়। তাজউদ্দীন সাহেব এটা বুঝেই মোক্ষম সময়ে কাজটি সেরে ফেলেন।

শুধু তা-ই নয়, তিনি একটি মারাত্মক ঘোষণাও দিয়ে দিলেন। বললেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের সঙ্গে আছেন, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে তিনি যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

কথাটা ছিল সর্বৈব মিথ্যা। তাজউদ্দীন সাহেব বুঝে শুনেই কাজ করার লোক। তাঁর এই ঘোষণায় পাকিস্তানিদের হাতে অমোঘ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ইচ্ছা করলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বলে দিতে পারত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিহত হয়েছেন। এই সুযোগটি এ পক্ষ থেকে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা সে সুযোগ ব্যবহার করেনি। পূর্বচুক্তি এবং তার পশ্চাতে তৃতীয় জামিনদারের কারণেই এটা ঘটেনি বলে প্রতীয়মান হয়।

বঙ্গবন্ধু দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সবকিছুই অবগত হন। তাজউদ্দীন সাহেবের ঘোষণার প্রকৃত ব্যাখ্যাও হৃদয়ঙ্গম করেন। কিন্তু যুদ্ধকালীন সময়ে

www.pathagar.com

তাঁর অবদানকেও তখনই অস্বীকার করতে পারেননি। তাজউদ্দীন সাহেবের পদাবনতি ঘটে, একসময় অব্যাহতিও এসে যায়।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান সাহেবের নেতৃত্বে মুজিবনগর থেকে অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। পূর্বাপরের কৃতিত্ব কে পাবে, স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিল, স্বাধীনতা যুদ্ধ কার নির্দেশে সংঘটিত হল এসব নিয়ে এখন অনেক গালভরা বক্তব্যই রাখা যাবে। গলা প্রকম্পিত করে বলা যাবে, নেতার জন্ম না হলে স্বাধীনতার সূর্য উদয় হত না! আরও কত কী। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যুদ্ধের ডাক দিয়ে তিনি চলে গেলেন শত্রুব্যূহে। স্বেচ্ছা-গ্রেপ্তার বরণ করে নিজেকে ওদের হাতে সঁপে দিলেন। তাঁকে না পেলে নাকি সব মানুষ মেরে ফেলা হত। কী অদ্ভুত যুক্তি! বলিহারি ওদের অজুহাত!

চর দখলে গিয়ে সর্দার তার লাঠিয়ালদের বলে, তোমরা লড়াই করতে থাকো। আমি একটু পান তামাক খেয়ে আসি। অবস্থাটা প্রায় তা-ই। অনেক লোক হতাহত হয়ে চর দখল হলে সর্দার এসে হাসিমুখে সব দায়িত্ব বুঝে নেয়। শুধু তা-ই নয়, লড়াইয়ের মূল নায়কেরও অবমূল্যায়ন করতে পরাঙ্মুখ হয় না।

বাকশাল গঠনের প্রাক্কালে আমরা ক'জন তাজউদ্দীন সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে বাধা দিন। সমগ্র জীবন বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলে এখন একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন গণতন্ত্রের সলিলসমাধির নামান্তর।

তাজউদ্দীন সাহেব বলেছিলেন, করতে দিন, যত শীঘ্র করবে তত শীঘ্র শেষ হবে।

হলও তা-ই। তার কথা যে এত শীঘ্র ফলে যাবে কেউ চিন্তা করেনি। দুঃখ এই, তাজউদ্দীন সাহেবও রেহাই পাননি।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের রেকর্ড ইদানীং যত্রতত্র সাড়ম্বরে বাজানো হয়। আবেগপ্রবণ বাংলাদেশীরা জাতিগতভাবে হৃদয়চালিত। সিরাজদ্দৌলা নাটকের রেকর্ড এখনও এদেশে বিপুল জনপ্রিয়। কোথাও সেটি বাজানো হলে আবেগতাড়িত মানুষ নির্বাক হয়ে তা শ্রবণ করে। শহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানও একইভাবে সমাদৃত। এমনকি নিকট অতীতে এরশাদ সাহেব রচিত বন্যার গানটিও এদেশের মানুষের মনকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়।

গণমানুষের নেতা বঙ্গবন্ধু তাঁর জনগণকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন একথা অনস্বীকার্য। সেদিনের সেই পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক আবেগাপ্লুত হয়ে বিশাল জনসমুদ্রে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটি সর্ববিবেচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাষণ। কণ্ঠস্বর, ভাষা এবং হৃদয়াবেগের কারণে সে-ভাষণের আবেদন

www.pathagar.com

অনবদ্য। তাঁর বহু বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু সেদিনের ভাষণটির কোন তুলনা নেই। এটিও এদেশে দীর্ঘকাল মানুষের অন্তরে রেখাপাত করবে।

বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হয়ে চলে গেলেন। তাজউদ্দীন সাহেবের ঘোষণার জবাবে পাকিস্তান সরকার তাঁর একটি আলোকচিত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে সকলকে তাঁর সঠিক অবস্থান বুঝিয়ে দিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কালে তিনি অন্তরীণ রইলেন। এ-যুদ্ধ পরিচালনায় তাঁর কোন হাত রইল না। ছিল না কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ। ভালো-মন্দ যা-ই করে থাকুক, সেদিনের নেতৃবৃন্দই তার কৃতিত্বের সম্পূর্ণ দাবিদার। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর চার জন একান্ত ঘনিষ্ঠ সহচরের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন দেশের মাটিতে। তাঁদেরকে ঘাতকের বুলেটে প্রাণ দিতে হয়। খন্দকার মোশতাক আহমেদ একমাত্র ব্যতিক্রম। তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল।

প্রণিধানের বিষয়, স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগের বহু কর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। যশোরের মসিউর রহমান সাহেবের মতো প্রথম কাতারের নেতাকে ওরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। বহু পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ঘর-দুয়ার হয়েছে ভস্মীভূত। দলের সক্রিয় নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর ওদের রোষানল থেকে রেহাই পায়নি। আওয়ামী লীগ নামটি শুনলেই ওদের হত্যার আগ্রহ, বিনাশের প্রবল ইচ্ছা দুর্দমনীয় হয়ে উঠত।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওরা কেবল বঙ্গবন্ধুকেই বহাল তবিয়তে বাঁচিয়ে রাখে তা নয়, তাঁর পরিবারকেও ওরা সুরক্ষা দেয়। সর্বত্র যখন ওদের হিংস্র থাবায় সব জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছে, আওয়ামী লীগারদের গন্ধ পেলে ওরা জিঘাংসায় অন্ধ হয়ে যায়, সেখানে কী করে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে ওরা ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া করে ভরণ-পোষণ দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করে এর গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধিতে আসে না। পাকিস্তান সরকার প্রতিমাসে পনেরো শত টাকা বাড়ি ভাড়াসহ তাদের খাই-খরচের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করেছিল বলে শোনা যায়।

আজকের প্রধানমন্ত্রীও হয়ত সে অর্থেই সন্তানসন্ততি নিয়ে প্রতিপালিত হয়েছিল। কেউ বলে সে তখন স্বামীর সঙ্গে পরমানন্দে কালতিপাত করছিল। স্বাধীনতার যুদ্ধে তার অবদান নেই একথা কী করে বলা চলে! ত্রিশ লক্ষ মানুষ শহীদ হোক, অগণিত নারী সতীত্ব বিসর্জন দিক, সাধারণ মানুষদের বাড়ি-ঘরদোর ভস্মীভূত হয়ে নিশেষ হোক, তারা পূর্ণ মর্যাদায় সুখে-শান্তিতেই বহাল রইল!

ভারতীয় পার্লামেন্টে বক্তৃতা করার পরপরই আমার পৈতৃক নিবাসে আগুন জ্বলে উঠল, বঙ্গবন্ধুর দুই পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পরও তাঁর পরিবারকে ওরা কী হিসাবে হেফাজত করে অনেকেরই উপলব্ধিতে আসে না!

www.pathagar.com

সবকিছু বিবেচনান্তে, কেউ যদি এটাকে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন বলে গণ্য করে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

ছাব্বিশ সেল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে এসব বিষয় এসে গেল। মুজিব ভাই সেখানেও বন্দিদের প্রতিনিধি ছিলেন। কালান্তরে বৃহত্তর পরিবেশে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশটির সাড়ে সাত কোটি মানুষেরও তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন।

পাকিস্তান মানিনি। তাকে ভেঙে দু'ভাগ করে আমাদের অংশ আমরা স্বাধীন করে নিয়েছি। ওরা গায়ের জোরে আমাদেরকে স্তব্ধ করতে চেয়েছিল, সফলকাম হয়নি। প্রতিবেশীর সহায়তা সত্ত্বেও প্রচুরতম মূল্য প্রদান করে আমাদেরকে স্বাধিকার অর্জন করতে হয়।

পাকিস্তানকে অস্বীকার করলেও সে আমলের নির্বাচনের ফলাফলকে অস্বীকার করি না। ওটাতে সুবিধা রয়েছে। হাতে গোনা দু'-চার জন ব্যতীত সকলেই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত। কাজেই এই ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই বৈধ শাসন অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু সদস্যগণ যে দু'প্রকারের। এক ভাগ জাতীয় পরিষদের সদস্য, অন্যভাগ প্রাদেশিক পরিষদের। নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিল। কাজেই দু'য়ের সমন্বয় সাধন ছিল সময়ের প্রয়োজন। দুই পরিষদের সদস্যদের একীভূত করে নতুন নামকরণ হল এম.সি.এ.-মেম্বার অব কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা গণপরিষদ সদস্য। প্রায় সাড়ে চার শত সদস্য নিয়ে স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি সংবিধান রচনার কাজে গণপরিষদ তৎপর হল। এই সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রিসভা গঠিত হল।

বিষদ আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। সংবিধানে দুটি মূলমন্ত্র সন্নিবেশিত হল যা এদেশের মানুষের মন-মানসিকতা ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। নয় মাস ভারতে অবস্থান এবং তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য-সহযোগিতার একটা প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতা যুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব আমাদেরকে যে সমর্থন প্রদান করেছিল তারও একটা কৃতজ্ঞতাবোধ কাজ করছিল। সংবিধানের চারটি মূলমন্ত্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র অবশ্যই সর্বজনস্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এদেশের আপামর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন।

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্রের আলোচনা-উত্থাপন বাহুল্য। বঙ্গবন্ধু বা তাঁর দলের প্রায় সকল সদস্যই এ বিষয়ে অনুৎসাহী ও অপরিজ্ঞাত। এ ত্রুটি ঐতিহাসিক। সমাজতন্ত্রের উপর অনীহা এবং জীবনভর সমাজতন্ত্রকে ফকিরতন্ত্রের সাথে তুলনা করে গণতন্ত্রের বিপরীতে এর অবস্থান নির্ণয় করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের অনুসারীরা চিন্তা ও চেতনায় চিরদিনই ডান বলয়ের লোক। রাতারাতি তাদের পক্ষে বাম বলয়ের লেবাস পরিধান করে বামপন্থী বা সমাজতান্ত্রিক বনে যাওয়া নীতিগতভাবে মেনে নিলেও কার্যত সেটা ছিল অবাস্তব। মেষকে ব্যাঘ্রের চর্ম পরিয়ে দিলেই সে ব্যাঘ্র বনে যায় না।

ধর্মপ্রাণ মুসলিমপ্রধান এ দেশটিতে কমিউনিস্টরা খুব একটা শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হত না। অনেকে এ শব্দটি গাল-মন্দ করার জন্য ব্যবহার করত। শিক্ষাঙ্গনসমূহে ছাত্র ইউনিয়ন, বাইরে কমিউনিস্ট পার্টি বা পরের দিকে মাওলানা ভাসানী সাহেব-প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপকে দেখেই সমাজতান্ত্রিকদের সম্বন্ধে সাধারণ পরিচিতি লাভ হয়। স্বাধীনতার পরে অবশ্য উগ্র সমাজতান্ত্রিক বলে দাবিদার কিছু-কিছু সশস্ত্র দল, যাদের কেউ-কেউ নিজেদেরকে মার্কসপন্থী, লেনিনবাদী, নকশালপন্থী, সিরাজ সিকদার পার্টি প্রভৃতি নামে পরিচিত হতে শ্লাঘাবোধ করত, তাদের গণবিরোধী অসামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিরীহ পল্লীগ্রামের জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এইসব অবৈধ অস্ত্রধারীদের নানাবিধ ক্রিয়াকর্মে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বিভ্রান্তি বিদূরীত হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর ঘনীভূত হয়েছিল। মাওলানা ভাসানী সাহেব তাঁর সুদীর্ঘকালের প্রচেষ্টার অসফলতায় দুঃখ করে বলেছিলেন, একজন মুসলমানকেও আমি কমিউনিস্ট হতে দেখলাম না, তেমনি একজন কুম্যনিস্টকেও মুসলমান করা গেল না।

বাংলাদেশ সরকারের প্রথম চিফ হুইপ হওয়ার সুবাদে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বদানকারী সোভিয়েত রাশিয়ায় বার দু'য়েক সফর করার সুযোগ আমার হয়েছিল। একবার প্যারিসের পথে যাত্রাবিরতি করতে গিয়ে আমি এবং কুষ্টিয়ার ডা. আসহাবুল হক হেবা মস্কো পৌঁছে অযাচিত অতিথিরূপে জীবনের নিকৃষ্ট বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। পরে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার সরকারের নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয়ভাবে সেদেশে সফর করি। সেসময়ের বিপুল সমাদর এবং শত জৌলুসেও পূর্বের বিড়ম্বিত স্মৃতি মুছে যায় না।

ছাত্রজীবন থেকে শুনে আসছি, কাশ্মীরের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রনের দাবির প্রশ্নে বারবার রাশিয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে জাতিসংঘে ভেটো প্রয়োগ করে। সেসময় তাদের ভেটোর ওপর হাড়েহাড়ে চটে ছিলাম। একবার ঢাকায় আগত এক রাশিয়ান ডেলিগেশনকে আমরা ক'জন ছাত্র মিলে ভেটো প্রয়োগের বিরুদ্ধে আমাদের বিক্ষুব্ধ অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম।

www.pathagar.com

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় রাশিয়া যখন আমাদের পক্ষে সেই ভেটো প্রয়োগ করেছিল তখন অবশ্য আমরা যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট!

রাশিয়ায় সরকারি সফরে সেখানকার কর্তারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন সমাজতন্ত্রের কিছু অব্যর্থ বটিকা সেবন করিয়ে আমাদেরকে জাতে তোলা যায় কি না যাচাই করে দেখতে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাদের ধন্বন্তরি অসফল। আমার আর সমাজতন্ত্রী বনা হয় না। সে বয়সে মাথায় পেরেক ঢুকতে চায় না, নতুন আইডিয়া কোন ছাড়!

কিন্তু তাতে কী হবে! দেশের সংবিধান প্রণয়নের পবিত্র দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। সে গণপরিষদেরই আমি চিফ হুইপ। নিজের দায়দায়িত্ব খাটো করে দেখাবার কোন সুযোগ নেই। ক্লাস-ক্যাপটেনের ভূমিকা আমার। কিন্তু মূল চাবিকাঠি হেডমাস্টার সাহেবের হাতে। আমরা সকলেই মূল গায়েনের দোহার হিসাবেই সুর ধরতাম। কর্তার ইচ্ছায় কীর্তন, বালুবনে গড়াগড়ি। নেতার বিরাগভাজন হবার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়। বড়-ছোট সকলেরই এক লক্ষ্য।

তবুও একদিন নিবেদন করি, নেতা, দেশটা আমাদের দরিদ্র। যাদের আছে তাদের কাছেই হাত পাতা বিবেচনাপ্রসূত। সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের একটা লেবাস পরিহিত থাকলে ক্ষতির সম্ভাবনা সমধিক।

তিনি বক্তব্য উপলব্ধি করেন। বস্তুত তাঁর সঙ্গে নীতির প্রশ্নে কোন মতভেদ ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সবই বুঝি। কিন্তু তার পরও সমাজতন্ত্রের কথা আমাদের রাখতে হবে।

কোথায় তাঁর বাধ্যবাধকতা জানি না। কিন্তু খুব হৃষ্টচিত্তে তিনি এটা মেনেছেন বলেও মনে হয়নি। তাঁর কথার উপরে আর কথা বলিনি। সব দোষ কেবল তাঁর এটা বললে সত্যের অপলাপ হবে। আমরাও কম দায়ী নই! অন্যায় করা বা সওয়া সমঅপরাধ।

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কয়েকজন সদস্য ক্ষোভপ্রকাশে দ্বিধা করেনি। তাদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। সেদিনের পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চলই আজ বাংলাদেশ। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতালগ্নে মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দ সেদিন মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেছিলেন ধর্মীয় মূল্যবোধকে মুখ্য বিবেচনায় রেখে। অন্যথায় এটা অবিভক্ত ভারতেরই অংশ হত। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের আবাসভূমি বলে এটা হয় পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার কারণে মুসলিম মূল্যবোধ কি তিরোহিত হয়ে যাবে! এদেশের শতকরা নব্বই জন অধিবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমান। পৃথিবীর কোথাও মানুষ এতটা ধর্মানুভূতিসম্পন্ন নয়। সামান্য আঘাত পেলে বা পা পিছলে পড়ে গেলেও এরা আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ করে। খেতে পাক চাই না

www.pathagar.com

পাক, ছেঁড়া গামছাটি ক্ষেতের আইলে বিছিয়ে নামাজে দাঁড়াতে তাদের বিন্দুমাত্র অলসতা নেই। এত মসজিদও পৃথিবীর অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হবে না। প্রতিটি মসজিদ থেকে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত আজানের ধ্বনি শ্রুত হয়। খোদ মক্কা-মদিনায় দরজা বন্ধ করে মিলাদ পড়তে হয়। পুলিশ উৎপাত করে। বাংলাদেশের মানুষ প্রতিটি কাজের সূচনায় পবিত্র মিলাদ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তাদের জীবনের অঙ্গ। রক্ত-মাংস, হাড়, মজ্জায় এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ। ইসলাম তাদের ইমান, মনেপ্রাণে তারা মুসলিম। সেদেশে ধর্মকে নিরপেক্ষ করে দেওয়া গর্হিত অপরাধ।

অধিকাংশ সদস্যের মনের মাঝে যা-ই থাক না কেন, স্বল্পসংখ্যক নব্য সমাজতন্ত্রী তথা ধর্মবিমুখ করিৎকর্মাদের প্ররোচনা ও উদ্দীপনায় বঙ্গবন্ধুও প্রভাবান্বিত হয়ে ওঠেন। একবার তাঁর স্বীকৃতি আদায় করা গেলে বাকি কাজ অতি সহজ। নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠে কোন ফললাভ হয় না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার লোকের অভাব। বিষয়টি সেসময় খুব একটা তলিয়েও দেখিনি। সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে একটা বড়সড় পদ পেয়ে তখন এতকিছু দেখার সময় কোথায়! বয়সও কম। ধর্মানুভূতি কেবল মুখে-মুখে, পরিবার ও সমাজগতভাবে। অনেকের মতো ব্যক্তিজীবনে তখন অমার্জনীয়ভাবে ধর্মকে পরোক্ষে পরিহার করে চলতাম।

অন্য একটি অনুভূতিও সেসময় ধর্মবাদীদের বিরুদ্ধ অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নেজামে ইসলাম, জামাতে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের কেবল বিরোধিতাই করেনি, তারা ধর্ম, সমাজ ও মানবতাবিরোধী পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীকে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল। এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যজগতের মধ্যমণি শ্রদ্ধাভাজন বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্বিচারে হত্যার নীলনক্সা এরাই প্রণয়ন করেছিল। যে বর্বর পাকসেনা আমাদের মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করেছে, তাকে পথ দেখিয়ে এরাই নিয়ে গিয়েছিল। এদের দুঃখজনক অবিমৃশ্যতার কারণে অযৌক্তিকভাবে একটা ধর্মবিমুখ আবহাওয়া বিস্তৃতিলাভ করেছিল। ফলশ্রুতিতে সংবিধানে ধর্ম-নিরপেক্ষতার সন্নিবেশ ঘটে। এটা যে ধর্মহীনতারই নামান্তর তা বুঝেও আমরা চোখ বুজে রইলাম। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন সম্ভব নয়। কিন্তু যেদিন এরশাদ সাহেব ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদায় অভিষিক্ত করলেন, সেদিন তাঁর সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, একশ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক, শিল্পীদের সেকী আস্ফালন! এরশাদ সাহেব দেশটাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগারদেরও একই অভিমত। তাদের আবার প্রতিবেশী দাদারা রয়েছে।

www.pathagar.com

কর্তার ইচ্ছায় তাদের কীর্তন। তাদের গোস্বার অন্ত নেই। রাষ্ট্রের সব থাকতে পারে। একটি ভৌগোলিক সীমারেখা, একটি পতাকা, একটি পোশাক, একটি খাদ্য, একটি মাছ, একটি ভাষা, একটি সঙ্গীত সবই থাকতে পারবে। এমনকি জাতীয় একটি পাখিও থাকবে। পিতা তো অবশ্যই থাকতে হবে। কেবল একটি রাষ্ট্রীয় ধর্ম থাকলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! বিধর্মীদের আর্তনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ওরাও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়, গেল, গেল, সব রসাতলে গেল!

ওদের হাহুতাশে কিছু যায়-আসে না। সব জাতিরই একটি কেবলা থাকতে হবে, পবিত্র কোরানের বাণী।

বাজার অর্থনীতি তথা উন্মুক্ত অর্থনীতিতে গড়ে উঠেছে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সামান্য শিল্প, কলকারখানা। গণতান্ত্রিক বিশ্বের সাহায্য-সহযোগিতার উপর মূলত নির্ভরশীল সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। সেখানে ঘটা করে সমাজতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়ে উপকারের চাইতে অপকারই অধিকতর সাধিত হয়েছিল।

তদুপরি সেদিন গণতান্ত্রিক বিশ্ব যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনঃ গড়ে তোলার নিমিত্তে যে সাহায্য-সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিল তার তুলনা হয় না। তুলনামূলকভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে নব নব আইডিয়া ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সহায়তা এসে পৌঁছেনি। তাদের সে সামর্থ্যও ছিল না। অস্বাভাবিক বিস্ফোরনোন্মুখ জনসংখ্যায় পীড়িত বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র এই দেশটিকে যে মন-মানস নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল সেটার অভাব পরিলক্ষিত হল। সমাজতন্ত্র ঘোষণা করে আমরা বেটা বনে গেলাম। ভাবটা হচ্ছে, আমি কি হনু রে! সমগ্র জীবন গণতন্ত্রের জন্য চিৎকার করে ক্ষমতায় আরোহণ করে তার বিপরীত বিধান রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করে নিজেদের পায়েই কুড়ালের আঘাত করা হল।

ধর্মনিরপেক্ষতার মন্ত্র আউড়ে দেশটি অচিরেই মুসলিম বিশ্বের বিরাগভাজনে পরিণত হল।

সৌদি আরব জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। তাদের বিরূপতা বৃদ্ধি পেল। আমাদের বিমান হজযাত্রীদেরকে বহন করতে পারত না, সৌদি আরবে অবতরণের অনুমতি পেত না। ভারতের সঙ্গে ব্যবস্থা করে হজ পালন করতে হত। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হয়েও ধর্ম-নিরপেক্ষতার কারণে বাংলাদেশ আপঙ্‌ক্তেয় হয়ে রইল, যদিও বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাধিক্য মানুষের বিশ্ব মুসলিমের শ্রেষ্ঠতম তীর্থক্ষেত্র আল্লাহ্ তা'আল্লার ঘর কাবাশরিফ ও হুজুরের (দঃ) রওজা মুবারক জেয়ারতের জন্য ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না।

পরে বঙ্গবন্ধু ইসলামি শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে মুসলিম দেশ

www.pathagar.com

হিসাবে আমাদের মর্যাদা উদ্ধারে কিছুটা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর সে পদক্ষেপেও কিছু মুখচেনা সহকর্মী প্রবল বাধা প্রদান করেছিল, কিন্তু কোন ফললাভ হয়নি।

বঙ্গবন্ধুর শাসন আমল কী প্রকারের ছিল? কেউ যদি এ প্রশ্ন করে, আমার পক্ষে জবাব দেওয়া সহজ নয়। আমিও যে সবকিছুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলাম। সেদিন যে প্রত্যাশিত সুফল এনে দেওয়া যায়নি বা ব্যর্থতার যে করুণ চিত্র দেশব্যাপী রূপায়িত হয়েছিল সেজন্য তাঁকে এককভাবে দায়ী করা সমীচীন নয়। সিংহভাগ দায়িত্ব অবশ্যই তাঁর। নেতৃত্বে কোন ভাগীদার ছিল না। এক ব্যক্তির নেতৃত্ব বা পুরোপুরি ব্যক্তিশাসন যাকে বলা হয়, সেসময় এদেশে সেটাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেদিক থেকে মুজিব-শাসনের মূল্যায়ন ভিন্নতর হতে পারে না।

বঙ্গবন্ধু সম্বন্ধে তাঁর এবং আমাদের সকলের নেতা, নেতাদের নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মন্তব্যের উপরে আর কোন বক্তব্য চলে না। সন্তান ও বন্ধুর মতো যাকে স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন তাঁর সম্বন্ধে মহান নেতার কথা ক'টি অতীব প্রণিধানযোগ্য।

ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে আমরা কতিপয় প্রতিনিধি একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জনাব আতাউর রহমান খানের স্থলে শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদে সমাসীন করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। বলাই বাহুল্য, এ অনুরোধ করার জন্য আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল।

তিনি আমাদের বক্তব্য মনোযোগসহকারে শ্রবণ করলেন। কাকরাইলের সেন্ট্রাল সার্কিট হাউসের কক্ষে অর্ধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমরা শোন, দু'জন ব্যাক্তি আছে, আন্দোলনে, সংগ্রামে, জনতার হয়ে লড়াই করতে তাদের জুড়ি নেই। একজন মাওলানা ভাসানী, আর একজন শেখ মুজিব। কিন্তু যদি কোন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব তাদেরকে দেওয়া হয় তা হলে সেদেশের বারোটা বেজে যাবে। শহীদ সাহেবের নিজস্ব ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলা কথা কয়টি আজও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই '৫৭ সালে নেতার কী গভীর মূল্যায়ন! তাঁর সে মন্তব্যের ওপরে আর কোন কথা চলে না। তাঁর চাইতে শেখ সাহেবকে বেশি আর কি চেনে!

দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর কোনদিনই কম ছিল না। সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক নেতা ছিলেন শেখ সাহেব একথা একশত ভাগ্য সত্য। মানুষের জন্য মমতারও তাঁর মধ্যে অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ-পরিচালনার ক্ষেত্রে মহান নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উচ্চারিত কথাগুলোই শেষ কথা। সবাইকে দিয়ে সবকিছু হয় না।

স্বাধীনতার পর সহকর্মীদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে নিজে যদি তাদের

www.pathagar.com

অভিভাবক হয়ে ক্ষমতার বলয়ের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারতেন, তা হলে দেশের এই করুণ অবস্থা হয় না, তাঁরও জীবনের এই পরিণতি নেমে আসে না। অবশ্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে বিশ্ব-প্রতিপালকের ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়, মানুষের সামান্যই করণীয় থাকে।

স্বাধীনতার কাছে মানুষের বৃহৎ প্রত্যাশা ছিল। শেখ সাহেব নিজেও সে প্রত্যাশা বৃদ্ধিতে সহায়ক ছিলেন। নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে, দেশ পশ্চিমাদের শোষণমুক্ত হলে অচিরেই শান্তি আর সমৃদ্ধির দিকে যাবে এ আশা ও উদ্দীপনার বাণী প্রতিটি বক্তব্যে তিনি তুলে ধরতেন। দেশময় আমরাও সেকথার প্রতিধ্বনি করতাম। মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষা উত্তাল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু বাস্তবে ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ল। দিনকে দিন অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। সদ্য-স্বাধীন দেশ, যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশ, পুনর্গঠনে কিছুটা সময় নেবে এসব স্তোকবাক্যে তাদের পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয় না। সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেতে থাকে। অদক্ষ শাসনব্যবস্থায় ক্রমান্বয়ে সমাধানের পরিবর্তে অধিকতর জটিলতার সৃষ্টি হতে থাকে। শেখ সাহেব সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে বললেন, দু'বছর আমি তোমাদের কিছু দেবার পারব না।

অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান অসন্তুষ্ট হয়। রিযিকের মালিক স্বয়ং আল্লাহ্। কোন মানুষের পক্ষে এ ধরনের আত্মম্ভরিতামূলক ঘোষণা দেওয়া অসমীচীন।

দু'বছর কিছু দেওয়া যাবে না কেন? বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কম আসেনি! বঙ্গবন্ধুই একসময় বলতে বাধ্য হলেন, আমি সারা দুনিয়া থেকে সাহায্য নিয়ে আসছি, কিন্তু চাটার দল সব চেটে খেয়ে ফেলে।

এই চাটার দল কারা? নিজ দলের লোকদের প্রকৃত স্বরূপই কি তিনি উদ্‌ঘাটন করলেন না! শুধু তা-ই নয়, এক পর্যায়ে বললেন, সাড়ে সাত কোটি কম্বল আসল, আমার কম্বলটা গেল কোথায়? এইসব চাটার দল, কম্বলচোর, গমচোর, দুর্নীতিবাজ অসাধু ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সে সময় তিনি প্রায়ই নানা মন্তব্য করতেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেননি, এরা কারা! এদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায়! এরাই তাঁর চতুষ্পার্শে অহরহ বিরাজমান। এদেরকে নিয়েই দেশ গড়ছেন। কিন্তু দেশ তখন গড়িয়ে যাচ্ছে। সর্বত্র ধস নেমে আসছে।

সরকারি প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ। ঘুসগ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তদবির ও উৎকোচ ব্যতিরেকে কোথাও কিছু হবার জো নেই। অদক্ষতা, অকর্মণ্যতা ও অসাধুতার কারণে প্রশাসন যন্ত্র প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। সবই তাঁর নাকের ডগায় ঘটছে। কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সংশোধনের পথ জানা

www.pathagar.com

নেই। মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন, এই করবেন, সেই করবেন, লাল ঘোড়া দাবড়িয়ে দেবেন।

দু'-চার দিন সকলেই তটস্থ। তারপর পুনরায় পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন। এই গোলক ধাঁধা থেকে পরিত্রাণের পথ তাঁর জানা নেই।

অসাধু ব্যবসায়ীরা সর্বসময়ই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তারা তাদের সবক'টি পন্থাই কাজে লাগায়। মুনাফাখোরি, কালোবাজারি, মজুতদারিই কেবল বৃদ্ধি পেল না, যে জিনিসটার মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি করতে হবে, রাতারাতি তা বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়। প্রতিদিন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে গেল। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ল। মুষ্টিমেয় নব্য ভাগ্যবানরা ব্যতীত সকলকেই চূড়ান্ত দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

দেশের যে মা-বোনরা একদিন বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য রোজা রেখেছিল, তারা আজ মাথায় দেবার সামান্য নারিকেল তেলের অভাবে অহোরাত্রি হাহুতাশ করে অভিশাপ জানায়। কেরোসিনের অভাবে তাদের ঘরদোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ। জীবনে আঁধার নেমে আসে। সন্তানের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দিতে না পেরে, কোলের শিশুটির দুধের ব্যবস্থায় অপারগ হয়ে তারা কেবল ভাগ্যকেই দোষ দেয় না সরকারকেও দোষারূপ করে। তাদের হাহাকারে সৃষ্টিকর্তার আসনও কেঁপে ওঠে।

চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, নারী-নির্যাতন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির সুযোগে অপরাধ যেমন বৃদ্ধি পেতে থাকে, অবৈধ অস্ত্রের কারণে এবং তথাকথিত উগ্রবাদীদের অবিমৃশ্যতার ফলে জনজীবনে ব্যাপক দুর্ভোগ নেমে আসে। গ্রামাঞ্চলে দুর্বৃত্তদের অশুভ তৎপরতায় সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণা মেয়েটি থেকে শুরু করে যুবতী, গৃহবধূ, সন্তানের জননী এমনকি প্রৌঢ়া মহিলারাও তাদের সম্ভ্রম বজায় রেখে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টার প্রাণান্ত। প্রতিদিনই নারী নির্যাতনের অসংখ্য সংবাদ আসছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অবক্ষয় নেমে আসে। দলীয় লোকজন অবস্থার সুযোগে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নিতে অধিকতর ব্যস্ত। চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছে। এই বাহিনী, সেই বাহিনীর প্রতাপে সকলেই অতিষ্ঠ। বহু কলকারখানা শ্রমিক অসন্তোষের কারণে এবং জাতীয়করণের ফলে বন্ধ হয়ে পড়েছে।

অবাঙালিদের দেশত্যাগের কারণে তাদের পরিত্যক্ত বাড়িঘর, সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করায়ত্ত করার জোর পাঁয়তারায় সরকারি মহল তৎপর। একশ্রেণীর ফটকাবাজ ব্যবসায়ীর হাতে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ভিন্নখাতে প্রবাহিত। বঙ্গবন্ধুর ভাগনে একটি পরিত্যক্ত ছাপাখানা দখল করে দৈনিক

www.pathagar.com

পত্রিকা চালু করে দিল। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কী কারণে গভীর রাতে মতিঝিলের ব্যাংকপাড়ায় পুলিশের গুলি বর্ষণে আহত হয়, দেশের জনগণ বুঝতে সক্ষম হয় না।

ছাত্রদের মধ্যেও দলীয় রাজনীতির প্রভাব ব্যাপকতা লাভ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বন্ধাত্ব। আন্দোলনের সূতিকাগার বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও প্রভূত চারিত্রিক অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষকশ্রেণীর মধ্যেও রাজনীতির পঙ্কিলতা অনুপ্রবেশ করে। প্রাইমারি ও মাধ্যমিক শিক্ষকগণ রাজপথে নেমে আসে তাদের দীর্ঘদিনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে। সর্বত্র অস্থিরতা বিরাজমান।

জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সময়োপযোগী বলিষ্ঠ কর্মসূচি নিয়ে সে ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে কোন বিরোধীদল এগিয়ে আসে না। দু'-একটি প্রতিষ্ঠানের হঠকারিতামূলক কর্মসূচি পরিস্থিতিকে আরেও ঘোলাটে করে তোলে। সেই সুযোগে সশস্ত্র কয়েকটি উগ্রবাদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। সামগ্রিকভাবে সারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলাই কেবল ব্যাহত হয় না, বিভিন্ন এলাকায় জনজীবন ক্রমান্বয়ে ওদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ে। বেশ কয়েকজন জনপ্রতিনিধি এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকে এইসব দুষ্কৃতিকারীর হাতে প্রাণ দিতে হয়।

অসহায় বঙ্গবন্ধু গোস্বায় ফেটে পড়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধমক-ধামক দেন। শোকবাণী ও কিছু অর্থসাহায্য পাঠিয়ে কর্তব্য সমাপন করেন। চারদিকে এত ব্যাপক ব্যর্থতার মাঝেও ক্ষমতার মসনদে বসে চাটুকার-পরিবৃত হয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি তাঁর অনেকটাই অপরিজ্ঞাত রয়ে যায়।

ফলশ্রুতিতে '৭৪ সালে দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষাবস্থার সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এলাকায় দুর্ভিক্ষের ছোবলে অগণিত মানুষের জীবনপাত ঘটে। রংপুর জেলায় অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করে। নির্বসনা যুবতী বাসন্তীর মাছ ধরার জালের সাহায্যে লজ্জা নিবারণের ছবি দুনিয়ার সব কাগজে ছাপা হয়ে লজ্জায় দেশের মানুষের মাথা কাটা যায়। তাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলে আখ্যায়িত করে কৈফিয়ত দেওয়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বঙ্গবন্ধু সব দেখেন, সবই শোনেন। কিন্তু প্রতিকার বোধহয় তাঁর নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত।

সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে একসময় সব দলমত একত্রে নির্যাস বানিয়ে একদলীয় পদ্ধতির বাকশাল গঠন করে তাঁর জীবনের বৃহত্তম ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সাজানো নাটকের উপসংহারে আজীবন রাষ্ট্রপতি থাকার ঘোষণা দেবার কথা বলে শোনা যায়, সেই দিনই এই মহৎপ্রাণ নায়কের জীবনের অবসান ঘটে। শোনা যায়, তিনি নিজেই ট্যাংক মহড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সেটাই কাল হয়। সেই ট্যাংকের ছত্রছায়ায় একদল সেনাসদস্য তাঁর বাসভবন আক্রমণ করে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের মধ্যে একটা পরিবর্তন আনার প্রয়াস পায়। '৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট এমনিভাবেই বঙ্গবন্ধুর জীবনের অবসান ঘটে। এদেশের ইতিহাসে সবচাইতে মর্মন্তুদ ঘটনা হিসাবেই সে দিনটি চিহ্নিত।

ছাব্বিশ সেলে বসে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে এই সামান্য উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়।

প্রায় দুই যুগ গত হয়েছে। কত কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে! '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের ঘটনা আমাদের জন্য অত্যন্ত শোকাবহ হলেও, এই দেশের মানুষ কিন্তু সেদিন কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। এটা সত্য, সেদিন মানুষ তাঁর জন্য ইন্নালিল্লাহ পড়েনি। মানুষের প্রত্যাশা যখন সীমাহীন বঞ্চনায় পর্যবসিত হয় এবং প্রাপ্তির পরিবর্তে অত্যাচার-উৎপীড়ন নেমে এসে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয় তখন মানুষ যদি আর একটি পরিবর্তনের আশায় নতুন করে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে তা হলে দোষারোপ করা যায় না।

মুষ্টিমেয় যে ক'জন গ্রেপ্তার হয়েছিল সে-ক'জন বাদে পূর্ণ আওয়ামী লীগ কেবিনেটই সেদিন শপথ নিয়েছিল। কিন্তু সব দোষ নন্দ ঘোষের! পূর্ণ মন্ত্রীরা আওয়ামী লীগ করার কারণে তুলসী পাতা। আমরা তিন জন প্রতিমন্ত্রী উত্তরাধিকারের রাজনীতির বিমুখতার কারণে ওদের মূল টার্গেট।

এতদিন ধরে বঙ্গবন্ধু হত্যা এবং জেলহত্যার বিচার সোচ্চারে দাবি করে আজ আমরাই ঘৃণ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসার রোষানলে জেলহত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কারা-নির্যাতন ভোগ করছি। আমাদের দোষ আমারা সেদিন প্রতিবাদ করিনি কেন?

আজ চব্বিশ বছর পর একথা বলা খুবই সহজ। এক সাগর অশ্রুর বিনিময়েই হোক বা অন্য যেভাবেই হোক বঙ্গবন্ধুর কন্যা আজ এদেশের প্রধানমন্ত্রী। ওদের পক্ষে এখন অনেক কথাই বলা সহজ। পেটিকোট ক্যাবিনেটের সদস্যগণ, তাদের তাঁবেদার সহযোগী ও পদলেহী চাটুকারগণেরও নর্তন-কুর্দনের আজ অন্ত নেই। কিন্তু সেদিন কোথায় ছিলেন বীরপুঙ্গব বাছাধনেরা!

সালমান শাহ্ একজন তরুণ অভিনেতা ছিল। তার মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে এদেশের নয় জন মানুষ আত্মাহুতি দেয়। বঙ্গবন্ধুর জন্য তো একজন লোকও প্রাণ-বিসর্জন করেনি। আজ এত সমারোহ! কথায় কথায় তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে, স্বপ্ন সফলে ভক্তদের জীবনপণ শপথ। সেদিন তাদের মুখে সামান্য উহু-আহা পর্যন্ত উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি। এসব গলাবাজ হায় হোসেনদের কথা নাহয় বাদ দেওয়া গেল। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা কী করেছিল? পিতৃশোকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করেনি বা

www.pathagar.com

মাথার কেশমুণ্ডন করে প্রতিবাদজ্ঞাপনের কথাও শোনা যায়নি। বরং স্বামী-পুত্র নিয়ে বহাল তবিয়তে ঘর-সংসারই করেছে। আজ কুম্ভীরাশ্রুর বিরাম নেই। বোধগম্য কারণে লাল সালুর মাহাত্ম্য অনুধাবন করেই এই রাজনৈতিক কান্না। ক্ষমতারোহণের একটি সুনির্দিষ্ট মাধ্যমরূপে এই অশ্রু-বিসর্জন সুধীমহলে অপরিচিত নয়।

বাকশাল গঠনপ্রক্রিয়ায় যথাসম্ভব বাধা প্রদান করেছিলাম। আরও অনেকেই করেছিল। নেতাকে একথাও জানিয়েছিলাম, নীতিগতভাবে একদলীয় পদ্ধতির বিরোধিতা করি এবং তিনি এটা পরিহার করলেই উত্তম। কিন্তু তা যদি না করেন, এবং শেষ পর্যন্ত স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, অবশ্যই তাঁর সঙ্গে থাকব। তাঁকে পরিত্যাগ করে রাজনীতি করার প্রশ্নই আসে না।

হলও তা-ই। জেনারেল ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন পদত্যাগ করল। আমরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গেই রইলাম। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আমাদের আত্মার আত্মীয়, তাঁকে পরিহার করার প্রশ্ন আসে না।

বাকশাল করাটা যে ভুল ছিল আজকের আওয়ামী লীগ এবং তাঁর কন্যাও কার্যত সেটা স্বীকার করে। তারাও বাকশাল না করে আওয়ামী লীগকেই পুনর্জ্জীবিত করেছে। বরিশালের মহিউদ্দীন সাহেব এবং আবদুর রাজ্জাক কিছুদিন বিদ্রোহ করে বাকশাল চালিয়ে পরে দেহি পদবল্লম হয়ে যায়। রাজশাহীর সরদার আমজাদ হোসেন ও শ্রমিক নেতা শাহ্ মোহাম্মদ আবু জাফর প্রমুখ তার পরও কিছুকাল বাকশালের পতাকা সমুন্নত রেখে পরে একসময় আমাদের সঙ্গে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করে।

একমাত্র ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ব্যতীত আওয়ামী লীগের প্রথম কাতারের অধিকাংশ নেতা অন্তরে বাকশালের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে নারাজ। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সাহেব পরিষ্কার বলে দিলেন, ভালো-মন্দ বুঝি না, নেতা এটা সাব্যস্ত করেছেন, এটাই হবে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মোশতাক আহমেদ, কামরুজ্জামান সাহেব সকলেই তাঁদের মনোভাব আমাদেরকে ব্যক্ত করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তাঁরা আপত্তি উত্থাপন করবেন। সময়ে তাঁরা তা করলেন না। খন্দকার মোশতাক বরং এক ধাপ এগিয়ে অনেক আবেগ আর অভিমানে নেতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কবে, কোনদিন

www.pathagar.com

আমরা শর্তহীন সমর্থন দিই নাই! আজও তা-ই দিচ্ছি। আমরা তোমার সঙ্গে ছিলাম, আছি এবং থাকব।

সেদিন যদি জুজুর ভয় না করে তারা সম্মিলিতভাবে এটাকে রুখে দাঁড়াতেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেতা কখনওই তাঁর দীর্ঘ দিনের ঘনিষ্ঠ সহকারীদের অভিমত উড়িয়ে দিতেন না। আজ এদেশের ইতিহাস ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত। অপরিপক্ব ও অনাকাঙ্ক্ষিত এই প্রমীলা-শাসনের কলঙ্ক থেকে জাতি উদ্ধার পেত।

কিন্তু নেতৃবৃন্দ কথা দিয়েও পরিস্থিতির শিকার হলেন। জনাব তাজউদ্দীন যেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, অন্যরা অবশ্য তা করেননি। কিন্তু ফলাফল একই। সময়ের ডাকে সাড়া না দিতে পারলে, প্রত্যাশিত পুরুষোচিত পদক্ষেপ গ্রহণে অপরাগ হলে যা হবার তাই হয়। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। বাংলাদেশের ইতিহাসও কোন ব্যতিক্রম নয়।

বঙ্গবন্ধুর শেষ ইচ্ছার ফসল বাকশাল। তাঁর কন্যাকে যদি পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হয় তা হলে তাকে অবশ্যই বাকশাল পুনঃপ্রবর্তন করতে হয়। কিন্তু পিতা নিজ হস্তে যে-দলটিকে সমাহিত করে গেছেন কেবলমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রয়াত পিতার ইচ্ছাকে অমর্যাদা করে, তাঁর আত্মাকে কষ্ট দিয়ে সেই দলকেই পুনরুজ্জীবিত করার কারণ অনুধাবন করতে প্রাজ্ঞজনদের সময়ক্ষেপণ হয় না।

কথায় বলে, মন মন কহিয়ো, ভেদ না কহিয়ো ভাই! ভেদ কহিয়ো তো মারা যাইয়ো ভাই!

আদর্শের বড় বড় বুলির পশ্চাতে যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতালিপ্সা কাজ করেছে একথা বলাই বাহুল্য। সবকিছুই এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার। তাই বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে আওয়ামী লীগ করার প্রশ্ন আমাদের বিবেচনায় আসেনি। তাঁর অরাজনৈতিক কন্যার নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার প্রশ্ন বাতুলতার শামিল। এখানেই মহিলার রাগের কারণ। অন্যের রাগ-অনুরাগ বিবেচনায় নিয়ে রাজনীতির পথ নিরূপিত হয় না।

আওয়ামী লীগকে কীভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে? নিঃসন্দেহে এটি একটি বৃহৎ দল এবং অনুরূপ সব দলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সংগঠিত। একসময় এটি ছিল পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ। জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শই ছিল এই দলের মূলমন্ত্র। সে কারণেই নিজে মুসলিম ধর্মগুরু হয়েও মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, যিনি এই দেশের বাম রাজনীতির সর্বাপেক্ষা জনসমর্থিত ধারক-বাহক ছিলেন, তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের পুরোধা হয়েও দীর্ঘদিন এই দল করতে পারলেন না। শহীদ সাহেব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে মূলত দ্বিমত পোষণ করে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে

www.pathagar.com

যান এবং বাম রাজনৈতিক দল ন্যাপ গঠন করেন। আওয়ামী লীগের মধ্যে যে সামান্য অংশটি বামঘেঁষা ছিল তারা এসময় সকলেই মাওলানা সাহেবের অনুগামীরূপে কেটে পড়ে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এবং তাঁর সুস্পষ্ট পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় দলটি সর্ব অর্থেই একটি উদারনৈতিক মধ্যপন্থী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসাবে গড়ে ওঠে। বাম-ডানের টানাপোড়েনে জনাব আতাউর রহমান খান রসিকতা করে বলেছিলেন, আমরা রাইটিস্ট বা লেফটিস্ট নই, আমরা মিডিলইস্ট। মধ্যপন্থা ধরে এগুতেই এই দলের অধিকাংশ সদস্য পছন্দ করত।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই দলটি মূলত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অনুসৃত নীতি অনুসরণ করে আসছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর, তাঁর ভাবশিষ্য শেখ মুজিবুর রহমান যখন এ দলের কর্ণধার তখনও এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এভাবেই চলেছে। জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক শক্তিকে অনেক ক্ষেত্রেই 'এক্সপিডিয়েন্সি' বা সুযোগ-সুবিধার মাহেন্দ্রক্ষণকে কাজে লাগাতে হয়। শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগও তার উর্ধ্বে ছিল না।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রায় নয়টি মাস ভারতে অবস্থানকালে সেখানকার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং তাদের চিন্তা-চেতনার কিছুটা প্রভাব অবশ্যই উন্মুক্তমনা গণতান্ত্রিক কর্মীদের মন-মানসিকতায় প্রতিফলিত হয়। আওয়ামী লীগের সদস্যরা রুদ্ধ দুয়ার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষক নয়। গণতন্ত্রে সেটা সম্ভবও নয়।

অনেক তরুণ নেতা-কর্মী নতুন ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধুর স্নেহভাজন সিরাজুল আলম খান এতদিন পর্যন্ত আমাদের ধ্যানধারণারই একজন ছিল। সে আমারও প্রিয়ভাজন। আমার হাত ধরেই ছাত্রলীগে তার অভিষেক। তার মতো নিরলস পরিশ্রমী কর্মী সহজে দেখা যায় না। দেশে আসার পর প্রত্যক্ষ করা গেল সে একজন বামপন্থীতে পরিণত হয়েছে। সে মার্কসবাদে দীক্ষিত হয়েছে। অনেক তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে সে প্রভাবিত করে। ফলশ্রুতিতে একসময় আওয়ামীপন্থীদের মধ্য থেকেই একটি অংশ নিয়ে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ গড়ে ওঠে। কর্মীদের দাদা সিরাজুল আলম খানই তার প্রধান রূপকার। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সাধারণত পরবর্তীতে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির শক্তি বৃদ্ধি করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতেই ছাত্রলীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক অংশ জাসদের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হয়।

ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দলের মধ্যে গুণগত কোন তারতম্য পরিলক্ষিত না হলেও হিন্দু সম্প্রদায় স্বাধীনতা যুদ্ধের পর থেকে আওয়ামী লীগের দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে। শিক্ষা অঙ্গনে যারা কোনদিন ছাত্রলীগকে সহ্য

www.pathagar.com

করতে পারেনি, তারাও হাঁটি হাঁটি পা পা করে আওয়ামী চত্বরে একত্রিত হতে থাকে। সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মতো দুটি অবাঞ্ছিত মূলমন্ত্র সংবিধানে সন্নিবেশিত হওয়ার পর বামঘেঁষা ধর্মবিমুখ তথাকথিত বৈপ্লবিক চিন্তার ধারক-বাহক শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীগণ এই প্রতিষ্ঠানে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করতে শুরু করে। 'অশিক্ষিত গ্রাজুয়েট শেখ মুজিবের দল' বলে আমাদেরকে তারা আর নাক সিঁটকায় না।

রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ন্যাপের এক অংশ প্রকাশ্যেই শেখ সাহেবকে সাধুবাদ দেয়। কয়েকটি কমিউনিস্ট পার্টি, একাধিক ন্যাপ ; আরও সব খুচরা পার্টি এবং বহুবিভক্ত উগ্রবাদীদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সাধারণভাবে জনসমর্থন আকর্ষণে সফল হয় না। সেক্ষেত্রে এতদিন ডান বলয়ে অবস্থান করেও মধ্যপন্থী আওয়ামী লীগ এক্ষণে ধর্মানুভূতীর বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এদেশের নির্ভরযোগ্য বাম স্রোতের প্রধান ধারায় রূপান্তরিত হয়। সোভিয়েত-রাশিয়ার পূর্ণ সমর্থন এবং সীমান্তের ওপারের দাদাদের আশীর্বাদধন্য আওয়ামী লীগে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অভিভাবকদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পিতৃহীনা মেয়েটিকে যথাসম্ভব জ্ঞানদান করে সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাসসহ স্বদেশে প্রেরণ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন তাদের আশ্রয়েই কেটেছে। এবার ওরা ক্ষমতায় আরোহণ করেছে। তাও সম্ভব হত না। একদিকে এরশাদ সাহেবের ইতিবাচক সমর্থন, অন্যদিকে বেগম খালেদা জিয়ার নেতিবাচক অপশাসন। এই দুই কারণে প্রতিহিংসাপরায়ণা এই মহিলা আজ মসনদে জাঁকিয়ে বসে দুই জনকেই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার অপচেষ্টায় মেতেছে।

এরশাদ সাহেবকে বিএনপি যে যন্ত্রণা দিয়েছে তার কোন তুলনা ছিল না। বেগম জিয়াকে এরশাদ সাহেব একবারও গ্রেপ্তার করেননি। কিন্তু সে প্রথম সুযোগেই এরশাদ সাহেবকে আটক করে এবং প্রায় দুই ডজন মামলা দায়ের করে। এরশাদ সাহেবের পক্ষে সে নিপীড়ন সহ্য করা কঠিন। তাঁর মুক্তি চাইতে গিয়ে ন্যূনপক্ষে বার দশেক আমাকে প্রাণে বধ করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল এই দলের দুষ্কৃতিকারীরা। তারা কী না করেছিল! সেই অত্যাচার আর অনাচারের কাহিনী বলে শেষ করা যাবে না। তাই '৯৬ সালের নির্বাচনের পর এরশাদ সাহেবকে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রিত্বের প্রলোভন দেখিয়েও বিএনপি তাঁকে তাদের পক্ষে টানতে সমর্থ হয় না। এরশাদ সাহেব মানুষের প্রত্যাশার মর্যাদা দিয়ে বিএনপি'র অপশাসনের অবসানার্থে দেশে একটি পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে সরকার গঠনে সাহায্য করেন।

www.pathagar.com

উপকারীকে বাঘে খায়। তাই আজ এরশাদ সাহেবের দলকে সরকার দ্বিধা-বিভক্ত করেছে। আমাকে জেলহত্যায় অভিযুক্ত করেছে। কাজী জাফরকে দুর্নীতি মামলায় বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে। এরশাদ সাহেবের জামিন কেটে তাঁকে পুনরায় কারাগারে নিক্ষেপের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। তাঁর পাসপোর্ট আটক করে তাঁকে বিদেশগমনে বাধা দিয়েছে। হাইকোর্ট তাঁর পাসপোর্ট ফেরত দেবার আদেশ দেওয়ার পরও আদালতের সে আদেশ অমান্য করে দ্বিতীয়বার তাঁর পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে বিদেশে যেতে দেয়নি। সাবেক রাষ্ট্রপতি, একটি দলের নেতা এবং একজন এমপি'র প্রতি ক্ষমতাসীনদের গণতান্ত্রিক ব্যবহারের এটা নমুনা। কারণ একটাই। এরশাদ সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী। জনগণকে দেওয়া সমস্ত ওয়াদা বরখেলাপ করেছে। তারা ইতিমধ্যেই বিএনপি'র অনাচার-অত্যাচারের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এই জুলুমবাজ, ওয়াদাভঙ্গকারী, ভিন দেশের পদলেহনকারী, স্বেচ্ছাচারী ও অপদার্থ সরকারকে হটাতে অন্যান্য সব দলের সঙ্গে জাতীয় পার্টিও বদ্ধ পরিকর। আওয়ামী লীগের এই সরকার নাকি ঐকমত্যের সরকার। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে সম্পাদকীয় লেখার পুরস্কারস্বরূপ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এই সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী। জাতীয় পার্টিকে এভাবেই জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করে সরকারের বি-টিম বানিয়ে অপাঙ্‌ক্তেয় করে ছেড়ে দিতে হবে।

এরশাদ সাহেবের শাসনামলের দ্বিতীয় সংসদে গৃহপালিত বিরোধী দলের অনুগত নেতা বলে আখ্যায়িত এবং সে আমলের সর্বাপেক্ষা বড় সুবিধাভোগী আ.স.ম. আব্দুর রব জাসদ থেকে নির্বাচিত একমাত্র সদস্য হয়েও একজন মন্ত্রী। বামপন্থী আবদুস সামাদ সাহেব সময়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে জাতে উঠে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে নাম ভাঁড়িয়ে আজাদ হয়। তাকেও যদি একনিষ্ঠ আওয়ামী লীগ ধরা যায় তা হলে চার ডজন মন্ত্রীর মধ্যে ডজন খানেক আওয়ামী লীগ বলে গণ্য হতে পারে। প্রথম ভাগে প্রধানমন্ত্রী নিজেও আছে। দলের সভাপতি হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত রাজনীতি বা আওয়ামী লীগের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। কট্টর বামপন্থী বলে চিহ্নিত কয়েকজন মন্ত্রী আছে যারা একসময় শেখ সাহেবকে গালমন্দ না করে অন্ন স্পর্শ করত না। তাঁর চামড়া দিয়ে ঢোল বানিয়ে হাড্ডি দিয়ে ডুগডুগি বাজাবার সঙ্কল্প যারা প্রতিটি বক্তৃতায় তীব্র কণ্ঠে ব্যক্ত করত, তারাও সুকন্যার মন্ত্রিসভা অলঙ্কৃত করেছে। বাকিদের এদেশের মানুষ খুব একটা চেনে না। আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। টেকনোক্র্যাট ও সাবেক চাকুরিজীবীরা স্থান পেয়েছে। পিতার আমলের বিশ্বস্ত প্রধান আওয়ামী লীগাররা সকলেই ভ্রাতুষ্পুত্রীর লাথি-ঝাঁটা খেয়েও কেন যে মুখ বুজে পড়ে আছে সেটা সহজেই বোধগম্য!

তথাকথিত আওয়ামী ঐকমত্যের বিপুল সফলতার ফসল নৌকা বোঝাই

www.pathagar.com

হয়ে ব্যর্থতার বঙ্গোপসাগরে নিমজ্জিত হচ্ছে। অত্যাচার-নির্যাতনের সকল রেকর্ড ম্লান হয়ে গিয়েছে। নারী-নির্যাতন এখন কোন ধর্তব্যের বিষয় নয়। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের জনৈক সশস্ত্র ক্যাডার ধর্ষণের শততম রেকর্ডের গৌরব অর্জন করেছে। দলবাজি এখন বাকশাল আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে। ভারতীয় পণ্যে দেশ সয়লাব। বিশেষ সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য অপরিসীম বৃদ্ধি পেয়েছে। মসজিদের সম্মুখ দিয়ে নৃত্যগীতসহ বাদ্য বাজিয়ে যেতে তাদের বাধে না। প্রতিদিন চারদিকে এত খুন, রাহাজানি, ছিনতাই আর নারী-নিষ্পেষণের মাঝেও এক শ্রেণীর শিল্পী-কলাকুশলী মুখে রংচং মেখে বিভিন্ন আনন্দমিছিল, নর্তন-কুর্দন করে যাচ্ছে। সন্ত্রাসীদের সঙ্গে চুক্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রায় হাতছাড়া। অভিভাবকদের পরামর্শেই এসব করা হচ্ছে। এখন তাদেরকে দেশের মধ্য দিয়ে বাণিজ্যিক রুট প্রদান করে করিডোর দেওয়ার পাঁয়তারা করা হচ্ছে। তারা খুবই সন্তুষ্ট! এমনিতে ডেকে নিয়ে উপাধি দেয়! দাদাদের তুষ্টিই পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। অসহিষ্ণু মহিলা সমলোচনা সহ্যে অপারগ। শহীদ মিনার, দোয়েল চত্বর আর বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে মহিলাদের শ্লীলতাহানি নিত্যদিনকার ঘটনা। কিছু-কিছু তথাকথিত উগ্র মহিলা বিষয়টি বোধহয় উপভোগই করে। তা না হলে পরপর লাঞ্ছনার কাহিনী শুনেও তারা বিরত হয় না। কথায় কথায় হামলা ও মামলা দিয়ে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বিচারব্যবস্থার উপর যখন-তখন কটাক্ষ করছে। এদেশের ইতিহাসে হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্টকে নিয়ে এ ধরনের দায়িত্বহীন অযৌক্তিক ও অশালীন উক্তি কেউ কোনদিন শোনেনি। বিচারকদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীনরা লাঠিমিছিল করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে। কোর্ট-কাচারি এখন ভীতসন্ত্রস্ত। ওরা না চাইলে কারো জামিন হবে না। চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। হাইকোর্ট বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আদেশ দিলে ওরা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত বস্তিবাসীদের হাইকোর্ট প্রাঙ্গণ ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর বাসস্থানে প্রেরণ করে এক ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বন্দুকযুদ্ধের সংবাদ আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজগুলোতে রীতিমতো সশস্ত্র যুদ্ধ হয়ে হল, হোস্টেল দখল হচ্ছে। প্রতিদিন ছাত্র নিহত হচ্ছে। সব নিহতদের ছবিও প্রকাশ পাচ্ছে না। কত ছবি ছাপানো যাবে! আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সর্বনিম্ন স্তরে। পুলিশ দ্রুত আস্থা হারাচ্ছে। ফলে বিডিআর ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামান্য ছিনতাইকারীর হাতে সার্জেন্ট নিহত হচ্ছে। ছিনতাইকারীর হাতে শহীদ মিনারের পাদদেশে সরকারের যুগ্মসচিব ছুরিকাঘাতে নিহত হচ্ছে। পক্ষান্তরে পুলিশ বেধড়ক মানুষ পিটাচ্ছে। নিজেদের সোর্সকে হত্যা করে পানির ট্যাংকে দেহ লুকিয়ে রাখছে। আসামী ধরে নির্যাতন করে মেরে ফেলছে। সবরকম অপরাধের সঙ্গে ওরা জড়িয়ে পড়ছে। পুলিশের অসহিষ্ণু মনোভাব

www.pathagar.com

সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পরিস্থিতি জটিলতর করে তুলছে। খোদ কোর্টপ্রাঙ্গণে আইনজীবীসহ একের পর এক হত্যা সংঘঠিত হচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় এক ডজন লোক নিহত হচ্ছে।

সমস্যার পর সমস্যা স্তূপীকৃত হচ্ছে। সমাধান নেই। সরকার ব্যস্ত আছে কোথাও থেকে এতটুক প্রশংসা, সামান্য উপাধি বা একটা পুরস্কার যোগাড় করা যায় কিনা সে প্রচেষ্টায়। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানায় বন্ধাত্ব নেমে আসছে। উৎপাদন সর্বনিম্ন পর্যায়ে। জনজীবনে ত্রাহি ত্রাহি রব।

সকল দিকে ব্যর্থতার গ্লানি মাথায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা উচ্চিংড়ের মতো লাফাচ্ছে। রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় করে দলবল নিয়ে ঘনঘন বিদেশ সফরের বিলাসিতা করছে। রেডিও-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি বেমালুম বিস্মৃত হয়ে সেগুলোকে দলীয় প্রপাগান্ডা কেন্দ্রে পরিণত করেছে। টিভি এখন বাপ-বেটির বাক্সে পরিণত হয়েছে। মুজিব কোটধারীদের আস্ফালনে চারদিক উচ্চকিত। ছাত্রজীবনে বামপন্থী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দম্ভোক্তি আর আস্ফালন সীমা অতিক্রম করেছে। ক্ষমতার অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। বোমাবাজি, গোলাগুলি, লাঠিচার্জ, কাঁদানো গ্যাস আর ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে হামলা চালিয়ে অহরহ গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের বুলি আওড়াচ্ছে। আওয়ামী দুঃশাসন পৈতৃক রেকর্ড ভঙ্গ করে দ্রুত কুশাসনের বিশ্বরেকর্ড স্থাপনে এগিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষমতাসীন দলটির চেহারা এই! বিরোধীদলের অবস্থা কী? পূর্বে ক্ষমতায় ছিল বা পুনরায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটির, সেই বিএনপি'র অবস্থা কহতব্য নয়। আওয়ামী লীগের সঙ্গে আচার-আচরণে, মন-মানসিকতায় খুব একটা প্রভেদ নেই। গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ। সাংগঠনিক দিক থেকে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হলেও বোধগম্য কারণেই ক্ষমতাসীনদের চাইতে তাদের অধিক জনপ্রিয়তা রয়েছে।

তাদের শাসনামলে জাতীয় পার্টিকে ঠেঙাবার প্রশ্নে অবশ্য তারা আওয়ামী লীগের চাইতে কয়েক ডিগ্রি উচ্চে অবস্থান করে। অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে এই জেলহত্যা মামলাটিতে না জড়ালে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিপীড়নের কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ আমি উত্থাপন করতে সক্ষম হতাম না। কিন্তু বিএনপি'র ক্ষেত্রে সেকথা প্রযোজ্য নয়। তারা আদাজল খেয়ে নেমেছিল—জাতীয়তাবাদী ভোটের ক্ষেত্রে কোন অংশীদার রাখবে না। জাতীয় পার্টিকে চিরতরে উৎখাত করতে হবে। সে নীলনকশা নিয়ে যা যা করা প্রয়োজন ছিল সবই তারা করেছে। অতিরিক্ত করেছে। অন্য নির্যাতনের পাশাপাশি কতবার শারীরিকভাবে আক্রান্ত হয়েছি। বেঁচে আছি সেটা নেহায়েতই পরম করুণাময়ের ইচ্ছা। রাখে আল্লাহ্ মারে কে!

www.pathagar.com

দুই মহিলা প্রধানমন্ত্রীই একইভাবে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু ভাগ্যের কী পরিহাস, তার পরও একজন গিয়ে আর একজন আসার পথই প্রশস্ত হচ্ছে। এই আলোচনার প্রারম্ভে নিবেদন করেছিলাম, আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় বসার পিছনে এরশাদ সাহেবের যেমন ইতিবাচক ভূমিকা ছিল, বেগম খালেদা জিয়ারও নেতিবাচক ভূমিকা অবশ্যই কাজ করেছে।

মানুষ সহজে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। বিএনপি'র অত্যাচার-উৎপীড়ন আর অনাচার সহ্য করতে না পেরে পরিবর্তনের স্বার্থে বিকল্পের অনুপস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে উত্তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত চুল্লি। মানুষের ক্লেশের আর সীমা নেই!

চরিত্রগতভাবে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি প্রায় একই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। দুটি দলেরই জন্ম ক্যান্টনমেন্টে সেনাভবনের ডাইনিং রুমের টেবিলে। পার্থক্য কেবল গুণগত মানে।

জাতীয় পার্টির শাসন আমলকে অতি নিন্দুকও একান্তে প্রশংসা না করে পারে না। এই নয়টি বছরকে এদেশে ব্যাপক উন্নয়নের কাল হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সময়টি এদেশের মাপকাঠিতে একটু বেশি প্রতীয়মান হয়। কাজেই মাঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষমতার বাইরে অবস্থানকারী দল ও নেতা-কর্মীরা উঠেপড়ে লাগে এরশাদ সাহেবের শাসনের অবসানের লক্ষ্যে। তিনি একজন সেনাপতি। কিন্তু কবি-মানসের এই লোকটির অন্তঃকরণ ছিল অপেক্ষাকৃত কোমল। মানুষকে কষ্ট দিয়ে, অত্যাচার করে অযথা হয়রানি করে বা গায়ের জোরে রক্তপাত ঘটিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার আগ্রহ বা ইচ্ছা তাঁর কোনদিনই ছিল না। তাঁর সময়ে সরকারি নির্যাতন প্রায় ছিল না বললেই চলে। বিপক্ষের সভা-সমাবেশে হামলা বা ১৪৪ ধারা জারির উদাহরণ ছিল না। গুলি করে নিরীহ মানুষ হত্যা করা, ছাত্রদের মিছিলে আক্রমণ করা বা কৃষক-শ্রমিকের উপর গুলিবর্ষণ করে তাদের হত্যা করার ঘটনা ঘটেনি। কখনও পুলিশের বাড়াবাড়ির কারণে কোন বিক্ষিপ্ত পরিস্থিতির সূচনা হলে তিনি নিজে সেখানে ছুটে গিয়ে তা সামাল দিতেন।

দুই মহিলার ব্যর্থতার মুখে একমাত্র এরশাদ সাহেব এবং তাঁর জাতীয় পার্টিই জনগণের নিকট বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পারত। মানুষের প্রত্যাশাও ছিল তা-ই। দলটিকে সুষ্ঠুভাবে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারলে পরবর্তী নির্বাচনে এককভাবে জাতীয় পার্টি উঠে আসত এবং তারা কারো সহায়তা ব্যতীতই সরকার গঠনে সক্ষম হত।

কিন্তু মূলেই গলদ।

এরশাদ সাহেব যতদিন কারারুদ্ধ ছিলেন, দলে কোন ধস নামেনি। কেউ সেভাবে দল পরিত্যাগ করেনি বা পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। কিন্তু তিনি বেরিয়ে আসার পর এমন সব কর্মকাণ্ড শুরু হল যে অচিরেই দলের এক বৃহৎ অংশ

www.pathagar.com

এদিক-সেদিক চলে যেতে বাধ্য হল। অনিবার্য কারণে দলও কয়েকবার বিভক্ত হল। আজ তাঁর রাজনীতি সীমিত গণ্ডিতে এসে উপনীত হয়েছে। এই দলটির বিকল্প শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করা খুবই কষ্টসাধ্য। নিজের পায়ে কুড়াল মারার কথা শুনেছি। স্বচক্ষে সেটা প্রত্যক্ষ করলাম।

কাজেই এ পার্টি বিদায় হয়ে বি পার্টি আসবে। জনগণের ভাগ্য যেই তিমিরে, সেই তিমিরেই থাকবে। এরশাদ সাহেবকে এ অবস্থার জন্য অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে। ইতিহাসের কাছে তাঁকেও জবাবদিহি করতে হবে।

আর যেসব দল আছে, তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় এ লেখার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। দল অনেকই আছে, মানুষ কম। সাইনবোর্ড ও বিবৃতিকে মূলধন করে তারা টিকে আছে। কারো কারো কোন আর্থিক উৎস আছে। সে কারণে তাদেরকে সময়ে সময়ে মুখ খুলতে দেখা যায়।

বামপন্থী দলগুলো বহুধাবিভক্ত। জনসমর্থনহীন উচ্চাঙ্গের বোলচাল আর কূটতর্কে তারা নিজেদের মধ্যেই দলাদলিতে ব্যস্ত।

দক্ষিণপন্থী বা ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন দলগুলোর অবস্থা সুস্পষ্ট নয়। দেশে পরপর মহিলা-শাসন চলছে। এটা ধর্মের অনুশাসনের পরিপন্থী। কিন্তু তাদের ভূমিকা যথেষ্ট জোরালো নয়। জেহাদের ডাক শোনা যায় না। কখনও সামান্য প্রতিবাদেই নিজেদের কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ করে।

এটি সর্ববিবেচনায়ই একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এদেশে মহিলা-শাসন যে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়, একথা প্রকাশ্যে বলতে আমাদের ধর্মীয় নেতাদের দ্বিধার অন্ত নেই। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরানে বারংবার মহিলাদের অবস্থানের কথা নির্দেশ করেছেন। পুরুষের স্থান যে তাদের ঊর্ধ্বে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কম করে হলেও এক লাখ ষাট হাজার পয়গম্বর প্রেরণ করেছেন। তার মধ্যে একজনও মহিলা পাঠাননি। এ থেকেই কি তাঁর মনোবাঞ্ছা পরিষ্কার হয়ে ওঠে না!

তার পরও এই মুসলিম দেশটিতে নারী-শাসন পরম্পরায় চলছে, চলবে! আমাদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সেভাবে রুখে দাঁড়াবে না। তার পরও কি ধর্ম, ধর্মীয় শাসন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের অভিমত প্রদানের খুব একটা অধিকার বর্তায়!

জুয়া, মদ, মেয়েদের দেহব্যবসা, লটারি প্রভৃতি ধর্মে নিষিদ্ধ। পবিত্র কোরানেও সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ বিদ্যমান। অশ্লীল নাচ-গান, মেয়েদের দেহের নানা অঙ্গভঙ্গি ও ছলাকলার শোভাযাত্রা জনগণে প্রতিনিয়ত প্রদর্শিত হচ্ছে। পত্রিকায় খবর ও ছবি বেরুচ্ছে। দেশের মধ্যে এসব কেবল নির্বিবাদে চলছে তা-ই নয়, কোন কোনটি সরকারি উৎসাহ ও স্বীকৃতি লাভ করে বৈধ পন্থায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। মূর্তিপূজা মহাপাপ। বিধর্মীরা করছে, বলার কিছু নেই। কিন্তু সাহায্য-সমর্থন ও অনুদান প্রদান গর্হিত অন্যায়। কিন্তু এসবেও

www.pathagar.com

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব পরিলক্ষিত হয় না। রাজনৈতিক ধোঁকাবাজির কারণে তসবিহ টেপার যেমন প্রদর্শনি চলে, পূজামণ্ডপে নৈবেদ্য আস্বাদনেও কিছুমাত্র শৈথিল্য পরিদৃষ্ট হয় না।

ইসলামি দলগুলো নিশ্চুপ কেন?

একমাত্র জামাতে ইসলামী ব্যতীত অন্যদের সেরকম শক্তি-সামর্থ বা সাংগঠনিক ভিত নেই যে তারা বলিষ্ঠ কর্মসূচি দিতে পারে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ন্যক্কারজনক ভূমিকার দরুন তাদের মেরুদণ্ডে শক্তির অভাব। সামান্য যা আছে তাও নিজেদের মধ্যে কূট-তর্ক ও সংঘাত সৃষ্টি করে ভিন্নখাতে প্রবাহিত হচ্ছে। অথচ, এই দেশটার শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ মনেপ্রাণে মুসলমান এবং তাদের ধর্মীয় অনুভূতি বিশ্বে সেরা। সেদেশেই নেতৃত্ব দিচ্ছে মহিলা। ধর্মে যাদের ইমামতি নিষিদ্ধ তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইমাম বনে বসে আছে।

আমাদের সেলে তিনটি দৈনিক আসে। দুটি বাংলা, একটি ইংরেজি। 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ' ও 'বাংলাদেশ অবজারভার'।

আমি 'ইত্তেফাক' ও 'অবজারভারে' চোখ বুলাই। তৃতীয় কাগজটা পারতপক্ষে স্পর্শ করি না। ওটার মধ্যে আজও পাকিস্তান আমলের সেই মুসলিম লীগ বা খুনি নুরুল আমীনের প্রেতাত্মা ভর করে আছে। এখন নাকি পত্রিকাটি জনৈক ধনী ব্যবসায়ীর মালিকানাধীন। তিনি আবার শখের বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত।

এই পত্রিকাটিতে সেদিন পড়লাম এক সবজান্তা সাংবাদিক আবিষ্কার করেছে আমরা নাকি আওয়ামী লীগের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের চর হিসাবে ঘাপটি মেরে ছিলাম। শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! সাংবাদিকটি নিশ্চয়ই এই লাইনে অভিজ্ঞ! অনুপ্রবেশকারী চর হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চয়ই সে পূর্বঅভিজ্ঞতাসম্পন্ন! হয়ত সে নিজেই মার্কিন চর বা অন্য কোন দেশের, তা না হলে এ ধরনের হীনমন্তব্য করতে তার বিবেকে বাধা ঘটত।

কাদের সম্বন্ধে মন্তব্য করছে? না জেনে, না শুনে এ ধরনের অর্বাচীনের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করা যে কতটা মারাত্মক অপরাধ তা উপলব্ধি করার মন-মানসিকতা সেই উন্নাসিক প্রায়-উন্মাদ সাংবাদিক নামধারী ব্যক্তিটির আছে কি না জিজ্ঞাস্য!

www.pathagar.com

তাকে চিনি না। কখনও নামও শুনিনি। অনুসন্ধান করলে হয়ত জানা যাবে নতুন প্রজন্মের কোন বালখিল্য উদ্ভাবকের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত এই রচনা দ্বারা সে তার কোন অধুনা মনিবকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পেয়েছে। অথবা স্বীয় স্বার্থে কোন শক্তিধর পদযুগলে পর্যাপ্ত তৈলমর্দনে ব্রতী হয়েছে। এ ধরনের চরিত্রহননমূলক সাংবাদিকতার মুখে সম্মার্জনীর সম্বর্ধনাই প্রকৃষ্ট বিধান। খবর নিলে জানা যাবে আমাদের সম্বন্ধে তার জ্ঞান সীমিত, নেই বললেই চলে। আমরা যখন রাজনীতির মধ্যগগনে অবস্থান করছি তখন হয় সে মাতৃক্রোড়ে নতুবা তখনও তার জনক-জননী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়নি।

নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি, প্রায় কৈশোরেই ছাত্ররাজনীতির পাদপীঠে আমার পরিভ্রমণ। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রআন্দোলনে আমার প্রথম অভিষেক। পুলিশের লাঠিচার্জে রক্তাক্ত আহত অবস্থায় সেদিনই নবম শ্রেণীর ছাত্র, আমি প্রথম কারাবরণ করি। তার পর থেকে জীবনে আর পশ্চাতে ফিরে তাকাবার অবকাশ হয়নি। এই দেশ এবং তার মানুষের কল্যাণে প্রতিটি আন্দোলন আর সংগ্রামে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে জীবন-যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়গুলো কারাগারের অন্ধকারে অতিবাহিত হয়েছে। বারংবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কোনদিন আপস করিনি। জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ রুদ্ধ কারার বদ্ধ ঘরে কেটে গেছে।

'৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশে মার্শাল ল' জারি করে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দিলে সেদিন অন্যান্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ডও স্তব্ধ হয়ে যায়। সভাপতি সিএসপি হওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত, সংগঠন থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করছে। সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেত চলে গেল। অন্যান্য কর্মকর্তাদের কোন খোঁজ নেই।

সংগঠনের সেই সর্বাধিক দুঃসময়ে একে নতুন করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে সেদিন আমাকেই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। মৃতপ্রায় সে সংগঠনটিকে নতুন করে গড়ে তোলার দায়িত্ব সেদিন নিজেই স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলাম। কোন পরামর্শ, উপদেশ বা নির্দেশের বাধ্য-বাধকতা ছিল না। সদ্যসংগৃহীত মুষ্টিমেয় ছাত্র-সহকর্মী ব্যতীত পাশে দাঁড়াবার কেউ ছিল না। অপরিমেয় পরিশ্রম ও সাধনায় ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটিকে পুনর্জীবিত করে তুলেছিলাম। পরবর্তী প্রতিটি আন্দোলন আর সংগ্রামে ছাত্রলীগ যে দায়িত্ব পালন করেছিল তার সিংহভাগ অবদানের কারণে সেসময় আমাকে ছাত্রলীগের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতারূপে সর্বমহল স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করেনি। আত্মস্তুতি প্রকাশের জন্য নয়, সঠিক চিত্র তুলে ধরার স্বার্থে বিশাল কর্মযজ্ঞের সারাংশের সামান্যতম অংশ তুলে ধরলাম। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পরবর্তীতে

www.pathagar.com

তিন তিন বার সভাপতি হিসাবে আমার সেদিনকার ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক এবং কিংবদন্তিতুল্য।

নিম্নমানের সংবাদপত্রটির আরও নিকৃষ্ট প্রতিবেদকের এসব জানার কথা নয়। আমরা যখন সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ তখন দুই-একজন সম্মানজনক ব্যতিক্রম ব্যতীত কোন রাজনৈতিক নেতাকে সক্রিয় হওয়া দূরের কথা, সহানুভূতিসম্পন্নও পাইনি। ছাত্রদেরকেই আন্দোলনের স্বার্থে তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়েছে সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণের তাগিদ নিয়ে।

বাংলাদেশ বা সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানচিত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান নিতে পেরেছিল। সেই ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক অধ্যায় রচিত হয়েছিল আমাদেরই সময়ে। এটা সর্বজনবিদিত যে, তার ঐতিহাসিক নেতৃত্ব সেদিন আমাদের উপরই ন্যস্ত ছিল। ছাত্রনেতা হিসাবে অতুলনীয় সফলতার পর কর্মজীবনে প্রবেশ করে আওয়ামী লীগে যোগদান করে আজীবন সংগ্রামের ধারাকেই অব্যাহত রেখে এসেছি।

বঙ্গবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁর সঙ্গে রাজনীতি করেছি। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে তাঁর শেষ ইচ্ছার অমর্যাদা ঘটিয়ে তাঁর অরাজনীতিক কন্যার সঙ্গে রাজনীতির অঙ্গনে থাকতে পারিনি। অন্য সংগঠন গড়ে তুলেছি।

কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে আমরা আজ সরকারি নির্যাতনের শিকার। সরকারের পদলেহী তাঁবেদার গোষ্ঠীও আদা-জল খেয়ে নেমেছে আমাদের চরিত্রহননের সর্ববিধ প্রচেষ্টায়। ফলশ্রুতিতে মুখচেনা ওই সংবাদপত্রটিতে দেখতে পাই আমরা নাকি আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি-মারা মার্কিন চর!

সাংবাদিকতার একটা ন্যূনতম চরিত্র ও নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য এদের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না। যে যেই রাজনীতির ধারক-বাহক সে সেই রাজনীতির স্বার্থে নিজের মনের কল্পনা মিশিয়ে যাচ্ছেতাই রচনা করে যাচ্ছে। সাংবাদিকতা নয়, ওটা দলীয় রাজনীতিরই কলুষময় বহিঃপ্রকাশ।

কেবল তা-ই নয়, সাংবাদিকতার নামে যে মিথ্যাচার, অপপ্রচার এবং সর্বোপরি ব্ল্যাক মেইলিংয়ের প্রবণতা এদেশে ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে একসময়ের এই সম্মানিত পেশাটির প্রতি ধৈর্য ধরে আর শ্রদ্ধা পোষণ করা যাচ্ছে না। সাংবাদিকতার উপর বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে এই মুহূর্তে উৎসাহী নই। এই পেশাটিকে পৃথিবীর অন্যতম আদি পেশার সঙ্গে যারা শ্রেণীবদ্ধ করে একত্রে গ্রথিত করার প্রয়াস পেয়েছে, তারা নিশ্চয়ই এ ধরনের ভুঁইফোঁড় স্বার্থান্বেষী ও নীতিবিহর্গিত সাংবাদিক

www.pathagar.com

নামধারীদের অমার্জনীয় মিথ্যার বেসাতি অবলোকন করেই তাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল।

শুধু এইটুকুই নিবেদন, সাংবাদিকতাকে ইতরতার পর্যায়ে নামিয়ে আনা অতীব দুঃখজনক। সেটা কোন পক্ষের জন্যই শুভ হবে না।

জিয়াউর রহমান সাহেব বার দু'য়েক আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করার কষ্ট স্বীকার করেছেন। তার বেগম সাহেবাও পিছিয়ে নেই। সেও দু'বার আমাকে কারাগারে অন্তরীণ করে স্বামীর গৌরবময় পদাঙ্ক অনুসরণ করে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্বামীর আমলের দু'বারই ছাব্বিশ সেলে স্থান হয়েছিল। কিন্তু বেগম সাহেবার আমলে একবার এখানে অন্যবার পনেরো সেলে রাখা হয়। পনেরো সেলেই '৯২-তে জীবনের প্রথম জেল-বিদ্রোহের মাঝে নিপতিত হই। সে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

জিয়া সাহেব যখন প্রথম বার গ্রেপ্তার করে, শুরুতে কিছুদিন নতুন বিশ সেলের দ্বিতলে আমাদেরকে রাখা হয়েছিল। মোশতাক সাহেব, মঈনুল হোসেন এবং ওবায়দুর রহমানকেও সেখানে রাখা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের আবদুল মালেক উকিল, আবদুল মমিন তালুকদার এবং মোজাফফর হোসেন পল্টুকেও একসঙ্গে রাখা হয়। আমরা কর্তৃপক্ষকে ছাব্বিশ সেলের অনুরোধ রাখলে তারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয় না। সেখানে আওয়ামী লীগারদের রাখা হয়েছে। তাদের বিবেচনায় পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে আমাদেরকে ছাব্বিশ সেলে আনা হয়। জিল্লুর রহমান সাহেবসহ বেশকিছু আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী তখন সেখানে অবস্থান করছে। একসঙ্গে বাস করে একত্রে খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, আলোচনা-সভা করা বা নামাজ পড়াতে কোন অসুবিধা ছিল না। সকলেই মোশতাক সাহেবের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করেছে। তাকে রাজশাহী কারাগারে স্থানান্তরের দিন খুলনার ইউসুফ সাহেব অহেতুক তাঁর সঙ্গে কিছুটা দুর্ব্যবহার করে। সকলের সঙ্গেই নাকি সে এ ধরনের ব্যবহারে অভ্যস্ত।

মঈনুল হোসেন এবং ওবায়েদুর রহমান পরপর মুক্তি পেয়ে গেলেও আমাকে বেশ কিছুদিন আটক থাকতে হয়। হাইকোর্ট থেকে মুক্তির আদেশ না আসা পর্যন্ত ছাব্বিশ সেলে পূর্বতন সহকর্মীদের সঙ্গে সময় কাটে। এ সময়ই একদিন ছাব্বিশ সেলের পশ্চিম দেওয়াল টপকে ঢাকা শহরের আমাদের এক সময়ের পরিচিত কর্মী গেণ্ডারিয়ার প্যাটেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জেলের ভিতরে

www.pathagar.com

প্রবেশ করে। ঘটনাটা অভিনব ও অচিন্তনীয়। জেলখানায় চমক সৃষ্টি হয়। জেল ভেঙে পালাবার ঘটনাই এতদিন শোনা গিয়েছে। এখন ভিন্নটা দেখা গেল। এখান থেকে সকলে বের হতে চায়। কিন্তু সে ভিতরে প্রবেশ করে অবৈধ পথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। জিজ্ঞাসার জবাবে সে জানায় বহু চেষ্টা করেও সে তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে এ পন্থা বেছে নিয়েছে। আমাদের সকলের সুপারিশে সে-যাত্রা সে ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করে এবং কর্ত্রীপক্ষের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করে।

ছাব্বিশ সেলে এসে মালেক উকিল সাহেব আওয়ামী লীগারদের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। অবশ্য জনশ্রুতি এরূপ যে, এই উকিল সাহেবই বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর লন্ডনে মন্তব্য করেছিল, দেশ ফেরাউনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

মালেক উকিল সাহেব বিভিন্ন সময়ে একব্যক্তি শাসন ও একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে সঙ্গোপনে অনেক কড়া মন্তব্য করত। আবার অবস্থা বুঝে সেসব অস্বীকার করতেও তার বাধত না।

সেবার দু'রাতের জন্য আমাকে নোয়াখালীর আর এক আওয়ামী লীগ নেতা নুরুল হক সাহেবের সঙ্গে এককক্ষে কাটাতে হয়েছিল। শালবৃক্ষসদৃশ বিশালদেহী নুরুল হক সাহেব প্রারম্ভেই নিবেদন করেছিল ঘুমের ঘোরে তার প্রচুর নাম ডাকে। অসুবিধা হবে না তো?

এ অভ্যাস কমবেশি অনেকেরই রয়েছে। তাকে ভরসা দিয়েছিলাম, সইতে পারব।

কিন্তু রাতের বেলা প্রত্যক্ষ করি, এটা কোন সাধারণ নাকডাকা নয়। এটা রীতিমতো ব্যাঘ্রের গর্জন! তার চাইতেও ভয়ানক। দুইটি চলন্ত ট্রেনের ইঞ্জিন দুই দিক থেকে একসঙ্গে ছুটে এলে যে ভীষণ শব্দ হয় জনাব নুরুল হকের দুই নাসিকা থেকে প্রায় একই প্রকার বিচিত্র গর্জন বেরিয়ে আসছে। নানা প্রকারের অদ্ভুত শব্দ একই সঙ্গে নির্গত হচ্ছে। এক ঘরে বাস করার প্রশ্নই আসে না, দেওয়াল ভেদ করে তার নাসিকাগর্জনের কারণে পাশের ঘরের মানুষেরও নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। বিছানার উপর বসে তার এই অভূতপূর্ব নাকডাকা প্রত্যক্ষ করছি, আর ভাবছি রাতের ঘুমের কোন আশা নেই। দিনেরবেলা পুষিয়ে নেব এবং যে-করেই হোক কালই অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে হবে। সে একসময় জেগে উঠে আমার অবস্থা প্রত্যক্ষ করে লজ্জিত হয়। নানাভাবে চেষ্টা করে নাকডাকা বন্ধ করতে। গামছা দিয়ে নাক-মুখ বেঁধে শোয়। কিন্তু তাতে কামান দাগার আওয়াজ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা হয় না। জীবনে অনেক নাকডাকা শুনেছি, কিন্তু নুরুল হক সাহেবের এই নাসিকাগর্জনের তুলনা নেই।

শেষ পর্যন্ত সে উঠে বসে থেকে আমাকে ঘুমাবার সুযোগ দেয়।

www.pathagar.com

পরদিনই তাকে রুম ছেড়ে দিয়ে আমি একনম্বর ঘরে চলে যাই। সুযোগও এসে যায়, সেখানকার অন্যতম বাসিন্দা শ্রমিকনেতা রুহুল আমিনের অন্য জেলে স্থানান্তরের আদেশ এসে যায়। আমি অনতিবিলম্বে তার পরিত্যক্ত স্থানে আশ্রয় নিয়ে সে-যাত্রায় অসামান্য নাসিকা গর্জনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি। রুহুল আমিনও আজ পৃথিবীতে নেই। অল্পবয়সেই তার জীবনাবসান ঘটে। তার স্ত্রী কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছিল। তাকে নিয়ে আমরা খুব পরিহাস করতাম। রুহুল আমিন কয়েক বছর ধরে জেলে থাকার সময় তার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমরা সুযোগ পেয়ে ভাবিকে খুব খ্যাপাতে চেষ্টা করি, স্বামী রইল কারাগারে আপনার সন্তান হয় কী প্রকারে?

সলজ্জ হেসে সে জবাব দিয়েছিল, হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় কেবিনে স্ত্রীর সঙ্গলাভ করে। জেনেশুনেও ভাবিকে আমরা লজ্জায় ফেলার চেষ্টা করতাম।

বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে সামরিক অভ্যুত্থান, ঢাকায় তার পুনরাবৃত্তি এবং জাপানি প্লেন হাইজ্যাক নাটকের ডামাডোলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়বার যখন জিয়াউর রহমান সাহেব আমাকে গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে আসে সেবারও ছাব্বিশ সেলের এক নম্বর কক্ষেই স্থানলাভ করেছিলাম।

সে সময় বিচারের নামে প্রহসন করে না-হক খুনের নাটক প্রতিদিন অভিনীত হতে দেখেছি। অদূরে ফাঁসির মঞ্চে আলো জ্বলে উঠলে বুঝতে পারতাম আজ কোন হতভাগ্যের জীবনের অবসান হতে যাচ্ছে। নীরব অশ্রু-বিসর্জনের সঙ্গে কারাপ্রহরী তার সশস্ত্রবাহিনীতে কর্মরত সহোদরকে ফাঁসিকাষ্ঠে নিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে সৃষ্টিকর্তার দরবারে অভিযোগ জানাচ্ছে, আল্লাহ্, তুমি তো জানো আমি নির্দোষ। বিনা দোষে যে আমাকে ফাঁসি দিচ্ছে, তুমি তাকে ক্ষমা কোরো না।

পরম করুণাময় সে ফরিয়াদ কীভাবে নিয়েছিলেন জানি না। কিন্তু জিয়াউর রহমান সাহেবের পরিণতি দেখে সেই আর্তনাদের কথা স্মরণে জেগে ওঠে। একই সময়ে, এই পরিস্থিতিতে আমাকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। প্রথম দশ দিন পর্যন্ত আমার গ্রেপ্তারের সংবাদ সরকারিভাবে প্রকাশ করা হয়নি। আমার পরিবার-পরিজনের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ছাব্বিশ সেলে আমার অবস্থাও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাতারাতি মাথার চুলগুলো পেকে যায়। যারপরনাই দুর্ভাবনায় নিতান্ত কাতর হয়ে পড়ি। সেসব দিনের কথা ভোলার নয়।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। হাইকোর্টে আমার আটকাদেশের বিরুদ্ধে রিট করা হয়। বিচারপতিদ্বয় আমাকে কোর্টে উপস্থিত করার নির্দেশ দিলে আমি নিজের

www.pathagar.com

বক্তব্য তাদের কাছে তুলে ধরার দুর্লভ সুযোগ লাভ করি। তারা অবিলম্বে আমার মুক্তির নির্দেশ প্রদান করায় অল্পদিনেই সে-যাত্রায় রেহাই পাই।

বেগম জিয়ার প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে দ্বিতীয়বার যখন সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কারাগারে প্রেরিত হই তখনও ছাব্বিশ সেলেই এনে রাখা হয়। খাদ্য মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে থাকাকালীন কয়েকটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে মামলা দায়ের করা হয়। সেসময়ের প্রতিমন্ত্রী রাজশাহীর নুরন্নবী চাঁদকেও সে মামলায় জড়ানো হয়।

আমরা মামলার সম্বন্ধে অবগত হয়ে কোর্টে আত্মসমর্পণ করলে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের জামিন নামঞ্জুর করে জেলে প্রেরণ করে। পুনরায় ছাব্বিশ সেলে এসে উপস্থিত হই।

এখানে তখন আমার প্রিয়ভাজন কর্মী মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ির জি. এম, ইকবাল বাচ্চু হালদার তার ভাই-বন্ধু ও সহযোগীদেরসহ কারাদণ্ড ভোগ করছে। টঙ্গিবাড়ির বিখ্যাত বন্দুকযুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মার্ডার কেসে তাদের দীর্ঘ সাজা হয়। বাচ্চু হালদার ছিল নিজ এলাকায় একজন প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। অল্প বয়স থেকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসাবে এবং একজন সচেতন সমাজকর্মীরূপে সে অঞ্চলে তার ছিল প্রভূত জনপ্রিয়তা ও প্রবল প্রতাপ। বংশানুক্রমিক শত্রুতার জের হিসাবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডে সে শাস্তি ভোগ করছিল। জেলখানায় চেয়ারম্যান সাহেব বলেই সে খ্যাত। শ্রেণীপ্রাপ্ত কয়েদি হিসাবে সে জেলও খাটছে সগৌরবে এবং মর্যাদার সাথে। এই মামলায় না জড়ালে সে উপজেলা চেয়ারম্যান, এমনকি সংসদ সদস্য হয়ে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হওয়াও বিচিত্র ছিল না।

জেলখানায়ও তার দারুণ প্রতাপ। আমাদেরকে পেয়ে বাচ্চু এবং তার সাথীগণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাচ্চুর নিজস্ব তদারকিতে আমাদের আদর-আপ্যায়নের সীমা থাকে না। সকালে নাস্তা দেওয়া হয় আট পদের। দ্বিপ্রহর ও রাত্রির খাবারের নানা বৈচিত্র্য আনা হয়। নুরন্নবী চাঁদ রসিক মানুষ। জেলের অভ্যন্তরে এত যত্নআত্তি প্রত্যক্ষ করে সে বলে, স্যার, এমন জানলে কোন ঘটনা ঘটিয়ে জেলে এসে বসে থাকতাম। ঢাকায় আমাকে হোটেলে খেতে হয়।

সেবারও জজকোর্টে নিজেই জামিনের পক্ষে বক্তব্য রাখি। আমার সুদীর্ঘকালের সতীর্থ অ্যাডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেনও আমাদের জামিনের পক্ষে যুক্তিতর্ক প্রদর্শন করে। জামিন লাভ করে স্বল্পকালের মধ্যেই মুক্তির আদেশ এলে চাঁদ বলে, স্যার, এত আদর-যত্ন ফেলে আমি বাইরে যাব না!

আজ কোথায় বাচ্চু হালদার আর কোথায় নুরন্নবী চাঁদ!

বাচ্চু কিছুদিন পরই মুক্তি পেয়ে বাইরের জগতে যায়। কিন্তু বিধাতার

www.pathagar.com

ইচ্ছা নয় সে দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করুক। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় গিয়ে সেখানেই আকালে এই মহৎপ্রাণ যুবকের জীবনাবসান ঘটে।

ছাব্বিশ সেলে বসেই সেদিন দেখলাম বাচ্চুর বয়সী নুরন্নবী চাঁদও ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছে। কতইবা তার বয়স! প্রায় যুবক বলা চলে। মাত্র একটি শিশুপুত্রের জনক। বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী নুরন্নবী চাঁদ রাজশাহীতে রাজনৈতিক অঙ্গন এবং খেলাধুলার ক্ষেত্রে সমভাবে বিচরণ করত। জাতীয় পার্টিতে একসময় সে যুগ্ম-মহাসচিব হয়েছিল। আমাদের শাসনামলের শেষ পর্যায়ে সে প্রতিমন্ত্রী হয় এবং আমার সঙ্গেই খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সমাসীন হয়। বাকপটু ও সুরসিক চাঁদ আমাকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করত। রাজশাহী গিয়ে দু'বার তার বাড়িতে অবস্থান করেছিলাম। আমের মৌসুমে একবার তার বাসায় তার সঙ্গে প্রাতরাশ করতে বসলে সে আমাকে ডজনখানেক আম এগিয়ে দিয়ে বলে, স্যার, প্রতিটি আমের ভিন্ন স্বাদ এবং ভিন্ন নাম। সবগুলোই আস্বাদন করতে হবে।

আমি মন্তব্য করেছিলাম, তুমি কি পাগল হয়েছ? এই প্রাতরাশ খাওয়ার পর এতগুলো আম খাওয়া সম্ভব!

নিশ্চয়ই সম্ভব।

বলে সে কার্যতও তা দেখিয়ে দিয়েছিল। ছাব্বিশ সেলে স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় ছেলেদের সঙ্গে সে সুন্দর ব্যাডমিন্টন খেলে ক্রীড়াজগতে তার নৈপুণ্যের কিছুটা আভাস প্রদান করেছিল।

বেগম জিয়া আমাদের দু'জনকে যে মামলায় গ্রেপ্তার করে এনেছিল সে মামলা এখন কোথায় কী অবস্থায় আছে জানি না। কিন্তু চাঁদ সব জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে চলে গেছে। আমাকে রেখে গেছে, তার এবং আমার উভয়ের পক্ষে সাফাই দেওয়ার জন্য।

সে মামলাও গায়ের জোরেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুর্নীতি দমন বিভাগ সবক'টিতে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদান করে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আমার নাম শুনতে পারে না। নথি ছুড়ে ফেলে দিয়ে নির্দেশ দেয়, নির্দোষ হলে কোর্ট থেকে খালাস পাবে, চার্জশিট দিয়ে দাও।

ওরা বলেছিল, ম্যাডাম, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোন অভিযোগ দাঁড় করানো যায় না।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মহিলাদের রোষের শিকার হওয়ার ভাগ্যলিখন খণ্ডাবে কে! উত্তরাধিকারের রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণের দুর্মতির কারণে এ দুর্ভোগ তা উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না।

ছাব্বিশ সেলের এক নম্বর ঘরে বর্তমানে থাকে জনাব রায়হানুল ইসলাম।

www.pathagar.com

দীর্ঘ জেলজীবনে অনেক চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি। কিন্তু রায়হান সাহেব এক বিচিত্র চরিত্রের মানুষ। তার অপরাধটিও ব্যতিক্রমধর্মী। জেলখানা মানেই অপরাধীদের কেন্দ্রবিন্দু। বিনা অপরাধেও কারাবাসের ঘটনা অপ্রতুল নয়। রাজনৈতিক কারণে বন্দি হওয়া এদেশে অতি চিরন্তন।

মার্ডার হচ্ছে জেলখানার কুলীন অপরাধ। অন্য অপরাধের তুলনায় মার্ডার কেসের আসামী বলতে এখানে কেউ-কেউ শ্লাঘাবোধ করে থাকে। ইদানীং অবশ্য অস্ত্র-মামলার কথা বলে প্রকাশ্যে কেউ-কেউ আত্মতৃপ্তি লাভ করে। রায়হানুল ইসলাম সাহেবও একজন হত্যাকারী। কোর্টে দাঁড়িয়ে নিজে স্বীকার করেছে, একমাত্র পুত্রকে নিজহাতে গুলি করে সে হত্যা করেছে।

পুত্র হত্যাকারী এই মানুষটি কেমন তখন জানার খুব আগ্রহ হয়েছিল। পুত্র বখাটে বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে জনক তাকে পুলিশে সোপর্দ করে। আশা, ভবিষ্যতে সন্তান সংশোধিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। পিতার অবশ্য জানার কথা নয়, জেলখানাই অপরাধ জগতের বৃহত্তর ট্রেনিংক্ষেত্র।

পত্রিকাতে যেদিন প্রথম এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পড়ি, তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। জন্মদাতা পিতা স্বভাবতই স্নেহান্ধ হয়ে থাকে। তার পক্ষে কী করে এটা সম্ভব!

সংবাদপত্রের প্রতিবেদন পাঠ করে অবগত হয়েছিলাম, তার একমাত্র মেধাবী পুত্র ছাত্রজীবন সমাপনান্তে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে জড়িত হয়েছে। তখনও অবিবাহিত, একটি মেয়েকে ভালোবাসে। হয়ত তা-ই নিয়ে তর্ক বাধায় একসময় অসহিষ্ণু রায়হান সাহেব রিভলভার দিয়ে নিজহস্তে পুত্রকে হত্যা করে। পুলিশের কাছে এবং পরে কোর্টে সেকথা স্বীকার করে। ফলে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়। ডিভিশন দেওয়া হলে সে ছাব্বিশ সেলে স্থান পায়।

এবার যখন ছাব্বিশ সেলে উপস্থিত হই, এখানকার পূর্বতন বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত মেজর ওয়াহেদ, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হালিম এবং নাইজেরিয়ার অধিবাসী রবার্ট আমাদের অভ্যর্থনা জানায়। মেজর ওয়াহেদ ছাত্রজীবনে ফজলুল হক হলে আমাদের কর্মী ছিল। সে দৌড়ে এসে আমাদের আলিঙ্গন করে। সে অস্থির হয়ে পড়ে কী করে আমাদের এখনকার অবস্থান সামান্য সহনীয় করে তুলবে। মেজর হালিমও এসে আন্তরিক করমর্দন করে বলে, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, যদিও এটা কাউকে স্বাগত জানাবার স্থান নয়।

রবার্টও এসে হাত মিলায়। কিন্তু এক নম্বর ঘরের সাহেব তার ঘরেই নির্বিকার বসে। জিজ্ঞেস করতেই দুই মেজর জানায় সে স্বেচ্ছানির্বাসিত জীবন-যাপন করে। প্রয়োজন ব্যতিরেকে কারো সঙ্গে মেশে না, কথা বলে না। অন্যেরাও সহজে কেউ তার ধারেকাছে ঘেঁষে না।

www.pathagar.com

শুনলাম সে নাকি বর্তমানে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছে।

জিজ্ঞেস করি, কারো সঙ্গে কথা না বলে সে কী করে কিচেন ম্যানেজ করে?

এরা জানায়, প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বা রান্নার লোকদের সঙ্গে ন্যূনতম আলাপ করে থাকে। নিজের ঘরে বসেই সেটা সম্পন্ন করে।

জেলখানায় ম্যানেজারদের মোটামুটি ব্যস্ততার দিন কাটে। বাজারের মিয়াসব, গুদামের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি, স্টোর ক্লার্ক, রান্নার কাজে নিয়োজিত কয়েদিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেই হয়। প্রয়োজনে স্টোরেও যেতে হয়। ডায়েট বাটার জন্য কিচেনে যেতে হয়। কিন্তু ছাব্বিশ সেলের এবারের ম্যানেজার এক ভিন্ন চরিত্রের মানুষ। পারতপক্ষে সে কারো সঙ্গে কথা বলে না, অন্যরাও তাকে সহজে ঘাঁটাতে চায় না। খাওয়াদাওয়ার মান স্বভাবতই নিম্নতম পর্যায়ে চলে এসেছে। বারোভূতে লুটেপুটে খাওয়ার আস্তানা এই জেলখানা। সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও এখানে অভিষ্ট ফল লাভ করা কষ্টসাধ্য। সেখানে একজন নির্লিপ্ত, নির্বিকার ও নির্বাসিত মানুষের ব্যবস্থাপনায় সুফল লাভের প্রশ্নই আসে না।

আমরা জিজ্ঞেস করি, তার সঙ্গে সৌজন্যমূলক কথা বলা কি উচিত নয়?

এরা জানায়, সে নিজের থেকে কথা বললে ভালো, নতুবা কোন প্রয়োজন দেখছি না।

এ-যাত্রায় যারা ছাব্বিশ সেলের সিনিয়ার তাদের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

রায়হান সাহেব সারাদিন নিজের ঘরে চেয়ারটিতে উপবেশন করে আছে। সর্বক্ষণ রেডিও শুনছে। ফালতু সকাল-দুপুর ও বিকেলে ঘরে খাবার দিয়ে আসে। আর কারো সঙ্গে যোগাযোগ নেই। কী এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

দিনের মধ্যে একবার সে বের হয়। খুব প্রত্যুষে একটি খুঁচুনি নিয়ে সে সেলসংলগ্ন বাগানে যায়। কয়েকটি ফুলের চারায় সামান্য মাটি কুপিয়ে দেয়। কখনও একটু পানি দেয়। কখনও কোন-একটি গাছে সস্নেহে হাত বুলিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে। কখনও একটি-দুটি ফুলগাছের ডাল ভেঙে অন্যত্র রোপণ করে পানিসিঞ্চন করে। গাছটি অবশ্য জন্মলাভ করে না। একই কাজ সে বারবার করে। সেই বৃক্ষরোপণের নাটকের মতো। পিয়ন বড় সাহেবাকে একটি জায়গা দেখিয়ে বলে, স্যার, এখানেই বৃক্ষরোপণ করুন। এই জায়গাতেই সমস্ত নবাগত সাহেবরা বৃক্ষ রোপণ করে থাকে।

সকালের পর সারাদিনের জন্য রায়হান সাহেব স্বীয়কক্ষে আবদ্ধ হয়ে যায়। বাগান পরিচর্যার সময় একটি বিড়ালকে দেখি তার পায়ে-পায়ে হাঁটছে। কোনদিন কাগজে করে সামান্য দুধ-চিনি বিড়ালটিকে খেতে দেয়।

অনেক পরে আমি একদিন বলেছিলাম, বিড়ালকে ভালোই ব্রেকফাস্ট দিয়েছেন।

www.pathagar.com

সে সেদিন শব্দ করে হেসেছিল। তখন আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলত।

প্রথম দিন প্রত্যুষে যখন তার সাথে দেখা হয় সে নিজের থেকেই এগিয়ে এসে বলে, আমি আপনাদেরকে এড়িয়ে চলব, কিছু মনে করবেন না।

বললাম, আপনার অভিরুচি।

দ্বিতীয় দিন যখন সকালে হাঁটাহাঁটি করছি, তখন সম্মুখে পড়ে গেলে সে এসে আমার লেখা 'নিত্য কারাগারে'র প্রশংসা করে। বলে, কারাগারের উপরে যত লেখালেখি হয়েছে, আপনার রচিত বইটি সর্বোত্তম। আমি অবাক হয়ে ভাবি এমন লেখায় যার হাত সে কেন আর লেখে না! বইটি পড়ে আমার প্রথমেই যাযাবরের রচনার কথা স্মরণে এসেছে।

প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে! তার উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিতে খুশি হই।

সে আমাকে প্রশ্ন করে, আর লিখছেন না কেন?

আমতা আমতা করে নিবেদন করি, নানা বাজে কাজে সময় করে উঠতে পারিনি। দেখি, এবার চেষ্টা করব।

তৃতীয় দিন সে আবার একই কথা উত্থাপন করে। তার মতে আমার মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে আমি তার সদ্ব্যবহার করছি না। ওবায়েদও এসে বলে, রায়হান সাহেব আপনার বইয়ের খুব প্রশংসা করেছে এবং আর লিখছেন না বলে দুঃখপ্রকাশ করেছে।

পরদিন প্রাতঃভ্রমণকালে রায়হান সাহেব আমাকে প্রশ্ন করে, আপনারা মুক্তিযোদ্ধারা এত বহুধাবিভক্ত হয়ে গেলেন কেন?

নিবেদন করি, মুক্তিযোদ্ধারা শুরুতেও বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী ছিল। দেশকে স্বাধীন করার একটিমাত্র লক্ষ্যে নিজেদের আদর্শের বিভিন্নতাকে বিস্মৃত হয়ে যুদ্ধ করেছে। দেশ স্বাধীন হবার পর তারা তাদের স্বীয় আদর্শ বা অনুভূতি বিসর্জন দেবে এটা প্রত্যাশা করা বিধেয় নয়। সে কারণেই তাদের মধ্যে এত বিভক্তি। এটা অস্বাভাবিক নয়। তাকে ইসলামের ইতিহাস থেকেও নিবেদন করি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পরলোকগমনের পর তাঁরই প্রবর্তিত ধর্মে কত প্রকারের বিভিন্নতার উদ্ভব হয়েছিল এবং সেসব কেন্দ্র করে কত হিংসাত্মক পরিণতি ঘটেছে পরবর্তী ইতিহাস তার স্বাক্ষী।

রায়হান সাহেব সব শোনে, তর্ক করে না। একসময় কেবল বলে, যে যেখানেই থাকুন না কেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে যেন আপনাদের বিচ্যুতি না ঘটে।

তাকে বলি, অবশ্যই। কিন্তু এই চেতনার রূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। আপনার মতের সঙ্গে না মিললেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধিতা হবে এটা বলাও সমীচীন নয়।

www.pathagar.com

সে বলে, তা অবশ্য ঠিক।

অন্যসব সময়ই সে ঘরে বসে। কখনও লেখালেখি করে, কখনও রেডিও শোনে। সামাজিক জীব হয়েও কী করে যে একজন মানুষ এমন বিচ্ছিন্ন ও একক জীবন-যাপন করতে পারে তা অচিন্তনীয়। কিন্তু সাপ্তাহিক ফাইলের দিন তার ভিন্নমূর্তি। সম্পূর্ণ কয়েদি পোশাক পরে, টুপি মাথায় দিয়ে সে সুপার আসার বহু পূর্ব থেকেই অ্যাটেনশান হয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

আমরা ডিভিশন প্রাপ্ত বন্দিরা সাধারণত সহজ-স্বাভাবিকভাবেই সুপারের পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত থাকি। কোন সমস্যা থাকলে তাঁকে অবগত করি। অন্যথায় সে আনুষ্ঠানিক সৌজন্যালাপ সমাপনান্তে সদলবলে প্রস্থান করে। কিন্তু রায়হান সাহেবের প্রস্তুতি এবং দীর্ঘক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে আমাদের অস্বস্তি বোধ হয়।

ওবায়েদ একদিন বলে ফেলল, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমাদের জন্য অসম্মানজনক।

রায়হান সাহেব প্রতিবাদ করে, আমি কি আপনাদের অপমান করতে পারি? আমি কর্তব্য পালন করছি।

উঠে গিয়ে তাঁর উদ্দেশে বলি, সুপার এলে আমরাও তার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে থাকি। কিন্তু আপনি বহু পূর্ব থেকে যেভাবে সটান দাঁড়িয়ে থাকেন, দেখে আমাদের ভালো বোধ হয় না। আপনার বয়স হয়েছে। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা স্বাস্থ্যের জন্যও হানিকারক।

আলাপ-আলোচনায় খুব ফর্মাল রায়হান সাহেব বলে, আমার প্রতি আপনার এই মমত্ববোধের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করছি। কর্তৃপক্ষ ফাইলের দিন এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

তার সঙ্গে আর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হই না। সকলেই জানে তার কাছে সব কথার শেষ কথা কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ যা করবে, যা বলবে তার আর অন্যথা হবে না। আড়ালে কেউ-কেউ তাকে কর্তৃপক্ষ বলে ডাকে। কেউ বলে, রাষ্ট্রপতি। কেন বলে জানি না।

ম্যানেজারকে সব সময়ই জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেনদরবার করতে হয়। কর্তৃপক্ষের সব বক্তব্য নির্দ্বিধায় মেনে নিলে প্রকারান্তরে সংশ্লিষ্ট বন্দিরাই ভুক্তভোগী হবে। এ ধরনের নির্বিবাদী ম্যানেজারের কারণে আমাদের দৈনন্দিন খাবারের অধিকতর দৈন্য প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

পরামর্শ করে আমরা ম্যানেজার পরিবর্তন করি। হালিম সাহেব কর্মজীবনে সামরিক বাহিনীর রসদ সংগ্রহের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাকেই এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে রায়হান সাহেব সামান্য মনঃক্ষুণ্ন হলেও মনে হয় নিষ্কৃতি পেয়ে সন্তুষ্টিই লাভ করেছে।

www.pathagar.com

প্রাতঃভ্রমণের সময় কিছুকিছু আলোচনা করে সে আমার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়। মনেপ্রাণে একজন আওয়ামী লীগার। একুশে ফেব্রুয়ারি, পনেরোই অগাস্ট, জেলহত্যা দিবস প্রভৃতি দিনসমূহে কালো কাপড়ের অভাবে সে কালো প্লাস্টিকের কাগজ বুকে ধারণ করে শোক জ্ঞাপন করে। দু'-একদিন রাজনৈতিক আলোচনার সূচনা করে আমার চিন্তা-চেতনা কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করে সে কেবল বলে, যা-ই করুন বা যা-ই বলুন, বঙ্গবন্ধুকে সব সমালোচনার উর্ধ্বে রাখবেন।

বললাম, সেটা কী করে হয়! প্রশংসাই কেবল শুনবেন, সমালোচনায় আগ্রহী হবেন না, এটা হতে পারে না। বঙ্গবন্ধুকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করেও তাঁর শাসনকাল বা তাঁর অনেক কর্মকাণ্ডকে স্বাভাবিকতায় গ্রহণ করা যায় না।

রায়হান সাহেব তা স্বীকার করে এবং বলে, একসময় আমিও এদের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছিলাম।

তাঁকে বলি, ক্ষমতার দাপটে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মানসে বঙ্গবন্ধুর কন্যা আমাদেরকে যেভাবে হয়রান করছে তাকে আপনি কোন্ চক্ষে দেখেন?

সে বলে, এটা অত্যন্ত অন্যায়। আমি কখনওই বিশ্বাস করি না জেলহত্যার মতো ঘটনার সঙ্গে আপনারা কোনভাবে জড়িত থাকতে পারেন।

সে একসময় জিজ্ঞেস করে তাঁর লেখা কোন বই পড়েছি কি না। লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি। শুনেছি সে কয়েকটি বই লিখেছে। জেলখানায় তাঁর লিখিত বই 'দর্পণ' রয়েছে। বইটি তার সহধর্মিণী জেল লাইব্রেরিতে দান করেছে। সে নাম্বার এনে দিলে বইটি আনিয়ে পড়ি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর সুচিন্তিত বিদগ্ধ বক্তব্যসম্বলিত তার কয়েকটি রচনা স্থান পেয়েছে বইটিতে। পড়ে ভালো লাগে। তাকে সেকথা জানাতে সে উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

প্রায় বছর দু'য়েক হল আমরা একসঙ্গে রয়েছি। এর মধ্যে তার কোন দেখা আসেনি। সে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। শুনেছি তার মেয়াদের প্রথম দিকে স্ত্রী, কন্যা এবং অন্যান্য স্বজনেরা আসত। কিন্তু সে ঘোষণা দিয়েছে, সে যা করেছে সেটাকে সমর্থন না করলে কারো সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। গর্ভধারিণী মায়ের পক্ষে একমাত্র পুত্রের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন সম্ভব নয়। পরিজনরাও এটাকে সুদৃষ্টিতে দেখতে পারে না। তার পর থেকে আর কেউ আসে না। অনেকদিন পর সেদিন তার দেখা এসেছিল। শুনলাম, তার কোন বন্ধু এসে অনেক বুঝিয়ে ওকালতনামায় স্বাক্ষর নিয়ে যায়। হয়ত আপিল করবে, বা অন্যকিছু। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনায় যাওয়ার সুযোগ নেই।

তাঁর সবকিছু রহস্যে আবৃত। পিতা হয়ে একমাত্র পুত্রকে নিজহাতে হত্যা

www.pathagar.com

করার মতো কী ঘটনা ঘটেছিল অনুমান করতে ব্যর্থ হই। ঘটনা যত বড়ই হোক, পুত্রের অপরাধ যত অমার্জনীয়ই হোক পিতা কর্তৃক পুত্র হত্যা কী করে সম্ভব এটা উপলব্ধিতে আসে না।

কখনও তাঁর চরিত্রের অস্বাভাবিক দৃঢ়তা আমাদেরকে চমৎকৃত করে। তাঁর বসন্ত রোগ হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে খুব একটা দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। রোজার মাস। অসুস্থ শরীরেও সে একটি রোজা ভঙ্গ করে না। দু'বেলা করে খোঁজখবর নেওয়ায় সে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা বোধ করে। সেকথা জানাতে দ্বিধা করে না। সার্বিক বিবেচনায় রায়হান সাহেব আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়ই রয়ে যায়।

দু'নম্বর ও তিন নম্বর ঘর খুব একটা বাসোপযোগী নয়। চার নম্বর ঘরে বর্তমান ম্যানেজার হালিম সাহেব থাকত। হাইকোর্টের আদেশে আমাদের তিন জনকে পিজি হাসপাতালে পাঠানো হলে পাঁচ মাস পর সেখান থেকে জেলে প্রত্যাবর্তন করে দেখি হালিম সাহেব এগারো নম্বর ঘরে ঠাঁই নিয়েছে। এদিকটা একেবারে শূন্য বলে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছে। নুরুল ইসলাম মঞ্জু চার নম্বর ঘরে স্থান নেয়। আমি আমার পূর্বতন ঘর পাঁচ নম্বরেই স্থান পাই। পাঁচ মাস হাসপাতালে কাটিয়ে এসে দেখি ঘরটি আমার জন্যই অপেক্ষা করছে। পায়খানা করতে অসুবিধা হয় জানাতে তদানীন্তন বড় সুবেদার মিস্ত্রি দিয়ে একটি কাঠের কমোডের মতো প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছিল। দেখি, সেটিও যথাস্থানে বিদ্যমান।

কিছুদিন পরই মঞ্জু চার নম্বর ঘর পরিবর্তন করে ওবায়েদের পাশের ঘর সাত নম্বরে চলে যায়। পিজি হাসপাতালে আমরা এক কক্ষেই ছিলাম। অনেকবার বিদেশে হোটেলে এক রুমে অবস্থান করেছি। কিন্তু এত দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে থাকার সুযোগ ঘটেনি। দুঃসময়ে একত্র বসবাসে আমরা আরও কাছাকাছি আসি। সেই ছাত্রজীবন থেকে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

'৫৬ সালে ঢাকার মাহবুব আলী মিলনায়তনে ছাত্রলীগের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আউয়াল ভাইয়ের নেতৃত্বের দীর্ঘসূত্রিতার প্রশ্নে মঞ্জুর সঙ্গে একবার মতানৈক্য হয়েছিল। সে তখন বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের নেতা। তার পর থেকে আমাদের বন্ধুত্বে আর কোন চির ধরেনি। একসঙ্গে আওয়ামী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ করেছি। সে জাতীয় পার্টিতেও যোগ দিয়েছিল।

www.pathagar.com

এখন সক্রিয় ব্যবসায়ী এবং বিএনপি'র নিষ্ক্রিয় সদস্য। আমাদের তিন জনের মধ্যে সে-ই একমাত্র আওয়ামী লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি এই সব কয়টি দল করার সুযোগ লাভ করেছে। ওবায়েদ যেমন জাতীয় পার্টি করেনি, আমিও তেমনি বিএনপি করিনি। এইদিক থেকে মঞ্জু অনবদ্য।

আজীজের পর আমার এত ঘনিষ্ঠ সুহৃদ আর ছিল না।

আমরা একসঙ্গে অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। আমেরিকা, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে আমরা একত্রে ভ্রমণ করেছি। একসঙ্গে হোটেলে অবস্থান করেছি। এসব সফরে তাকে মুক্তহস্ত হয়ে খরচ করতে দেখেছি। দেশেও আমাদের মেলামেশা ছিল সহজ প্রীতিপূর্ণ। কোন বিষয়েই কোন মালিন্য আমাদের স্পর্শ করতে পারেনি।

পিজির প্রিজন সেলে সে যখন অসুস্থ ছিল, আমি যেটুকু সম্ভব সেবা করার প্রয়াস পেয়েছি। আমি অসুস্থ থাকলেও সে সেবার হাত নিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে আসতে দ্বিধা করেনি।

এখানে আসার পর আমাকে বাসা থেকে খাবার পানি কিনে পাঠানো হত। নিষেধ করে দিলাম, এখানেও পানি ফুটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বাইরে নিজের বাসস্থানেও সে ব্যবস্থাই ছিল। তা ছাড়া বোতলজাত পানির বিশুদ্ধতাও প্রশ্নাতীত নয়।

প্রথম যখন কেনা পানি নিষেধ করি, মঞ্জু এগিয়ে এসেছিল, পানি কিনেই খাবে। আমি ব্যবস্থা করব।

তাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম, সামান্য পানি ক্রয়ের সাধ্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই আতিশয্যের প্রয়োজনীয়তা নেই।

ইদানীং লেখালেখির কারণে এমনিতেই কথা বলা কম করেছি। আকরাম সাহেব হেসে বলে, স্যার, জেলে এসে আপনি যে বোবা বনে যাচ্ছেন! বাইরে এত বক্তৃতা করতেন!

তাঁকে বলি, দিন-রাত পবিত্র কোরান পাঠ করছেন, তাতে নিশ্চয়ই পড়েছেন অহেতুক বাক্যালাপ না করাই বিধেয়। সেখানে নিশ্চয়ই দেখেছেন, আওয়াজসমূহের মধ্যে গাধার আওয়াজই কটু।

মঞ্জু প্রচুর ধর্মকর্ম করে। আমিই বরং এক্ষেত্রে নবাগত। কোরানপাঠ, নফল এবাদত, বিভিন্ন আমলে সে সিদ্ধহস্ত। প্রায় প্রতি বছরই আজমির শরিফ জেয়ারতে যেত। ঢাকাতেও নানা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে, খাজাবাবার ওরশ প্রভৃতিতে সে সক্রিয় অংশ নিয়ে থাকে। বিভিন্ন পীর সাহেবের কাছে তার বিরামহীন আনাগোনা। ছাব্বিশ সেলে সপ্তাহে দু'বার মিলাদ এবং সে উপলক্ষে তবারকের ব্যবস্থাদিতে তার উদ্যোগ আয়োজন লক্ষণীয়।

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক ফাইলের দিন আমি অভাব-অভিযোগ তুলে ধরতাম। অন্যরাও বলত। যুক্তির আলোকে বিষয়গুলো সুপারের নিকট তুলে ধরলে সে হাসিমুখে উত্তর করত, আপনার যুক্তিতর্কের কাছে আমি লাচার।

বেশ কয়েকটি বিষয়ে তাকে যথাসম্ভব সম্মত করাতে সক্ষম হই।

বিগত গ্রীষ্মের সময় সেলে আমাদের টেকা দায় হয়ে ওঠে। ওবায়েদ এবং আমি, দু'জনই ডায়াবেটিসের রোগী। গায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল। রাতেরবেলা সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে পানির কল ছেড়ে দিই গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য। জজসাহেবের অনুমতি নিয়ে নিজেই একদিন কোর্টে নিবেদন করি, আমাদের পাখা দেওয়া হোক। অনেক যুক্তি প্রদর্শন করে, পূর্বের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে প্রার্থনা করি, কোরবানির গরুটিকেও খাইয়ে-দাইয়ে সুস্থ রাখতে হয় ভবিষ্যতের গলাকাটার জন্য। আমাদেরকেও যদি ফাঁসি দিতে চান, বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গরমের মধ্যে পাখা প্রদান না করলে আমরা তিষ্ঠুতে পারছি না। জজসাহেব যুক্তিগুলো উপলব্ধি করেন এবং আমাদেরকে পাখা প্রদানের নির্দেশ দেন।

আমাদের প্রথম ফালতু কুদ্দুসকে তাড়ানো হয়েছে। শুনেছি, বাবুর্চি রেজাউলসহ সে অতিশয় ঘৃণ্য কাজ করেছিল। ছেলেটা খুবই কাজের ছিল, বুদ্ধিমান ও চটপটে। আদমজী মিলের কর্মচারী। অস্ত্র-মামলার আসামী। বাবুর্চির সাথে মিলে লোহার শিক পুড়িয়ে লাল করে কয়েকটা মাদি বিড়ালের স্ত্রী অঙ্গে ঢুকিয়ে তাদের মেরে ফেলেছে। ম্যানেজার হালিম সাহেবকে কেউ-কেউ আবু হোরায়রা বা বিড়ালের পিতা বলে ডেকে থাকে। বিড়ালের প্রতি তার প্রচুর যত্নআত্তি। সেই বিড়ালদের পরিণতি দেখে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওদের দু'জনকে তড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নেয়। দীর্ঘদিন নারীসঙ্গবর্জিত এইসব কয়েদির মধ্যে নানা বিকৃত যৌন প্রবণতার উন্মেষ ঘটে। তা না হলে লোহার শিক পুড়িয়ে কেউ মাদি বিড়ালের জননেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট করানোর কথা কল্পনা করতে পারে! এই কয়েদিরাই '৯২ সালের জেল-বিদ্রোহের সময় সমস্ত বিড়াল কেটে-কুটে রান্না করে খেয়ে সাফ করে ফেলেছিল।

জিয়া সাহেবের আমলে যখন নতুন বিশ সেলের দ্বিতলে ছিলাম তখন নিচের তলায় বাম রাজনীতির অন্যতম রথী টিপু বিশ্বাস একদিন একটা কাক ধরে জবাই করে রান্না করে খেয়েছিল। সেদিন অসংখ্য কাক এসে ঐক্যবদ্ধভাবে সারাদিন ধরে তার প্রতিবাদ করেছিল। তাদের চিৎকারে সেলে টেকা দায় হয়েছিল।

কুদ্দুস এসে অনুনয় করে বলে, স্যার, আমি কিছু করিনি। রেজাউল করেছে।

সে আমাদের কাজে বহাল থাকতে চায়। কিন্তু হালিম সাহেব কিছুতেই তা শুনবে না।

www.pathagar.com

আমি এত কথা জানতাম না। সেদিন হঠাৎই দ্বিপ্রহরে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম থেকে ডেকে হালিম সাহেব যা জানিয়েছিল খুব একটা খেয়ালে ছিল না। তাকে গিয়ে কুদ্দুসের কথা বলতেই সে আমার হাত চেপে ধরে বলে, আপনাকে আমি পিতার মতো শ্রদ্ধা করি, এ অনুরোধ করবেন না।

বুঝলাম, বিষয় গুরুতর। আর উচ্চবাচ্য করলাম না। হালিম সাহেবই পরে আমাকে জানায়, এই রেজাউল অতি বদ প্রকৃতির অপরাধী। ছোট ভাইয়ের প্রেমিকার একটি স্তন সে নিজ হস্তে কেটে এনেছিল। শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। একটি মেয়ের স্তন যে কেটে আনতে পারে বিড়ালের যোনিদ্বারে গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দেওয়া তার কাছে কিছুই নয়।

এবার জেলে আসার পর অনেক মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাত হচ্ছি। বিগত রোজার শেষদিন আমার জীবনের এযাবৎকালের সর্বাধিক দুঃসহ ও মর্মান্তিক দুঃসংবাদ লাভ করি পিজি হাসপাতালে অবস্থানকালে। বড়দার মৃত্যুসংবাদ আমার কাছে কেবল একটি বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের প্রয়াণের খবরই নয়, সেটি ছিল আমার জন্য সবচাইতে দুঃখজনক ঘটনা। স্নেহ-মমতা বা ভালোবাসা পরম করুণাময়েরই দান। এই পৃথিবীতে আমি সবচাইতে বেশি যাকে ভালোবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম তিনি ছিলেন আমার অগ্রজ। তাঁর মৃত্যুর সময় উপস্থিত থাকতে পারিনি। তাঁকে কবরে শুইয়ে দিয়ে সেখানে একমুঠি মাটি প্রদান করতে পারিনি।

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ, পরম নির্ভরতা ও আস্থার জন, সীমাহীন ভালোবাসা এবং পারিবারিক আনুগাত্যের জীবনশিখাটি নির্বাপিত হয়ে গেল আমি টেরও পেলাম না। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা প্যারোলের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। নিষ্ঠুর এক রমণীর প্রত্যক্ষ নিষেধাজ্ঞার ফলে এক ঘণ্টার জন্যও জানাজায় শরিক হবার অনুমতি মেলে না। কাজী জাফর এবং আমার জামাতা অপু অনেক চেষ্টা করেছে, সফল হয়নি। অপুর আপন ফুপাতো ভাই রফিকুল ইসলাম তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সে নিজের অপারগতা প্রকাশ করে। একই মামলার অন্য এক অভিযুক্তকে একই ধরনের পরিস্থিতিতে দুই-দুইবার প্যারোল মঞ্জুর করা হয়েছিল ময়মনসিংহ যাওয়ার। কিন্তু ঢাকায় অবস্থান করেও বড়দার জানাজা বা দাফনে অংশ নিতে পারিনি প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিলার অমানবিক আচরণের কারণে। এই মুহূর্তে সে তার ক্ষমতার নজিরবিহীন অপব্যবহার যতই

www.pathagar.com

প্রদর্শন করুক না কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় ক্ষমতার অধিশ্বর সৃষ্টিকর্তা উপর থেকে সবই প্রত্যক্ষ করছেন। এর প্রতিবিধান কেবল তাঁরই নির্দিষ্ট পন্থায় নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবে।

সে শোক কাটিয়ে উঠতে-না-উঠতেই পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি আমার আর এক প্রিয়ভাজন, খালাতো ভাই ড. শামসুল হকের মৃত্যুর সংবাদ। সে আমার দু'বছরের বড়। ছাত্রজীবনে মেধাবী শামসুল হকদা ভূবিজ্ঞানে ডক্টরেট করে বিভিন্ন দেশে অধ্যাপনা করেছে। জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিদেশে অতিবাহিত করে শেষ মুহূর্তে ঢাকায় এসে স্থিতিলাভ করে। শৈশব থেকেই রক্তের সম্পর্কের ঊর্ধ্বেও আমার সঙ্গে ছিল তার এক অকৃত্রিম হৃদ্যতার বন্ধন।

স্বাস্থ্যসচেতন শামসুল হকদাকে কখনও মিষ্টিজাতীয় খাবার বা কোন গুরুপক্ব খাদ্য বিশেষ খেতে দেখা যেত না। দেখায় এসে আউয়াল জানায়, বিকেলে সে যথারীতি চা পান করেছে। তার পরই অসুস্থতা বোধ করে। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার জীবনাবসান ঘটে।

একই কাগজে কয়েকদিন পরই দেখতে পাই শামসুল হকদার বড় বোন, খালাতো ভাইবোনদের মধ্যে আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠা হুরন বুজি ইন্তেকাল করেছে। রূপবতী হুরুন বুজির সঙ্গে তারই ফুপাতো ভাই দানেশ মিয়ার বিয়ে হয়েছিল প্রায় শৈশবে। তাদের দুই কন্যা হেলেনা ও সাহানার সঙ্গে আমার নিকট সম্পর্ক। হুরন বুজিও আমাকে স্নেহ করত। তারা দুই ভাই-বোন ডাকাডাকি করে পরপারে চলে গেল অল্প দিনের ব্যবধানে। ভাবছি, আমার ডাক আসতে আর কত বিলম্ব!

পিজি হাসপাতালে অবস্থানের সময় জানতে পারি লৌহজং উপজেলার কনকসার ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, আমার আর একজন ভালো কর্মী মোসলেম ঢালীও পরলোকগমন করেছে। তার তেমন বয়স হয়নি। কিন্তু মৃত্যু কখনও বয়সের হিসেব করে আগমন করে না। ঢালীরা এলাকায় সমৃদ্ধ পরিবার। তার ছোট ভাইয়েরাও আমার শুভানুধ্যায়ী কর্মী। মোসলেম ঢালীর ছোট ভাই নুর আলী জাপানে জনশক্তির ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দু'বার জাপান ভ্রমণের সময় তার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। বিগত নির্বাচনে মোসলেমের অবদানকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

শ্রীনগরের কামারগাঁও গ্রামের হারুন মেম্বারও সেদিন অকালে চলে গেল। বিশাল দেহ ও ততধিক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী হারুন ছিল আমার একজন একনিষ্ঠ কর্মী। আমার জন্য যে-কোন ত্যাগস্বীকারে সে পরাঙ্মুখ হত না। বিগত নির্বাচনে সে যে পরিশ্রম করেছে তার তুলনা হয় না। সমগ্র এলাকার মধ্যে কর্মের বিবেচনায় সে ছিল অদ্বিতীয়। বহুমূত্রের রুগী, কিন্তু কোন

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞা মানত না। নিজে প্রচুর খেতে ভালোবাসত, অন্যদের খাইয়েও তার তৃপ্তির অন্ত ছিল না।

গ্রামে খেত-খামার ব্যতীত তার আয়ের উৎস কী ছিল জানতাম না, কিন্তু তাকে মানুষের প্রয়োজনে সবকিছু নিয়ে যেভাবে সর্বদা ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি তার কোন তুলনা পাওয়া ভার। অনেক বড় মনের মানুষ হারুন, ছোট পাড়াগাঁয়ের পরিবেশে ভাগ্যকূল ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যপদে প্রতি বছরই বিপুল ভোটে নির্বাচিত হত। তার শখ ছিল একবার চেয়ারম্যান হওয়ার। গত নির্বাচনে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু অনিবার্য অর্থের কাছে পরাজয়বরণ অস্বাভাবিক ছিল না।

দেখা হলেই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করতাম। ভোজনবিলাস নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দিতাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা! আমার কথা শুনে সে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠত। পরামর্শে তেমন কান দিত না। আকর্ণ হেসে বলত, কিছু হবে না নেতা, আপনি দোয়া করবেন। আমি বাইরে থাকতেই সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাকশক্তি ও চলৎশক্তিরহিত হয়ে যায়। গ্রামে গিয়ে তাকে দেখে আসি। ভারতে গিয়ে চিকিৎসারও চেষ্টা করে। আমি অনেক ঝামেলা করে আমেরিকা থেকে তার জন্য ঔষধ আনিয়ে দিই। হারুন ছিল আমার খুবই স্নেহের পাত্র। কিন্তু তারও ডাক এসে যায়। আমাদের স্নেহ-মমতা পরিত্যাগ করে, এলাকার সাধারণ মানুষদের শোকসাগরে ভাসিয়ে সদাব্যস্ত হারুন অতি ব্যস্ততার সঙ্গে স্থায়ী ঠিকানায় পাড়ি জমায়। জেলে বসেই সে সংবাদ পাই। একের পর এক মৃত্যুর সংবাদ আসতে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই কাগজে কোন না কোন প্রিয়জনের পরলোকগমনের খবর পাই।

সেদিন দেখলাম আমাদের দীর্ঘদিনের সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী আবদুল বারী ওয়াসী সাহেব মৃত্যুবরণ করেছে। ডেমোক্রেটিক লীগ করতে আসে মি. ও মিসেস বারী একত্রে। সেই থেকে পরিচয়। ওয়াসী বুক সেন্টারের একসময়ের স্বত্বাধিকারী আবদুল বারী ওয়াসী সাহেবও বিক্রমপুরের মানুষ। আমাদের পাশের গ্রামের অধিবাসী হলেও জন্মভূমির সঙ্গে সে ছিল প্রায় সম্পর্কবিচ্ছিন্ন। ডেমোক্রেটিক লীগ দ্বিধাবিভক্ত হলে বারী সাহেব এবং তার স্ত্রী আমেনা বারী আমাদের সঙ্গে চলে আসে। স্বল্প সময়ের জন্য তাদের গ্রিন রোডের বাসাটি আমাদের কার্যালয়ে পরিণত হয়। সেসময় তাদের প্রভূত অবদান ছিল দলের প্রয়োজনে। পরবর্তীতে তারা আমার সঙ্গেই রাজনীতি করে এবং জাতীয় পার্টিতে বারী সাহেব ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়।

এবার আমি জেলে থাকাকালীন পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হলে সে সস্ত্রীক অন্য গ্রুপে অবস্থান নেয়। কিছুদিন পরই তার তিরোধান ঘটে। তার বয়স হয়েছিল, কিন্তু এই কান্তিমান, সদাহাস্যময় এবং দলের কাজে সততপ্রস্তুত মানুষটির

www.pathagar.com

সৎসঙ্গ এবং সমর্থন কোনদিন ভুলবার নয়। জেলখানায় বসে তার আত্মার মঙ্গলকামনায় পরম করুণাময়ের নিকট প্রার্থনা করা ব্যতীত আর কিছু করার ছিল না।

বরিশালের রেজাউল মালিক মনুর মৃত্যুর সংবাদ আমার নিকট অত্যন্ত আকস্মিক বলে অনুভূত হয়। তার পিতাও রাজনীতি করত। সে নিজে জেলা শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিল। অতি অমায়িক, সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল মনু ভাই সকলের নিকট প্রিয় ছিল। এরশাদ সাহেবের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা ছিল।

চলচ্চিত্র শিল্পী সুচন্দাকে সে বিয়ে করেছিল। তার এক মেয়ের জন্মদিনের উৎসবে আমাকে ঢাকা ক্লাবে ধরে নিয়ে যায়। আমি তখন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালোই ছিল। সুচন্দা, ববিতা এবং পপি এই তিন বোন এবং তাদের ভাই পাইলট ইকবালের সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্ক ছিল। মনু ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই তাকে ঠাট্টা করে বলতাম, শ্যালিকাকে লুকিয়ে রাখছেন কেন? তাকে পাচ্ছি কবে?

সকলে জানে, নায়িকা ববিতার অভিনয়ের আমি ছিলাম গুণগ্রাহী। এ নিয়ে বন্ধুরা পরিহাস করত। ববিতা নিজেও একসময় এসে বলে, আমার সৌভাগ্য আপনি আমার অভিনয় ভালোবাসেন।

হেসে জবাব দিয়েছিলাম, কেবল অভিনয় নয়, অভিনেত্রীর প্রতিও কম আকর্ষণ অনুভব করি না।

সে নায়িকাসুলভ হাসি ছড়িয়ে তার বাসায় সাদর আমন্ত্রণ জানায়। সে আমন্ত্রণ রক্ষা করা হয়ে ওঠেনি।

মনু ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদে শোক ও ব্যথার মাঝে সেই চপল স্মৃতিও স্মরণে আসে।

পরপর আরও কয়েকটি মৃত্যুসংবাদ আমাকে ভাবিয়ে তোলে। পরপারের ডাক কি ঘনিয়ে এল! তা-ই হয়ত হবে। পত্রিকায় পাতায় যাদের মৃত্যুসংবাদ পড়ি তারা অধিকাংশই প্রায় আমাদের বয়সসীমার নিকটবর্তী।

শ্রীনগরের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আমার দীর্ঘদিনের কর্মী সেলিমের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। কয়কীর্তন গ্রাম থেকে উঠে আসা সেলিমকে সকলে মিটফোর্ডের সেলিম বলেই জানত। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী সেলিম যে এত শীঘ্র দুনিয়ার দেনা-পাওনা মিটিয়ে পরপারে চলে যাবে তা ছিল অকল্পনীয়। এলাকার বাইরে সে যে-রাজনীতিরই সমর্থক হোক না কেন, এলাকার নির্বাচনকালে সেলিম সর্বদাই আমার পাশে এসে দাঁড়াত। তার মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি।

ইকবাল আনসারী খান, আমাদের সকলের হেনরী ভাই সেদিন ব্যাংককে দেহত্যাগ করেছে। পিতা আলী আমজাদ খান এবং মাতা আনোয়ারা খাতুন

www.pathagar.com

দু'জনাই রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিচিত। হেনরী ভাইও ছাত্রজীবন থেকেই সমাজে সুপরিচিত। গ্রিন রোডে তার বাসায় কাজে-অকাজে বহুবার যাতায়াত করেছি। অতি প্রাণোচ্ছল, বন্ধুবৎসল এবং সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে অকাতরে মিশবার বিশেষ গুণসম্পন্ন এই মানুষটির কাছে বয়সের কারণে সম্পর্ক গড়ে তোলায় কোন অসুবিধা ঘটত না। পেশায় আইনজীবী হয়েও শেষ অবধি ব্যবসায়ে সে মন দিয়েছিল এবং ভালো করছিল। আমাকে একবার প্রস্তাব করেছিল তার সঙ্গে তাইপে সফর করতে। আশ্বাস দিয়েছিল সব আয়োজন সে সামলাবে। কিন্তু তার সঙ্গে সে ভ্রমণ হয়নি।

হেনরী ভাই রাজনৈতিক অঙ্গনে একটা গুরুত্ব বহন করত। মোটামুটি সক্রিয়ভাবেই জড়িত ছিল। জনাব আতাউর রহমান খানের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করেছে। ডেমোক্রেটিক লীগে যোগ দিয়ে দলের জন্য অবদান রেখেছিল। ১৫ই অগাস্টকে 'নাজাত দিবস' পালনের বিরোধিতা করে যখন দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল তখন হেনরী ভাই আমাদের সঙ্গেই রাজনীতির পন্থা নিরূপণ করে। এরশাদ সাহেবের আহ্বানে আমরা ডেমোক্রেটিক লীগের পক্ষ থেকে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনীতির নব মেরুকরণে উদ্বুদ্ধ হই তখন হেনরী ভাই আমাদের সঙ্গেই ছিল।

হেনরী ভাই ছিল সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং এক নামেই তাকে সকলে চিনতে পারত। তাকে উপেক্ষা করার কোন সুযোগ ছিল না। তার মৃত্যু আমাদের অনেকের জন্য ব্যক্তিগত ক্ষতির বিষয় হয়ে রইল।

সাবেক রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবও পরলোকগমন করেছে। তার অবশ্য যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। এই একটি মৃত্যুসংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ইন্নালিল্লাহ বের হয়ে আসেনি দেখে নিজেই নিজেকে ভর্ৎসনা করেছি। পরক্ষণেই অবশ্যই তা পড়েছি। একজন দীর্ঘদিনের সহকর্মীর মৃত্যুর পর এ ধরনের প্রতিক্রিয়া সহজাত নয়। কিন্তু মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য।

সবকিছু জেনেশুনে, সবকিছু বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত থাকার পরও কেবল একজন মহিলাকে ভয় করে বৃদ্ধ বয়সে যে-লোক নির্জলা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হয় তার সম্বন্ধে কী মূল্যায়ন হবে সহজেই অনুমেয়। জেলহত্যা মামলায় তার ভূমিকা ছিল ন্যক্কারজনক। আজ সে নেই, আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করুন। কিন্তু তার সেদিনের ভূমিকার নিন্দা করার ভাষা জানা নেই।

অতি সাধারণ ঘরের, ব্রিফলেস একজন নির্বাক উকিলকে সেসময় শেখ সাহেব আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক নিযুক্ত করেছিলেন। তাকে পার্টি থেকে রাহাখরচ দেওয়া হত। কিন্তু তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আল্লাহ্ যখন দেন ছাপ্পর ফুঁড়ে দেন, এই প্রবাদকে বাস্তব প্রমাণিত করে মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব একের পর এক ক্ষমতায় আরোহণ করতে থাকে। সেও সর্বাধিক দল করা

www.pathagar.com

একজন লোক। আওয়ামী লীগ, বাকশাল, ডেমোক্রেটিক লীগ, বিএনপি এবং পুনরায় আওয়ামী লীগ করার কৃতিত্ব রয়েছে তার।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগরে বসেই স্বাধীনতার পক্ষাশ্রয়ী ছাত্র ও তরুণদের তীব্র ভাষায় সমালোচনা করতে সে দ্বিধাবোধ করত না। মুক্তিযোদ্ধাদের চতুর্দশ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ত। তার ভাষায় এটা একটা বড় হঠকারী কাজ হয়েছে। কিন্তু কী করা যাবে? আওয়ামী লীগ করে দেশে থাকলে পাকসেনাদের হাতে জীবনপাত হবে, তাই বাধ্য হয়ে মুজিবনগরে চলে আসা। স্বাধীনতার পর সেই মোহাম্মদউল্লাহকেই বড় পদ দেওয়া হয়।

ডেপুটি স্পিকার করা হল তাকে। কিন্তু ভাগ্য ভালো হলে স্পিকারের আসন শূন্য হতে কতক্ষণ! স্পিকার সাহেব মৃত্যুবরণ করলে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়। এ ধরনের বশংবদ স্পিকার আর কোথায় পাওয়া যাবে! কিছুদিন পর তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করলে মোহাম্মদউল্লাহর ভাগ্যের ছিকা আর একবার ছেঁড়ে। তার মতো অনুগত রাষ্ট্রপতি কোথায় পাওয়া যাবে!

মোহাম্মদউল্লাহ সাহেব রাষ্ট্রপতির আসন অলঙ্কৃত করল! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মতিন চৌধুরীর সঙ্গে জিয়ার আমলে এই ছাব্বিশ সেলেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁকেও ধরে এনে আটক করা হয়েছিল। নোয়াখালী বাড়ি হওয়ায় তিনি মোহাম্মদউল্লাকে ভালো করেই জানতেন। তিনি চিৎকার করে বলছিলেন, মোহাম্মদউল্লাহ যেদিন রাষ্ট্রপতি হল সেদিন আমার দেশত্যাগের বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

আমরা তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও আমাদেরকে ছাত্র হিসাবেই পরিগণিত করতেন। বললেন, মোয়াজ্জেম! তোমরা ওকে রাষ্ট্রপতি করলে কী প্রকারে? তোমাদের প্রতিভার জন্য বাহবা দিতে হয়!

নিবেদন করেছিলাম, স্যার, আপনার কিছুই অবিদিত থাকার কথা নয়। সবই তাঁর ইচ্ছা। বঙ্গবন্ধু যখন নিজেই একদল বাকশাল প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রপতি বনে গেলেন তখন মোহাম্মদউল্লাহকে ফেলতে পারেননি। তাকে মন্ত্রী বানালেন। ১৫ই আগস্টের পট পরিবর্তনের পর খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হয়ে মোহাম্মদউল্লাহকে তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড নিযুক্ত করে। সে হয়ে দাঁড়ায় খন্দকার মোশতাকের ডান হাত, তার সকল কাজের কাজী দেশের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। পরবর্তীতে খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক লীগেও সে ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি। মোশতাক সাহেবের কারাগারে থাকাকালীন সে ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক-এর দায়িত্ব পালন করে। ডিএল বিভক্ত হবার সময়ও সে মোশতাক সাহেবের সঙ্গেই ছিল।

জেলহত্যার মতো নারকীয় ঘটনা ঘটে গেলে সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

www.pathagar.com

আমরা সকল মন্ত্রীরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর বাসায় মিলিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রিত্বে পদত্যাগ করে ভাইস-প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদউল্লাহর হাতে পদত্যাগপত্র দিয়ে এলাম। ১লা নভেম্বর থেকেই প্রেসিডেন্ট বা বঙ্গভবন আমাদের নাগালের বাইরে। মঞ্চ তখন খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনীর দখলে।

সেই মোহাম্মদউল্লাহ এই মামলার অতিউৎসাহী তদন্ত কর্মকর্তা কাহার আখন্দের প্ররোচনায় আর এক প্রতিহিংসাপরায়ণা মহিলার মনস্তুষ্টির জন্য অকাট মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুতিগ্রহণে দ্বিধা করে না। পুলিশের নিকট প্রদত্ত তার জবানবন্দি পড়ে ঘৃণায় সমস্ত শরীর রি রি করে ওঠে। এক পা গোড়ে, এক পা বাইরে সে অবস্থায় একজন মানুষ কীভাবে এমন নির্জলা মিথ্যাচার করতে পারে হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হয়। সে বলেছে, আমরা তিন জন নাকি পদত্যাগ করিনি। আরও কত কী! তার ভাগ্য ভালো। সে সময়ে চলে গেল। তা না হলে তাকে একবার সাক্ষীর কাঠ গড়ায় দেখার খুবই বাসনা ছিল।

জজসাহেবের আদালতের কাঠগড়ায় না হোক, বিশ্বপিতার আদালতে তাকে একদিন অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে সহজে পার পাবার ব্যবস্থা নেই। নির্গুণই যার বড় গুণ সেই মোহাম্মদউল্লাহ পথ থেকে উঠে এসে ডেপুটি স্পিকার, স্পিকার, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, উপরাষ্ট্রপতি এবং পরে এমপি পর্যন্ত হয়েছিল। থানার দারোগার পদ ব্যতীত প্রায় সব ক্ষমতাই সে ভোগ করেছে।

পরপারেও কি এমনি ফাঁকি দিয়েই সব ম্যানেজ করে নেবে! কে জানে! মোহাম্মদ-উল্লাহরা সব পারে।

ডেমোক্রেটিক লীগ করার সময় ঢাকার হাজী সেলিম আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আসে। ঢাকা শহরের এক আদি পরিবারের সদস্য হাজী সেলিম তার সুন্দর দেহে সুন্দরতম চাপদাড়ি ও সাদা পাজামা-পাঞ্জাবিতে একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়ক হত। সরস মন্তব্য ও হাজির জবাবের জন্য খ্যাত হৃদয়বান হাজী সেলিম অল্পদিনের মধ্যেই দলে তার আসন করে নেয়। বিভিন্ন উপলক্ষে সহকর্মী ও বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ করে ঢাকাই কাচ্চি খাওয়াতে হাজী সেলিম আনন্দ লাভ করত। সভা-সম্মেলন উপলক্ষে লোকজনকে আপ্যায়নের প্রয়োজন হলে আমরা নির্দ্বিধায় তার উপরই দায়িত্ব অর্পণ করতাম।

দলের ঢাকা মহানগরীর শাখার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছিল তাকে। সাধারণ সম্পাদক ছিল আমার বন্ধু অ্যাডভোকেট আবদুল মান্নান। দু'জনের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। দলের সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে

www.pathagar.com

মহানগর শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের এই টানাপোড়েনে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও হাজী সেলিমের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বাইরে অবস্থান নেওয়া দুরূহ হত। সে কারণে বন্ধু মান্নানের ক্ষোভের অন্ত ছিল না।

দল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলে সে আর সক্রিয় ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝেই নিজস্ব কারখানার একগাদা সেমাই, ঢাকাই বাখরখানি ও সুতি কাবাব নিয়ে সে দেখা করতে আসত। রাজনীতির বাইরেও তার সঙ্গে একটি সখ্য গড়ে উঠেছিল। তার মৃত্যু বন্ধু-বিয়োগের যাতনা দেয়।

আর একটি বন্ধুর মৃত্যুর খবরে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কাগজে পড়ি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গম্ভীরা শিল্পী কুতুবুল আলম সেদিন ঢাকা বারডেমে প্রাণ ত্যাগ করেছে। রাজশাহী অঞ্চলের গম্ভীরা গানকে দেশব্যাপী জনপ্রিয় করে তোলার পশ্চাতে কুতুবুল আলমের অবদান অনস্বীকার্য। এই গানের মাধ্যমে সমাজের নানা ব্যঙ্গচিত্র এবং সমস্যার কথা তুলে ধরতে তার কোন জুড়ি ছিল না। কুতুবুল আলমের দেহটিও ছিল এই গানের প্রাসঙ্গিক নাচের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। নিজের ভুঁড়িটিকে এক বিচিত্র পদ্ধতিতে ঢেউ খেলিয়ে ভিন্নতর আবেশের সৃষ্টি করতে সে সক্ষম হত। গানের সঙ্গে তার ভুঁড়ি-নৃত্য ভালোই সঙ্গত করত।

সহশিল্পীর সঙ্গে দুলে দুলে নাচতে-নাচতে তার 'নানা হে' গান আসর মাতিয়ে তুলত। শিল্পী হিসাবে নয়, যৌবনে সেক্রেটারিয়েটে কিছুদিন সে ও আমি একসঙ্গে চাকরি করেছিলাম। কৃষি বিভাগের সেই দফতরে সে ছিল আমার সহকর্মী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে আমি সংক্ষেপে কুত্তা বলে ডাকতাম। সে কিছু মনে করত না, বরং তাকে ও-নামে না ডাকলেই মনে করত বোধহয় কোন কারণে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছি। তখন সে গান গাইত না। অভিনয়ের দিকে ঝোঁক ছিল। 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' ছায়াছবিতে অভিনয় করে সে সুনাম কামিয়েছিল।

পরে সে গম্ভীরা গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং তার নিজস্ব প্রতিভার গুণে এই গানটিকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে এনে সকল জনগণের দ্বারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। দেশব্যাপী গম্ভীরা গানের আজ যে জনপ্রিয়তা তার পেছনে কুতুবুল আলমের অবদান সর্বাধিক।

তথ্যমন্ত্রী হিসাবে যেবার রাজশাহী প্রথম সফর করি টাউন হলে এক সম্বর্ধনায় সে গানের মাধ্যমে তথ্যমন্ত্রীকে যেসব তথ্য পরিবেশন করেছিল তা আজও আমার কানে বাজে।

কুতুবুল আলমের কোন বিকল্প তৈরি হবে কি না জানি না। কোন একজন মানুষের জন্যই কোনকিছু বসে থাকে না। কিন্তু সে যে-ধারা প্রবাহিত করে যায়

www.pathagar.com

তা-ই চিরদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখে। আমার প্রিয় বন্ধু কুতুবুল আলম তার ব্যতিক্রম নয়।

প্রতিদিন খবরের কাগজে একবার চোখ বুলাই। নিজের অজান্তে মৃত্যু-সংবাদ ও শোকের কলমটির প্রতি দৃষ্টি যায়। প্রতিদিনই কোন-না-কোন পরিচিত জন, সহকর্মী ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুসংবাদ অবগত হই। অধিকাংশের বয়স প্রায় আমাদের কাছাকাছি। কেউ কেউ আমাদের চাইতে বয়ঃকনিষ্ঠ। মৃত্যুর সংবাদগুলো কিছুক্ষণের জন্য আমাদেরকে বিহ্বল করে দেয়। জানি, সকল প্রাণীকেই একদিন অবধারিত মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তবুও সেই অবশ্যম্ভাবী অজানা অবস্থাটি চিন্তায় উদয় হলে মানসিকভাবে কাতর হয়ে উঠি। আত্মীয়স্বজন, সহকর্মী ও বন্ধুরা যারা চলে গেল, তাদের সাথে আর দেখা হবে না। সেই প্রিয় মুখগুলো আর কোনদিন দেখব না। নীরবে পরম করুণাময়ের দরবারে তাদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য প্রার্থনা করা ব্যতিরেকে আর কিছু করার নেই।

আজ আবার একসঙ্গে তিনটি মৃত্যুর সংবাদ পেলাম। এই প্রথমবারের মতো সালেহা আজ সাক্ষাতে আসেনি। সে, দিনা এবং অন্যান্য সমস্ত আত্মীয়স্বজন সালেহার বড় খালার গুরুতর অসুস্থতার সংবাদ অবহিত হয়ে কুষ্টিয়া ছুটে গিয়েছে। শুনলাম খালার মৃত্যু ঘটেছে। সালেহা, দিনা এবং অন্যান্য সকলে এখনও সেখানেই আছে। আনোয়ার, আউয়াল, রতন, দুলাল, সমিজ দেখা করতে এসে এই শোকসংবাদ দেয়। সঙ্গে আরও জানায়, শ্রীনগরের ইউনুস এবং লৌহজং-এর ইউসুফ পরলোকগমন করেছে।

সালেহার এই খালা তার মায়ের পিঠাপিঠি বড় বোন। সে সালেহার একমাত্র চাচিও বটে। দু'বোনের বিয়ে হয়েছিল দু'ভাইয়ের সঙ্গে। সেটাও একটা বড় ঘটনা। আমার নানাশ্বশুর ছিলেন মেদিনীপুরের বড় দারোগা। শুনেছি তিনি ছিলেন অপরূপ দেহসৌষ্ঠব ও পুরুষোচিত রূপ-লাবণ্যের অধিকারী। তাঁকে দেখলে বাঙালি বলে বোধ হত না। মামাশ্বশুরদের দেখে কিছুটা বোধে আসত। সেসময়ে মেদিনীপুরের অন্যতম মুসলিম জমিদারের দুই পুত্র আমার শ্বশুর এবং চাচাশ্বশুরের সঙ্গে তার দু'মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়। বিয়ে পড়াবার পূর্বক্ষণে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে দারোগা সাহেব ইন্তেকাল করে। শেষনিশ্বাসের পূর্বে সকলকে বলে যান, মেয়েদের বিয়ে বন্ধ করবে না।

একদিকে তাঁর লাশ কবরে সমাহিত হচ্ছে, অন্যদিকে মেয়েরা বিলাপ করতে করতে স্বামীর বাড়ি যাত্রা করছে। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য! মেদিনীপুরের ঘরে ঘরে দীর্ঘকাল সেটা ছিল বহুলআলোচিত বিষয়।

আমার চাচাশ্বশুর ছিল বড়। সে তিন পুত্র ও এক কন্যাসন্তান রেখে

www.pathagar.com

অকালে পরলোকগমন করলে এই মহিলা অধিকাংশ সময়ই ধর্ম-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। বাড়ির বড় জামাই হিসাবে আমাকে সে খবুই স্নেহ করত। যখনই কুষ্টিয়া যেতাম বা সে ঢাকা আসত আমার মাথা দুই হাতে ধরে অনেক স্নেহ ও দোয়ায় কপালে চুমো খেত। বলত, বাবা, তুমি কেবল আমাদের জামাই নও, তুমি আমাদের সন্তানের অধিক, তোমাকে দেখলে আমার প্রাণ জুড়ায়।

শ্বশুরবাড়ি গেলে আর সকলের যত্নআত্তির সঙ্গে খালার অকৃত্রিম স্নেহ ও আদর-আপ্যায়নে বিমোহিত হতাম। তাদের দু'বোনের ডাকনাম ছিল হাসা ও ময়না। তারা আমাকে বাবা বলে ডাকত বলে আমি প্রায়ই তাদেরকে শুনিয়ে শুনিয়ে সালেহা এবং তার ভাইবোনদের উদ্দেশে হাঁক-ডাক করতাম, হাসা-ময়নার খবর কী? তারা কি করছে? অতি স্নেহশীলা মাতৃসমা সেই খালা পরলোকে চলে গেল। কিছুই করার নেই। কেবল পরম করুণাময়ের কাছে একান্ত মিনতি, তুমি এই পুণ্যবতী মহিলাকে জান্নাতবাসিনী করো।

ইউনুস ছিল শ্রীনগরের আমার একজন একান্ত অনুগত কর্মী। যৌবনে অতি বেপরোয়া এই ইউনুসের অনেক ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডই সমর্থন করা যেত না। কিন্তু সর্বাবস্থাতেই সে ছিল আমার একান্তই অনুগত। যতই তাফালিং করুক না কেন আমি বা হাই সাহেবের সম্মুখে সে ছিল একান্ত বাধ্যগত শান্ত মানুষ। আমরা কখনও ধমক দিলে সে একটি শব্দ উচ্চারণ করত না। শ্রীনগর বাজারের আধিপত্য নিয়ে স্থানীয় জনগণের মধ্যে যে প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত তাতে ইউনুসের একটি পক্ষ অবশ্যই থাকত। শুনেছিলাম, কারণ বাড়ির প্রতিক্রিয়ায় বেসামাল হয়ে একদিন নাকি সে রামদা হাতে নিয়ে বাজারে প্রতিপক্ষকে ধাওয়া করেছিল। আমি তখন সরকারে। তার খুঁটির জোর অনস্বীকার্য। অনেক পরে বিষয়টি অবগত হয়ে যখন তাকে কড়া শাসন করি, সে মাথা নত করে দোষ স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে আশ্বাস দেয়। স্থানীয় যানবাহন কর্মীদের অন্যতম নেতা ইউনুস একসময় তার ইউনিয়নে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। শ্রীনগরে আমাদের বহু কর্মী শুভানুধ্যায়ী থাকলেও, সরকার থেকে পদত্যাগ করে যখন উপজেলা নির্বাচনকালে সেখানে ছিলাম তখন ইউনুস এবং তার পুত্ররা সার্বক্ষণিক তত্ত্ব-তালাশ করত। ইউনুস তার বাড়ি থেকে খাবার রান্না করে পাঠাত। দোষে-গুণেই মানুষ। তার কারণে কখনও বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হলেও তার অবদানও ছোট করে দেখা যায় না। কর্মী অনেকই ছিল, হাই সাহেবের কোল্ড স্টোরেজসংলগ্ন আমাদের আস্তানায়ও রান্নার আয়োজন ছিল। তার পরও ইউনুস প্রতিদিন বিশেষ ব্যবস্থা করতে ভুলত না। এসব কি বিস্মৃত হওয়া

www.pathagar.com

যায়! প্রার্থনা করি আল্লাহ্ যেন তার সব দোষত্রুটি ক্ষমা করে তাঁর রহমতের মাঝে তাকে গ্রহণ করেন।

লৌহজং থানার মৌছামান্দ্রা গ্রামের ইউসুফ ছিল আমার আর এক আজীবন ভক্ত ও কর্মী। আমি আওয়ামী লীগ, সে আওয়ামী লীগ। আমি যখন ডেমোক্রেটিক লীগ, সেও তখন তা-ই। আমি জাতীয় পার্টিতে এলে সেও আমার অনুগামী। কোনদিন প্রশ্ন করেনি। একান্ত অনুগত ও শুভাকাঙ্ক্ষী এই কর্মীটির তুলনা সহজে পাওয়া ভার। ফরসা দেহে ছিল কিছুটা মোটার ধাঁচ। তাকে খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সর্বদা সতর্ক করতাম। একদিন এসে হাসতে হাসতে বলে, লিডার, আমি চিরদিন আপনার অনুসারী। আপনার পথই আমার পথ, আমিও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত।

বলি, এই একটি ক্ষেত্রে কেউ আমার অনুগামী হোক এটা কামনা করি না।

কিন্তু ইউসুফ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। সে দূর সম্পর্কে আমাদের আত্মীয়ও হত। সে আত্মীয় শব্দটা উচ্চারণ করত 'আপ্তীয়' বলে। আমার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তার ছিল অকৃত্রিম। কোথাও কোন ভালো জিনিস তার চোখে পড়লে, কোথাও কোন সুস্বাদু খাদ্য তার দৃষ্টিতে এলে সে যত অসুবিধাই হোক তা সংগ্রহ করে আমার জন্য নিয়ে আসত। একাজে লৌহজং-এর আর এক কর্মী দীর্ঘদেহী মন্টু ছিল তার সহযোগী। ইউসুফ সময় পেলেই যখন-তখন আমার বাসায় এসে উপস্থিত হত। অধিকাংশ সময় অ্যাডভোকেট শহীদকেও সাথে নিয়ে আসত। রক্তিম ফরসা দেহটি নিয়ে আকর্ণবিস্তৃত হাসি ছড়িয়ে সে এসে উপস্থিত হত। সে আর আসবে না, তাকে আর দেখব না। পরম করুণাময়ের কাছে একই প্রার্থনা, তার বিদেহী আত্মা যেন তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়।

অনেকগুলো বিয়োগের পর একটি যোগের শুভসংবাদ পাওয়া গেল। ওবায়েদ নানা হয়েছে। তার একমাত্র মেয়ে স্বামীসহ আমেরিকায় বাস করে। সে প্রথম পুত্রসন্তান লাভ করেছে। ওবায়েদের তৃতীয় প্রজন্মের শুরু।

'নিত্য কারাগারে'র ওবায়েদ যুবক, অবিবাহিত। আজ সে আমাদের মতোই প্রৌঢ় এবং ইতিমধ্যে মাতামহ হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। এদিক থেকে সে সিনিয়ার বনে গেল। আমার ছেলে এখনও অকৃতদার। মেয়ের বিয়ে হয়েছে '৯৭-তে। সৃষ্টিকর্তা কখন তাদেরকে সন্তান দান করবেন তিনিই জানেন। আমারও সাধ জাগে নাতি-নাতনির হাত ধরে বাড়ির আঙিনায় পদচারণা করতে। সে শখ মিটবে কি না সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলাই বলতে পারেন।

ছাব্বিশ সেলে ওবায়েদ আট নম্বর ঘরে থাকে। দুঃখ করে বলল, মেয়েকে

www.pathagar.com

কথা দিয়েছিলাম, তার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত থাকব, কিন্তু এই মামলায় আটক হবার কারণে তা সম্ভব হল না। স্ত্রীকে পাঠাতে হল।

বেচারার একটিই সন্তান। কত আশা করেছিল। কিন্তু মানুষের আশা কতটুকুইবা ফলে! আমরা পিজিতে ভর্তি থাকার সময় ওবায়েদের মেয়ে এবং জামাতা দেখতে এসেছিল। রমজানের মাঝে তারা নিজেদের হাতে আমাদের ইফতার করিয়ে যায়। মেয়েটি যখন ছোট ওবায়েদের সঙ্গে সে নামাজের অনুশীলন করত। শব্দ করে ফরজের দু'রাকাত পড়ার পর সে যখন বাকিটা নিঃশব্দে পড়ত মেয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করত, তুমি ভুলে গেছ?

ওবায়েদ নামাজান্তে সময় নিয়ে মেয়েকে নামাজের নিয়ম-পদ্ধতি বোঝাবার চেষ্টা করত।

মেয়ের বিয়ের সময় আমাকে আমন্ত্রণ করেছিল। গিয়েছিলামও, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ থাকিনি। বেগম খালেদা জিয়া তখন প্রধানমন্ত্রী। ওবায়েদ তখন বিএনপি পরিত্যাগ করে জনতা দল করেছে। প্রধানমন্ত্রীকে সে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেসময়ে বেগম সাহেবার সরকার এবং দল আমাদের উপর বিশেষ করে আমার উপর যে অকথিত নির্যাতন চালিয়েছিল, সে কারণে তার সঙ্গে সে অনুষ্ঠানে থাকা সম্ভব ছিল না। ওবায়েদকে বলে চলে এসেছিলাম, সে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিল।

ওবায়েদের মেয়ের শ্বশুর ড. মাজহারুল ইসলাম দেশের একজন কৃতী শিক্ষাবিদ। সে সুপণ্ডিত এবং একজন সুসাহিত্যিকও বটে। সে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময় উপচার্য ছিল। এই ছাব্বিশ সেলে সেও আমাদের সঙ্গে জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে জেল খেটে গেছে। সে আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করত। জেলখানায় অবসরে আলাপ-আলোচনায় একদিন রস করে বলেছিল, মিস্টার আইভি রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক না করে যদি সেদিন আপনাকে সে স্থলে নির্বাচিত করা হত তা হলে এদেশের রাজনীতির ইতিহাস ভিন্নখাতে প্রবাহিত হত। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বিধায় নিশ্চুপ ছিলাম।

'৯৬ সালের নির্বাচনে সে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নিশ্চিত জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল। বিজয়ী হয়ে এলে শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী করা হবে এমন আশ্বাসও নাকি তাদের নেত্রীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছিল। টের পেয়ে একই অঞ্চলের অধিবাসী আজকের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী নিজেদের ক্ষমতায় আরোহণের পথে প্রতিযোগী না রাখার উদ্দেশ্যে সুকৌশলে ইসলাম সাহেবকে পরাজিত করে দেয়। রাজনীতির কূটচালে অনভ্যস্ত শিক্ষাবিদকে বুঝিয়ে তার নির্বাচনের সব দায়দায়িত্ব তারা নিজেরা গ্রহণ করে

www.pathagar.com

এবং ফলশ্রুতিতে নিশ্চিত বিজয়কে পরাজয়ের গ্লানিতে রূপান্তরিত করে দেয়। এদের প্রতিভার অন্ত নেই!

এবার সিরাজগঞ্জের উপনির্বাচনে তার ছেলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে জয়লাভ করে পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়। সেও আওয়ামী লীগ করত। যোগ্যতম প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় না। উপরন্তু স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কারণে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। নির্বাচনের ফল প্রকাশ হলে ওবায়েদ খুশিতে ছাব্বিশ সেলে ফিস্টের ব্যবস্থা করে ফেলে। একদিকে নাতির জন্ম, অন্যদিকে পুত্রার নির্বাচনে জয়লাভ।

ওবায়েদ এখনও আগের মতই হৈচৈ করে। ডায়েবেটিস, হার্ট প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হলেও আওয়াজ এখনও হ্রাস পায়নি। সামনে বসে আর একজন সারাক্ষণ টিকা-টিপ্পনী কাটতে থাকলে গত্যন্তর কী! পূর্বের মতো এখন আর অতিরিক্ত খাওয়া চলে না। কিন্তু ঘুমের কোন ব্যাঘাত নেই। ডায়াবেটিসের কারণে দিনে-রাতে তাকে দু'বার ইনসুলিন নিতে হয়। আকরাম সাহেব যেদিন প্রথম ছাব্বিশ সেলে আসে সে-রাত্রে ওবায়েদের সেল খুলে যখন ফার্মাসিস্ট আউয়াল সাহেব ভিতরে প্রবেশ করে, গেট খোলার শব্দে তার ধারণা জন্মে জেলহত্যার মতো আর একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। সকালে সেকথা শুনে হাসি পেলেও তার আশঙ্কার বিষয়টি ঠিকই অনুধাবন করি।

ওবায়েদের একটা বিশেষ গুণ এবার পরিলক্ষিত হয়। পিজিতে আমরা জামাতে নামাজ পড়তাম। সে ইমামতি করে। রমজানের সময় সূচারুরূপে মাসব্যাপী তারাবির নামাজ পড়িয়ে সে কৃতিত্ব অর্জন করে। এবারই তার খোনকারীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। পবিত্র কোরানের অনেক সুরা আয়াত তার মুখস্থ, ধর্মীয় জ্ঞানও প্রশংসনীয়।

বেচারা মানসিকভাবে অধিকতর বিপর্যস্ত। সরকার তার স্ত্রী অধ্যাপিকা শাহেদা ওবায়েদকেও হয়রানির চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী এবং আরও ক'জন ব্যক্তিকে হত্যার একটা নীলনকশা তারা আবিষ্কার করেছে। শোয়েব চৌধুরী নামে জনৈক ব্যবসায়ী নাকি ই-মেইলের মাধ্যমে তাদের হত্যার পরিকল্পনা ফাঁস করেছে। হৈহৈ ব্যাপার, রৈরৈ কাণ্ড। তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে কত-না গালগল্পের প্রচারণা! অনেকের সঙ্গে মিসেস ওবায়েদের নামও নাকি রয়েছে। সে হাইকোর্ট থেকে আগাম জামিন নিতে বাধ্য হয়।

নিজে জেলহত্যা মামলার আসামী, স্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কল্পিত হত্যার ততোধিক কল্পিত অভিযোগে অভিযুক্ত। মানুষের দুরভসন্ধি কতদূর ব্যাপৃত হতে পারে আওয়ামী লীগ সরকার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্বামীর গ্রেপ্তারের পর স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী হিসাবে সে এই মামলার বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিল।

www.pathagar.com

বিভিন্ন সময় সংবাদপত্রের সঙ্গে কথা বলেছে। তার পক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সরকার তা সহ্য করতে পারে না। তাকেও বেকায়দায় ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

বাঘ আসে, বাঘ আসে বলে চিৎকার দিয়ে লোককে ফাঁকি দেওয়ার সেই রাখাল বালকের গল্প মনে পড়ে যায়। বারবার প্রতারিত হওয়া লোকেরা সত্যিই যেদিন বাঘ আসে সেদিন তার শত চিৎকারেও এগিয়ে আসে না। বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে। গল্পের শিক্ষণীয় তত্ত্বটি যত শীঘ্র সংশ্লিষ্টরা অনুধাবন করে ততই মঙ্গল।

সিরাজগঞ্জের উপনির্বাচনের একটা কুৎসিত পটভূমি রয়েছে। কুৎসিত এইজন্য যে, এদেশে অনেক কোটারি, দলবাজি, গ্রুপবাজি হয়েছে, একদল থেকে ভাগিয়ে নিয়ে অন্যদল ভারী করার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু এবার বঙ্গবন্ধু-তনয়ার নেতৃত্বে যে অভাবনীয় কাণ্ড সিরাজগঞ্জ এবং রাজশাহীতে ঘটে এদেশের বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ইতিহাসেও তার তুলনা নেই।

রাজশাহীর সদস্য ভদ্রলোক প্রবীণ আওয়ামী লীগার। দল তাকে মনোনয়ন না দিলে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে বিএনপিতে যোগ দিয়ে তাদের প্রার্থী হিসাবে সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসে। সিরাজগঞ্জের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। স্বপন নামের করিতকর্মা এই লোক মূলত জাতীয় পার্টিভুক্ত। পার্টি তাকে মনোনয়নও দেয়। কিন্তু দেখা গেল একই সঙ্গে সে বিএনপিরও মনোনয়ন লাভ করেছে। শেষ পর্যন্ত বিএনপির প্রার্থী হিসাবেই নির্বাচিত হয়ে আসে। তথাকথিত সমঝোতার এই আজগুবি সরকার সকল নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে রাজনৈতিক শিষ্টাচারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে দল পরিবর্তনের নগ্নতম উদাহরণ সৃষ্টি করে এই দুই সদস্যকে বাগিয়ে নিয়ে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে এক অমার্জনীয় অপরাধ সংঘটিত করে। দেশের শাসনতন্ত্রে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, ফ্লোর পরিবর্তন করলে তার সদস্যপদ শূন্য হবে। কিন্তু আওয়ামী ন্যায়নীতি এসবের ধার ধারে না। তাদের গরজ বড় বালাই। স্পিকার তাদের দলভুক্ত। বিএনপি'র আবেদনের পরও সে আসন দুইটি শূন্য ঘোষণা করা হয় না। স্পিকার ও নির্বাচন কমিশনে অনেক টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে তাদের আসন শূন্য ঘোষিত হয়। সে কারণেই এই দুই স্থানে উপনির্বাচন।

শতমুখে রাজনীতির ন্যায়নীতির কথা বলতে অস্থির আওয়ামী নেতৃত্ব এই দুই সদস্যকে নিয়ে যে ঘৃণ্য নাটকের অবতারণা করেছে, এদেশের রাজনীতির ইতিহাসে তা চিরদিন এক নিন্দনীয় ও নজিরবিহীন ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কোন দলই এ ধরনের মানুষদের গ্রহণ না করে সর্বদলীয় ভিত্তিতে

www.pathagar.com

অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে রাজনৈতিকভাবে একঘরে করলে উচিত শিক্ষা হয়। কিন্তু বৃহৎ দলই যেখানে বৃহত্তম অন্যায় করে সেখানে ব্যক্তির অপরাধের প্রতিকারের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

নয় নম্বর ঘরে যে আছে তাকে পিজিতে যাওয়ার সময় আমরা রেখে যাইনি। সে পরে এসেছে। পুলিশের ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলাম ডিভিশনপ্রাপ্ত হয়ে এখানে আগমন করে। পূর্বে তার ঘরে ছিল অবসরপ্রাপ্ত মেজর ওয়াহেদ। আমার মুলকি ভাই শুকুর মামুদ অর্থাৎ দেশী মেজর জয়নাল আবেদীনের খপ্পরে পড়ে সেও ইসলামী উম্মাহ কর্পোরেশনের অনেকগুলো মামলায় অভিযুক্ত। সে ছিল কর্পোরেশনের অন্যতম কর্মকর্তা। সে জানায় মেজর জয়নালের প্ররোচনায় কত মানুষের যে ভোগান্তি হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। নিজে এখন দুবাই পাড়ি জমিয়ে নিরাপদে আছে। এবার এখানে আসার পর একমাত্র তাকেই বিদায় জানাতে পেরেছি। আমাদের আসার কিছুকাল পরই জামিন পেয়ে মেজর ওয়াহেদ মুক্তি লাভ করে।

পিজি থেকে প্রত্যাবর্তন করে আমিনুল ইসলামের দেখা পাই। সে-ই বোধহয় বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ। বর্তমানে এখানে যে আট জন মানুষ বাস করে তাদের মধ্যে নাইজেরিয়ার রবার্ট ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সাত জনই খুনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত। রায়হান সাহেব পুত্রহত্যার দায়ে সাজাপ্রাপ্ত, হালিম সাহেব স্ত্রীহত্যার দায়ে, এসি আকরাম এবং ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলাম প্রখ্যাত রুবেল হত্যা মামলার আসামী। আর আমরা তিন জন জেল-হত্যা মামলায় অভিযুক্ত।

সেদিন পরিহাস করে মন্তব্য করেছিলাম, পূর্বে ছাব্বিশ সেলে কেবল রাজবন্দিরা থাকত। এখন সেখানে সব খুনের মামলার মানুষজনের আনাগোনা। অবশ্য জেলখানা মানেই তা-ই। কেউ এখানে ফেরেশতা খুঁজে পাবে না। দুনিয়ার যত অপরাধীদের হেড-কোয়ার্টার এই কারাগার। বিনা অপরাধে কারানির্যাতন ভোগের দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। আমাদের এবারের কারাভোগই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমিনুল ইসলামের কথাও তা-ই। তাকেও অন্যায়ভাবে জড়িত করা হয়েছে বলে সে দাবি করে।

বিনম্র আচরণের এই যুবক পুলিশ কর্মকর্তাটি ভদ্রঘরের সন্তান। তার বিনয় ও স্বভাব-কোমলতায় সেকথাই প্রতীয়মান হয়।

www.pathagar.com

রবার্ট ও সে একসঙ্গে ব্যায়াম করে, হাঁটে, তর্ক করে এবং কীসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচুর হাসাহাসি করে। নবীন বয়স, মনে কত উচ্ছ্বাস। কত না ভাবের উদয় হয়। সযত্নে তাদের নিভৃত আলাপচারিতা এড়িয়ে চলি।

সেদিন দেখি, ইসলামকে মাটিতে শুইয়ে উপুড় করে ফেলে রবার্ট তার ঘাড় চেপে রেখেছে, ইসলাম ওঠার চেষ্টা করছে।

বুঝতে পেরেও পরিহাসের সুযোগ ছাড়ি না, একী রবার্ট! আপনি আমাদের একজন পুলিশ অফিসারকে এভাবে নির্যাতন করছেন? আপনার সাহস তো কম নয়!

তারা দু'জনেই প্রাণ খুলে হেসে ওঠে।

রবার্ট বলে, না না, স্যার, আমি তাকে ব্যায়াম শিক্ষা দিচ্ছি।

তা-ই বলুন। আমি ভাবলাম, কী না কী!

দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গ আলাপের শেষ নেই। কখনও সেলের সম্মুখ ভাগের বারান্দায় বসে, কখনও দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে, কখনও হাঁটতে হাঁটতে বা রান্নাঘরের কোনায় নিরিবিলিতে দাঁড়িয়ে তারা আলাপে নিমগ্ন। কখনও বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ। চেষ্টা করে দূরে দূরে থাকলেও সেদিন আর পারলাম না। সিঁড়িতে বসে দু'জন ধর্ম নিয়ে বিতণ্ডায় মেতেছে । রবার্ট একজন নও-মুসলিম। পূর্বে খ্রিস্টান ছিল, জেলখানায় সে ধর্মান্তরিত হয়েছে। সে বলেছে, সকল ধর্মের অনুসারীরাই পুণ্য করলে স্বর্গলাভ করবে।

আমিনুল ইসলাম দৃঢ়তার সাথে তা অস্বীকার করছে। তার বক্তব্য হল, মুসলমান ব্যতিরেকে কেউ বেহেশত লাভ করবে না।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম। দু'জনই আমাকে মধ্যস্থ মানে।

বলি, ধর্মের বিষয়ে মতামত দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। হালিম সাহেবকে বরং জিজ্ঞাসা করুন।

তারা দু'জনই বলে, তার মত আমরা জানি। আপনি কী বলেন?

বলি, ধর্ম সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। পবিত্র কোরানপাঠে যেটুক উপলব্ধি হয়েছে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু শেষ নবী, ইসলাম ধর্মও মানুষের জন্য সর্বশেষ মুক্তির পন্থা এবং পরিপূর্ণ জীবনবিধান। কোরান শরিফের সুরা আল ইমরানের পঁচাশি নম্বর আয়াতে সুস্পষ্ট বলা হয়েছে, "আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন তালাশ করে, তার থেকে তা কক্ষণও গ্রহণ করা হবে না।" তারপর অন্য ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমি যতটুকু অনুধাবন করি মুসলমান বা অনুগত হয়ে মৃত্যুবরণ না করলে তার পরিত্রাণ দুরূহ। তবে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র গ্রন্থে আরও বলেছেন যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে, নেক আমল করবে এবং তাঁর নির্দেশাবলি অনুসরণ করবে তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। সেদিক থেকে প্রতীয়মান হয়, আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে কোনকিছু শরিক না

www.pathagar.com

করলে, মূর্তিপূজা না করলে, পবিত্র জীবনবিধান মেনে চললে যে-কোন মানুষই পরকালে শান্তিময় স্থানলাভে সমর্থ হবে। তাঁর একত্ববাদ, নবীদের উপর বিশ্বাসস্থাপন এবং পরকালে আস্থা থাকলে তিনি যে-কোন মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন।

তারা দু'জনই আমার কথা তখনকার মতো মেনে নিয়ে রণে ভঙ্গ দেয়।

ইন্সপেক্টর ইসলাম স্বভাবনম্র। আলাপ ও আলোচনায় যথেষ্ট বিনয়ী হলেও পুলিশের বিরুদ্ধ সমালোচনা তার মনঃপূত নয়। পুলিশের নানাবিধ অবিমৃশ্যকারিতার কাহিনী খবরের কাগজে ছাপা হয়। পুলিশ কর্তৃক লাঠিচার্জ, কাঁদানো গ্যাস নিক্ষেপ, গুলিবর্ষণ এসবের প্রয়োজনীয়তার কথা সে জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করে। এমনকি, পুলিশের হাতে কয়েদির মৃত্যু, অতিরিক্ত নির্যাতনের ফলে থানা-হাজতে বা পুলিশ গারদে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু, পুলিশ কর্তৃক নারী-নির্যাতন, নারীধর্ষণের ঘটনারও সে মৃদু সাফাই গাইবার প্রয়াস পায়। পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতি, হঠকারিতা, অসংখ্য অপকর্ম এবং বে-আইনি কার্যকলাপের প্রচুর উদাহরণ তুলে ধরলেও সে তাদের পক্ষে একটা ভিন্নধর্মী যৌক্তিক বক্তব্য দাঁড় করাবার প্রয়াস পায়। পুলিশের সকল কাজের একটা বৈধ ব্যাখ্যাপ্রদানের প্রচেষ্টা দেখে হাসি পায়। রুবেল হত্যা, পুলিশের সোর্সকে হত্যা করে পানির ট্যাংকে লুকিয়ে রাখা, দিনাজপুরে ইয়াসমীন হত্যার মতো ঘটনাবলি মানুষের স্মৃতিতে অম্লান। বলি, আপনাদের বিরুদ্ধে যে মামলাটি সুচারুভাবে সজ্জিত হয়েছে, এটিও তাদেরই এক বিরল কৃতিত্বের পরিচায়ক নয় কি!

সে আর উচ্চবাচ্য করে না।

আরও বলি, এটা ঠিক, জাতি সামগ্রিকভাবে যখন মূল্যবোধের শূন্যতায় ভোগে তখন কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর নিকট থেকে সুফল প্রত্যাশা করা সুদূরপরাহত। তাই বলে ক্ষেত রক্ষা করার জন্য যে বেড়ার ব্যবস্থা করা হয়, সেই বেড়াই ক্ষেত নষ্ট করতে থাকলে আর পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকে না। সমাজে অপরাধ আছে বলেই দমনের জন্য জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পুলিশ নিয়োগ করা হয়। দমনের পরিবর্তে রক্ষক ভক্ষকে পরিণত হয়ে তারাই যদি অপরাধের উৎকর্ষবিধানে প্রবৃত্ত হয় তা হলে আম-ছালা একসঙ্গে বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

সে তখনকার মতো আর কথা বাড়ায় না। তার পাশের কক্ষে বাস করে তারই অফিস বস। পুলিশের সহকারী কমিশনার আকরাম সাহেব। সংবাদপত্রে বহুল প্রচারণার ফলে আর আলোকচিত্রের সমারোহে এসি আকরাম এখন সুপরিচিত।

আমার সঙ্গে পূর্বে তার পরিচয় ছিল না। আকরাম সাহেবের বুকের মাঝে একটা বিরাট শোক গেঁথে আছে। কিছুদিন পূর্বে তার দ্বিতীয় পুত্র বিপ্লব ঢাকায়

www.pathagar.com

এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। ইন্টারমিডিয়েটে লিখিত পরীক্ষা প্রদানের শেষে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটে। বেশ কিছুদিন আকরাম সাহেব পুত্রশোকে পাথর হয়ে ছিল। বিপ্লব স্কুলজীবনে সালেহার ছাত্র ছিল। সেই সুবাদে তার সাথে পরিচয় রয়েছে।

কিছুদিন মুন্সীগঞ্জেও কাজ করেছে। টঙ্গীবাড়ির বন্দুকযুদ্ধের তদন্তে জড়িত ছিল। সেদিন সে সকলের সম্মুখে স্বীকার করে, স্যার, বাইরে আপনার কথা এত শুনেছি, আপনার জেলায় কাজ করে এলাম, কিন্তু কোনদিন আপনি কোন বিষয়ে কোন অনুরোধ বা আদেশ-নির্দেশ দেননি। এক্ষেত্রে আপনিই একমাত্র ব্যতিক্রম।

তাকে বলি, বাইরে যতই বদনাম শুনে থাকুন না কেন, আমি কর্মচারী, কর্মকর্তাদের কাজে কখনওই প্রভাবিত করার চেষ্টা করিনি।

রুবেল হত্যা-মামলায় প্রধান আসামী করা হয়েছে আকরাম সাহেবকে। তার বক্তব্য, কর্তব্যপরায়ণতা ও দক্ষতার জন্য একে-একে চার বার রাষ্ট্রীয় পদকপ্রাপ্তির কারণে পুলিশ বিভাগের মধ্যেই একদল লোক তার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে। তারা তাকে কোন প্রকারে পথ থেকে অপসারণের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। পুলিশের হাতে রুবেল নিহত হলে এ নিয়ে সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। নিন্দা আর ক্ষোভের অন্ত থাকে না। দেশব্যাপী ধর্মঘটও পালিত হয়।

কাজটি অবশ্যই অত্যন্ত গর্হিত ও নিন্দনীয় এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মেধাবী ছাত্র হোক বা চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসীই হোক, প্রয়োজনে গ্রেপ্তার নিশ্চয়ই করা যাবে। কিন্তু গ্রেপ্তার করে নির্যাতন করে হত্যা করে ফেলতে হবে এর চাইতে ঘৃণিত কাজ আর কিছু হতে পারে না। এটা অনস্বীকার্য, আকরাম সাহেবের অধীনস্থ লোকেরাই এ অপকর্মটি সাধিত করেছে। দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি হোক এটা সকলেরই কাম্য, কিন্তু সুযোগ পেয়ে নির্দোষ মানুষকে জড়িয়ে দিয়ে পথের কাঁটা অপসারণের মানসিকতা অধিকতর নিন্দনীয়। তার বক্তব্য মতে এক্ষেত্রে সে ধরনের ঘটনাই ঘটেছে। তাকে নিমিত্তের ভাগী করে পুলিশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্র পারে না এমন কাজ নেই। আকরাম সাহেব ও তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এমন সব কল্পকাহিনী ফাঁদা হয়েছে, যা সুস্থ মস্তিষ্কে ভাবা যায় না। কাগজে পড়ে মনে হত, সত্য হলেও হতে পারে। কিন্তু এখন সরাসরি তার মুখে সব অবগত হয়ে ঘটনার বিষয়াদি পর্যালোচনায় এনে এটাই প্রতীয়মান হয়, না জেনে, না শুনে, কাল্পনিক গল্পগাথার বিরামহীন পরিবেশনা সংবাদিকতা পেশার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। মিথ্যাচার ও আক্রোশের বশবর্তী হয়ে পূর্বতন বীতরাগ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে বল্গাহীন কল্পকাহিনী পরপর ছাপার অক্ষরে পরিবেশিত হয়,

www.pathagar.com

সমাজজীবনে তার একটা স্থায়ী প্রভাব পড়া খুবই স্বাভাবিক। আকরাম সাহেবের ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য।

যা এতদিন ধরে শুনলাম ও জানলাম, সংবাদপত্রের কোর্ট রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ করে যা অবগত হলাম তাতে এই কৃতী পুলিশ কর্মকর্তাটিকে এ ধরনের একটি মামলায় জড়িত করাটাকে আক্রমণাত্মক হীনমনোবৃত্তির পরিচায়ক বলেই মনে করার কারণ রয়েছে

সেদিন বিকেলে সেলের সিঁড়িতে একাই বসে ছিলাম। মাল-সামান নিয়ে কারা-রক্ষীদের সঙ্গে একজনকে এদিক এগিয়ে আসতে দেখে নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করেছিলাম, এটা আবার কে?

সে এগিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে নিবেদন করে, স্যার, আমি আকরাম।

আর কিছু বলতে হয় না। নামের সঙ্গেই পরিচয় জড়িত। সেই থেকে আকরাম সাহেব আমাদের নিত্যসঙ্গী। ক্রমে তার মামলা সম্বন্ধে সবই অবগত হলাম। বহু আসামী গ্রেপ্তার করার কৃতিত্বের দাবিদার পুলিশ কর্মকর্তার এখন নিজের হাতেই বেড়ি। জেল কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল কারাগারে আকরাম সাহেবের অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যেসব নামকরা অভিযুক্তদের সে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছিল তারা প্রায় সকলেই তার এই হেনস্তায় অপরিসীম দুঃখিত। তারা আকরাম সাহেবকে কোন অমর্যাদা করে না। বরং সৌজন্যমূলক আচরণই লক্ষ্য করা যায়। আকরাম সাহেব বলে, কর্মজীবনে কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে ভয় করি না। ভয় করি কেবল জেলখাটার সম্ভাবনাকে।

পরিশেষে ভাগ্যে সেটাই তার জুটল।

বিড়ালের উৎপাত জেলখানায় সব সময়ই প্রচুর। আমি কুকুর-বিড়ালের সান্নিধ্য উপভোগ করি না। আমার ঘরে বিড়াল ঢুকলে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দিই। অবস্থাদৃষ্টে ওরাও এখন আর খুব একটা এদিকটা মাড়ায় না। বিড়ালের একটা অভ্যাস দেখলাম ভালো। বাগানে সামান্য মাটি সরিয়ে মলত্যাগ করার পর মাটি দিয়ে তা ঢেকে দেয়। অন্য কোন প্রাণী তা করে না।

সেদিন আকরাম সাহেবের ঘরে ঢুকে বিড়াল তার খাবার নষ্ট করেছে। সে গাছের ডাল ভেঙে একটা লাঠি বানিয়ে বিড়ালকে তাড়া করেছে। আমি তখন লম্বা বারান্দায় প্রাতঃভ্রমণ করছিলাম। বাইরে বৃষ্টিপাত। বিড়ালটি তাড়া খেয়ে দৌড়ে এসে আমার দু'পায়ে জড়িয়ে পড়ে। দ্রুতগতিতে চলন্ত অবস্থায় পা জড়িয়ে আমি দুর্ঘটনার পতিত হই। সিমেন্টের বারান্দায় আছাড় খেয়ে পড়ি। ডান পায়ের হাঁটু ফেটে যায়। ডায়েবেটিকের রোগীর আঘাত সহজে সারতে চায় না। ডাক্তার এবং ফার্মাসিস্ট এসে প্রতিদিন ধুয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়ে যায়। অনেকদিন পর্যন্ত নামাজ পড়তে কষ্ট হত। আকরাম সাহেবের দুঃখ ও লজ্জার আর শেষ নেই। দীর্ঘ মোনাজাতে তার

www.pathagar.com

কান্না দেখে উল্টা তাকে প্রবোধ দিই। বোঝাতে চেষ্টা করি, অদৃষ্টের ফেরে আমি আঘাত পেয়েছি, এতে তার কোন হাত ছিল না। তবুও তাকে বোঝাতে সময় লাগে। আমার দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেকেই দায়ী মনে করে। অনিচ্ছাকৃত হলেও ত্রুটি নাকি তারই। তাকে সহজ করার জন্য বলি, জানেন না দশ সেলের দুষ্ট ছেলেরা সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌কে ডাকা এক হাফেজ সাহেবকে কী বলেছে? যখন-তখন যে আল্লাহ্‌কে ডাকা-ডাকি করে বিরক্ত করছেন, শেষে সে ফেরেশতা পাঠিয়ে আপনাকে শায়েস্তা করবে!

এই মামলার আর এক আসামী মুকুলি বেগম। রুবেলদের পাড়ার এক গৃহবধূ। তার হাতের একটি চিরকুটকে কেন্দ্র করেই নাকি পুলিশ তৎপরতা শুরু হয়। তার জামিন মঞ্জুর না হওয়ার কারণ বোধগম্য হয় না। সেদিন দেখায় গেলে একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলা এসে আমাকে সালাম করে। বলে, আমি মুকুলি বেগম।

বলি, বুঝেছি, আপনি রুবেল মার্ডার কেসের আসামী।

সে জানায় তার স্বামী দুলালের বাড়ি আমার পাশের গ্রাম মেদিনীমণ্ডলে। পরিচয় হতে তার স্বামীকে চিনতে পারি। আকরাম সাহেবের কথা ওঠায় মুকুলি বেগম জানায় সে পূর্বে আকরাম সাহেবকে চিনত না। সেলে ফিরে এসে মুকুলি বেগমের কথা বলতেই আকরাম সাহেব বলে, স্যার, জানেন না? সে আমার গার্ল ফ্রেন্ড!

আমরা তখন নামাজে দাঁড়াচ্ছি। পরিহাস করে মন্তব্য করি, জায়নামাজে দাঁড়িয়ে যখন স্বীকার করছেন তখন আর অবিশ্বাস করি কী প্রকারে!

সে হতাশ কণ্ঠে বলে, আল্লাহ্ সবই জানেন। আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলো তাকে আমার গার্লফ্রেন্ডে পরিণত করেছে। আপনি পড়েননি?

বলি, বাদ দেন। কত আর পড়ব? ওরা কত কথাই লেখে। তাতে কিছু আসে-যায় না। কুকুরের লেজ কখনও সোজা হয় না এবং তাকে তাড়া করলেও হাঁপায়, ছেড়ে দিলেও হাপায়। ওটাই তার স্বভাব।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী সংসদ থেকে পদত্যাগ করে আওয়ামী লীগকে চ্যালেঞ্জ করে পুনরায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। পূর্বে সেও আওয়ামী লীগেই ছিল। সরকারের ফ্যাসিবাদী অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে সে সমালোচনামুখর হলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেও পাল্টা রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে।

আকরাম সাহেবকে অনুরোধ করি, টাঙ্গাইলের মানুষ আপনি। শুনেছি সেখানে আপনাদের প্রভূত প্রভাব রয়েছে। চেষ্টা করুন যাতে সিদ্দিকীকে বিজয়ী করা যায়।

সে সাগ্রহে সম্মত হয়। বন্দিখানায় বসেই যথাসাধ্য তৎপরতা চালায়।

www.pathagar.com

আমরা টাঙ্গাইলের মানুষ পেলেই কাদের সিদ্দিকীর পক্ষে কথা বলি। সেখানকার কারারক্ষীদেরকে ছুটি নিয়ে কাদের সিদ্দিকীর পক্ষে ভোট দিতে যেতে বলি। দেখায় গিয়েও যেটুকু সম্ভব চেষ্টা করি লোকজনদেরকে অনুরোধ করে পাঠাতে যাতে তাকে বিজয়ী করা যায়।

মনে মনে হাসি। এই কাদের সিদ্দিকীই একদিন শেখ হাসিনার সঙ্গে রংপুরের পীরগঞ্জে উপনির্বাচনে আমার বিরুদ্ধে প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেছিল। আর আজ আমি জেলখানায় বসেও তাকে কৃতকার্য করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। সত্যিই রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু থাকে না।

রাজনীতি-বহির্ভূতও কিছু সম্পর্ক থাকে যার মর্যাদা না দিয়ে পারা যায় না। এই সিদ্দিকী পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ছাত্রজীবনে। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে আবদুল লতিফ সিদ্দিকী তখন ছিল টাঙ্গাইল ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা, আমার বিশেষ স্নেহভাজন। তারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাদের সিদ্দিকী।

তাদের পিতা জনাব আবদুল আলি সিদ্দিকী আমাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি ঢাকায় এলে আমাকে দেখতে আসতেন। পোড়াবাড়ির চমচম নিয়ে আসতেন। বলতেন, বাবা, তোমার জন্য একটা খাসি পালছি, তুমি টাঙ্গাইলে এলে জবেহ্ করব।

তাঁর আন্তরিকতায় বিমুগ্ধ হতাম। স্বাধীনতার পর যখন সরকারে প্রবেশ করি, তার পর থেকে চাচা আর আসেন না। তিনি ছিলেন বিচিত্র খেয়ালের মানুষ। তাঁর স্পষ্টবাদিতা, নির্ভিক আচরণ এবং আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অসামাঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড অনেকের নিকট বিসাদৃশ্য মনে হলেও আমি তাঁর কিছু-কিছু কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করি। অন্যেরা সমালোচনা করলেও আমি তাঁর গুণগ্রাহী। পেশায় মোক্তার সিদ্দিকী চাচা এক ঘুসখোর ম্যাজিস্ট্রেটকে জব্দ করার লক্ষ্যে একদিন টাকার বাণ্ডিল নিয়ে কোর্টে উপস্থিত হন এবং নোটের তোড়া লোফালুফি করতে করতে ঘোষণা দেন, আজ নিলাম ডেকে জামিন নেব।

আর এক তোষামদপ্রিয় এসডিওর এজলাসে এক বাটি সরিষার তৈল নিয়ে উপস্থিত হয়ে বলেন, আজ পর্যাপ্ত তৈলমর্দন করে এসডিও বাহাদুরকে খুশি করব।

লতিফ সিদ্দিকী, কাদের সিদ্দিকীর পিতা তিনি। তাঁকে সহজে কেউ ঘাঁটাতে যেত না।

ছাত্রলীগের সম্মেলন উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে আমাদের দাওয়াত করে একুশ পদ দ্বারা আপ্যায়নের কথা আমার আজও মনে আছে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ল, ছাত্রলীগের সেদিনের সব কেন্দ্রীয় নেতাকে নিয়ে সিদ্দিকীদের বাসায় খেতে বসেছি। আমার পাশে বসেছিল আবুল বাসার মৃধা। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাসার মৃধা ছাত্রলীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতাই

www.pathagar.com

শুধু নয়, সে ছিল আমার অতীব ঘনিষ্ঠজন। চাচা আমার প্লেটে দুটি বড় বড় কইমাছ তুলে দিতে আমি একটি বাসারের প্লেটে উঠিয়ে দিতেই সে খাওয়া ছেড়ে উঠে যায়।

বিষয় কী?

অনেক চাপাচাপিতে সে নিবেদন করে, অন্য কেউ তার প্লেট থেকে তাকে কিছু তুলে দিলে সে আর খেতে পারে না। শৈশব থেকে এই অভ্যাস। তার কথায় সেদিন কষ্ট পেয়েছিলাম। বেশি ভালোবাসা দেখাতে গিয়ে একী বিড়ম্বনা! বাসারও আমাদের ফাঁকি দিয়ে পরপারে চলে গেছে। আমার সঙ্গে ছিল তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। কোনদিন এর ব্যত্যয় ঘটেনি।

সৃষ্টিকর্তা একবারেই শেষ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করলেন। সেও ডায়াবেটিকের রোগী ছিল। যখন বেইলি রোডে ছিলাম তার বাসা ছিল সন্নিকটে। তাকে বলে রেখেছিলাম, দিনভর যেখানেই কাটাও না কেন, দুপুরে একসঙ্গে আহার করব। প্রায়দিনই আমরা একসঙ্গে গল্পগুজব করে লাঞ্চ সারতাম। বাসারের বউ স্বামীকে পরিহাসচ্ছলে বলত, তুমি যতবার মোয়াজ্জেম ভাইয়ের নাম কর, ততবার আল্লাহ্‌কে ডাকলে একজন আল্লাহ্‌ওয়ালায় পরিণত হতে।

বাসারের কথা থাক। তার স্মৃতি বড় মধুর কিন্তু এখন তা কেবলই বেদনাদায়ক।

সিদ্দিকীদের কথায় আসি। স্বাধীনতার পর লতিফ সিদ্দিকী যখন এমপি, বঙ্গবন্ধুর নিকট তার বিরুদ্ধে কালিহাতির কিছু লোক দরখাস্ত করে, মানুষের জায়গা-জমি জবরদখল করে কলেজ প্রতিষ্ঠার অভিযোগ জানায়। তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে বিষয়টি দেখতে অনুরোধ করেন। তিনি আমাকে দায়িত্ব দেন তদন্তের। হয়ত এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন। তিনি জানতেন সিদ্দিকীদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক। তদন্ত করেছিলাম, প্রতিবেদনও পেশ করেছিলাম। কিন্তু ফলাফল শূন্য। প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পাঠ করে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাহেব ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

লতিফ সার্কিট হাউসে এসে প্রথমটায় হৈচৈ করলেও যখন বুঝিয়ে বলি, আমার দ্বারা তদন্ত হলেই তার সবদিক রক্ষা পাবে, সে বিষয়টি উপলব্ধি করে আর উচ্চবাচ্য করে না।

তার সঙ্গে এবং পরে তার স্ত্রী লায়লা সিদ্দিকী সংসদ সদস্যা হলে তার সঙ্গে সর্বদাই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। তার বোন রহিমাও স্বামীকে নিয়ে আমার কাছে আসত। কাদের সিদ্দিকী যখন ভারতে স্বেচ্ছানির্বাসনে, আমাদের সরকারের সাংঘাতিক বিরোধী, তখনও কলকাতা থেকে টেলিফোন করে কখনও কোন অনুরোধ জ্ঞাপন করত।

তাকে এবং তাদেরকে ভালোবাসতাম, অনুরোধের যথাসাধ্য মর্যাদা

www.pathagar.com

দানের চেষ্টা করেছি। সেই কাদের সিদ্দিকীর পক্ষে আমার বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রচারণায় হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে পীরগঞ্জে যাওয়া আমার মনঃকষ্টের কারণ হয়েছিল বৈকি!

আজ সেসব মনে করে বসে থাকলে চলবে না। আজ তাকে বিজয়ীর বেশে দেখতে চাই। সে হাসিনার আঁচল পরিত্যাগ করে এবারই প্রথম বঙ্গবীর খেতাবের সত্যিকারের মর্যাদা প্রদান করেছে।

মিয়া সাহেবদের মুখে সংবাদ পাই, আকরাম সাহেব দেখা থেকে এসে আমাদের আশ্বস্ত করে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে, ভোটাররা স্বেচ্ছায় তাদের ভোট প্রয়োগে সমর্থ হলে কাদের সিদ্দিকী বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবে।

আমরা আশান্বিত হয়ে উঠি।

কিন্তু দুটি সরকারই গুয়ের এপিঠ বা ওপিঠ। মাগুরা উপ-নির্বাচনে বিএনপি সরকার যে কারচুপি করেছিল সে রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে হাসিনার সরকার এই উপ-নির্বাচনের শ্রাদ্ধ করে ছাড়ে। মাগুরারটা যদি ভোট চুরি, টাঙ্গাইলেরটা ভোট-ডাকাতি। তাও দিবালোকে।

আকরাম সাহেব সকালে ভগ্নদূতের মতো দুসংবাদ দেয়, ওরা বহু ভোটকেন্দ্র থেকে কাদেরের এজেন্টদের তাড়িয়ে দিয়ে পোলিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসারদের সহায়তায় দিনকে রাতে রূপান্তরিত করে দেয়। বিরাট ভোটাধিক্যে যেখানে সিদ্দিকীর বিজয়ের কথা সেখানে তাকে পরাজিত ঘোষণা করা হয়। সেখানকার ভোটাররা অবশ্য সে ফলাফল মেনে নেয়নি। এখন সে বিবাদ নির্বাচন কমিশন ও হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। কি দাঁড়াবে এখনও অনিশ্চিত।

আকরাম সাহেব খুবই হতাশ হয়েছে। সে বলে, স্যার, নির্বাচনী এলাকায় একজন মানুষও এ ধরনের ফলাফলের চিন্তা করেনি। মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে আওয়ামী সরকার এতবড় জাজ্জ্বল্যমান ডাকাতির প্রশ্রয় কি করে দিতে পারল ভেবে কূল পাই না।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, অপেক্ষা করুন। কথায় বলে বেশি বাড় বেড় না, ঝড়ে পরে যাবে। ধৈর্য ধরুন, অচিরেই দেখবেন আল্লাহ্‌র মার দুনিয়ার বার।

আকরাম সাহেবের পাশের কক্ষে বর্তমানে বাস করে আমাদের ম্যানেজার অবসরপ্রাপ্ত মেজর হালিম সাহেব। স্ত্রী হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এই

www.pathagar.com

মেজরকে দেখে তার বিচারক মন্তব্য করেছিল, একি প্রকারের আর্মি অফিসার! এ যে একজন মৌলবী।

বস্তুত পোশাক, দাঁড়ি ও পাগড়িতে তার এক বিশেষ পরিচয়ই বহন করে। সে আমাদের সেলের ধর্মীয় গুরুও বটে। ইমামতি করা, মিলাদ পড়ানো, শুক্রবার কয়েদিদের জুম্মার নামাজে বয়ান করা ছাড়াও প্রতিটি ধর্মীয় প্রশ্নে, কোরান কিতাবের যে কোন ব্যাখ্যা-বর্ণনায় আমরা তার সাহায্য নিয়ে থাকি। সে একজন পাস করা মাওলানার চাইতে কম পারদর্শী নয়। পবিত্র কোরানের অনেক সুরা-কালাম তার কণ্ঠস্থ। সঠিক উচ্চারণে বিশুদ্ধ স্বরে সে সুললিত কণ্ঠে সেসব তেলোয়াত করে থাকে। তাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। এ ধরনের ধর্মপ্রাণ মানুষ কি করে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা হল এবং কি করেই বা স্ত্রী হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত হল বোধগম্য হয় না।

আকরাম সাহেব নামাজ পড়ার জন্য একটা কারুকার্য করা মূল্যবান জায়নামাজ এনেছিল। কে একজন মন্তব্য করে, এ ধরনের জায়নামাজ ইমামের জন্য মানানসই।

আমি কিছু না-বুঝেই আকরাম সাহেবকে বলে বসি, আপনি অন্য একটি জায়নামাজ আনিয়ে নেবেন, এটি হালিম সাহেবকে হাদিয়া করুন।

একটি কথা উচ্চারণ না-করে আকরাম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে জায়নামাজটি হালিম সাহেবকে উপহার দেন। আমরা সকলে খুশি হয়ে তাকে এই দানের জন্য ধন্যবাদ জানালে সে আমাকে বলে, ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য। আপনি এটা তাকে দিয়েছেন। আপনি একটা কথা বললে তা রক্ষা না করে পারা যায়!

তার বদন্যতা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই।

এখন হালিম সাহেব সর্বদা সে মসল্লাতে নামাজ আদায় করে।

প্রতিদিন আছরের নামাজান্তে সে ফাজায়েলে আমল থেকে আমাদেরকে পড়ে শোনায় এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ধর্মের বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ ব্যাখ্যা করে। মূলত সে একজন তবলিগী। দ্বীনের দাওয়াতের কথা তার সমস্ত বক্তব্যে লক্ষ্যণীয়।

জেলখানায় এসে দু'ব্যক্তির কাছে আমি ঋণী। '৯২ সালে পনেরো সেলে অবস্থানের সময় চট্টগ্রামের হাফেজ সাহেব আমাকে প্রথম কোরান শরিফ পাঠে উদ্বুদ্ধ করেন। সত্যিকার অর্থে তার হাতেই জীবনে প্রথম কোরান পাঠ করতে শুরু করি। বাইরে গিয়েও কিছুদিন চর্চা ছিল। তারপর যথারীতি আলস্য আর অবহেলায় সবকিছু বিস্মৃত হয়ে যাই।

এবার জেলখানায় প্রবেশ করার পর আত্ম-উপলব্ধি ঘটে। অনেক সময় বৃথা নষ্ট করে ফেলেছি। আর বোধহয় বিনষ্ট করার মতো সময় হাতে নেই। সারা বছর নিয়মিত অধ্যয়ন না-করে পরীক্ষার পূর্বে রাত জেগে পড়ার

www.pathagar.com

অভ্যাস আমার পূর্বতন। তাও হয়ত ততটা সম্ভব হত না, যদি না-হালিম সাহেবের মতো একজন পুরোদস্তুর আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সার্বক্ষণিক সাহচর্য পেতাম। যখনই কোন অসুবিধা অনুভব করি সে এসে সাহায্য করে, পথ বাতলে দেয় এবং সবকিছু প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেয়। তার সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া কষ্টকর হত। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ করুণায় ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবারের মতো পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে সক্ষম হয়েছি। ধীরে ধীরে বাংলা অনুবাদ অনুধাবন করে পড়ার চেষ্টা করছি। পরম করুণাময়ের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এর পশ্চাতে হালিম সাহেবের উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেকটাই কাজ করেছে। কেবল আরবীই নয়, সামরিক কর্মকর্তাদের সহজাত ইংরেজি জ্ঞানেও তার যথেষ্ট বুৎপত্তি।

পূর্বেই বলেছি, আমরা ঠাট্টা করে তাকে আবু হোরায়রা বা বিড়ালের পিতা বলে ডাকি। একগাদা বিড়ালের প্রতি তার সযত্ন পরিচর্যা। ইদানীং অবশ্য আমাদের কারণে তার বিড়ালপ্রীতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কখনও দেখি কোন একটি বিড়ালকে ধরে শাসন করছে, গাছের একটি ডাল ভেঙে তাকে প্রহার করছে। বিড়ালটার ধারণা তাকে আদর করা হচ্ছে, আমাদেরও প্রায় একই অভিমত। তাকে সে কথা বলতেই সে হেসে ফেলে। ফালতুদের সহায়তায় বিড়ালগুলোকে অন্যত্র নির্বাসনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু পরদিনই তারা ছাব্বিশ সেলে তাদের অভিভাবকের কাছে ফিরে আসে। মাঝে বাবুর্চী রেজাউল ও ফালতু কুদ্দুসরা মিলে কয়েকটা মাদী বিড়ালকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে নিজেরাও ছাব্বিশ সেল থেকে বিতাড়িত হয়েছে। হালিম সাহেবই ওদের তাড়িয়ে দেয়। বিড়ালের প্রতি তার অপত্য স্নেহের আরও অনেক দৃষ্টান্ত এখানে বিদ্যমান।

তার ছোট ছোট তিনটি সন্তান রয়েছে। ইতিপূর্বে তারা দেখায় আসত। ইদানীং বোধহয় ঢাকায় নেই, আর আসে না। পূর্বে যখন আসত, হালিম সাহেব তার দৈনিকের ডিমটি না-খেয়ে জমা করে রাখত। দেখার দিন সন্তানদের জন্য সামান্য পুডিং তৈরি করে নিয়ে যেত। মাতৃহীন শিশুরা বন্দি পিতার স্নেহের পরশে আপ্লুত হত।

এমনি একজন হৃদয়বান, স্নেহ প্রবণ মানুষ কি করে স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। সে অবশ্য বলে, সামরিক বাহিনীর রসদ সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত থেকে দুর্নীতির প্রশ্রয় না-দেওয়ার কারণে কতিপয় সহকর্মীর কোপানলে পড়ে ঘটনাচক্রে তার এই দুরবস্থা। তার স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে সে জানায়। কিন্তু আত্মহত্যার ঘটনাকে হত্যায় রূপান্তরিত করে চাক্ষুষ সাক্ষ্য-সাবুদের বলে দায়রা আদালতে কি করে সাজা

www.pathagar.com

হয়ে গেল বুঝতে সক্ষম হই না। সে অবশ্য স্বীকার করে চাপের মুখে স্বীকারোক্তি দিয়ে পরে সেটা অস্বীকার করেছে। এর মধ্যে অবশ্য সিরাজউদ্দীন আহমেদ বলে ঢাকা কোর্টের একজন অ্যাডভোকেট কয়েকদিনের জন্য ছাব্বিশ সেলে মেহমান হয়ে এসেছিল। আমি তাকে স্মরণ করতে পারছিলাম না, কিন্তু সে এসে নিবেদন করে, আমার বিশেষ স্নেহভাজন অ্যাডভোকেট শহিদুল আলম সাইদের সঙ্গে সে আমার বাসায় কয়েকবার গিয়েছে। মুন্সীগঞ্জের সাঈদ আমার কেবল অতি কাছের কর্মীই নয়, সে আমার অনুজতুল্য। এক সময় সে আমার চেম্বার দেখত।

অ্যাডভোকেট সিরাজ উদ্দীন হালিম সাহেবকে জানে। তার মামলার সময় সে উপস্থিত ছিল। তার বক্তব্য, স্বাক্ষী-সাবুদে বিধিমতেই আদলতে প্রমাণিত হয়েছে যে, হালিম সাহেব তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।

সে নিজেও এক অভিনব মামলায় জেল খাটছে। জনৈকা মহিলা অ্যাডভোকেটকে ভালোবেসে সে বিবাহ করেছিল। সহধর্মিনী-সহকারীরূপে কাজ করত। তাদের একটি সন্তানও জন্ম গ্রহণ করে। একসময় প্রীতির ঘরে দুর্গতি প্রবেশ করে। দু'জনের প্রেমে ফাটল ধরে। ফলশ্রুতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ, তার ফলশ্রুতিতে ভরণ-পোষণের মামলা এবং তার ফলশ্রুতিতে কোর্টের ডিক্রী, যা আদায় করতে না-পারার দরুণ কারাগারে নিক্ষেপ।

স্ত্রীর অভিশপ্ত ভালোবাসার খেসারত দিতে গিয়ে সিরাজ সাহেবের এ দুঃখময় পরিণতি। তার মামলার বিষয় আমাদের দেশের বিচিত্র অপরাধ জগতের মাঝেও বেশ চমকপ্রদী। দেওয়ানী সাজা, এতদ্ব্যাতীত সে একজন আইনজীবী, অল্পদিনেই উচ্চতর আদালতে তা স্থগিত হয়ে সিরাজ সাহেবের মুক্তির পথ করে দেয়।

হালিম সাহেব এখন খুব ব্যস্ত মানুষ। ইমামতি, ম্যানেজারীর সঙ্গে সঙ্গে ছাব্বিশ সেলের কিচেন গার্ডেনের দায়িত্বও সে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছে। অনেক কাজের মাঝে সময় কিভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। একদিক থেকে ভালোই আছে।

হালিম সাহেব এখন আমার পাশের কক্ষে চলে এসেছে। চার নম্বরে সে ইতিপূর্বেও ছিল। তার ঘরে বৃষ্টির পানি প্রবেশে সে পুনরায় স্থানান্তরিত হল। এখানে এসেই চড়ই পাখির উপদ্রবে পড়ে যায়। সেদিন একটি ডাল যোগাড় করে চড়ইদের তাড়া করতেই নব্বই সেল থেকে বি-ক্লাসি এক ছেলে চিৎকার করে সতর্ক করে, হুজুর মারবেন না, আবার মার্ডার কেসে পড়ে যাবেন।

ওরাও জানে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে তার এই দণ্ডভোগ।

হঠাৎ করেই হালিম সাহেবকে ঢাকা জেল থেকে স্থানান্তর করা হয়।

www.pathagar.com

কোথায় নেয় জানি না। কেনই বা এ কার্যক্রম তাও হৃদয়ঙ্গম হয় না। হালিম সাহেব ইসলাম প্রিয় মানুষ। বর্তমান সরকারের কোপানলে পড়ে কোন আলেম-ওলামা কারাগারে আসলে হালিম সাহেব তাদের যথাসাধ্য সেবা করার চেষ্টা করে। ধর্মবিমুখ এই অসহিষ্ণু সরকার সে কারণেই তাকে এতদিন পর ঢাকা থেকে ট্রান্সফার করে কিনা বুঝতে পারি না। আমাদের ইমাম, ম্যানেজার ও গার্ডেনারের অভাব সকলেই অনুভব করি। কিন্তু কিছুই করার নেই।

জেলখানায় এবারই প্রথম এখানকার ফল-ফলাদি বেশ উপভোগ করলাম। ছাত্রাবস্থায় পুরনো বিশ সেলে থাকার সময় সামনের একটি গাছ থেকে আম পাড়িয়ে ফালতুকে বিপাকে ফেলে ছিলাম। কর্তৃপক্ষ আমাকে কিছু না-বলে গাছে ওঠার অপরাধে ফালতুকে শাস্তিস্বরূপ ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে নির্জন সেল নিক্ষেপ করে। অগত্যা সব আম ফেলে দিয়ে খাদ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলাম। এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ নমনীয় হয়ে ফালতুকে শাস্তিমুক্ত করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমগুলো অবশ্য আর গ্রহণ করতে স্বীকৃত হইনি।

এবার ছাব্বিশ সেলে বেশ কয়েকদিন এখানকার ফল-ফলাদি খেলাম। কয়েকটা গাছের কাঁঠাল সবটাই আমাদের ভোগে লাগে। শুধু তা-ই নয়, একরকম নতুন ফলও এবার খেলাম। অনেকটা কাঁঠালেরই মতো। রবার্ট, ওরফে মোহাম্মদ আলী জানায়, সোয়ানসপ নামীয় এই ফল তাদের দেশ নাইজেরিয়াতে প্রচুর পাওয়া যায়। থ্যাইল্যাণ্ডেও এ ধরনের ফল দেখতে পেয়েছি। ছাব্বিশ সেলে কি করে এ গাছ জন্ম নিল সেটা এক রহস্য। নাইজেরিয়ার একজন মানুষ এখানে অবস্থান করার কারণেই হয়ত সে দেশের ফল এখানে জন্মেছে। খেতে বেশ সুস্বাদু। ম্যানেজার হালিম সাহেব সুষ্ঠভাবে এই ফল, কাঁঠাল এবং পেয়ারা আমাদের ঘরে ঘরে বিতরণের ব্যবস্থা করে। আকরাম সাহেব ও মোহাম্মদ আলী এসব কাজে সর্বদা অগ্রণী। বস্তুত আকরাম সাহেবের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং মোহাম্মদ আলীর তৎপরতায় বারো ভূতের মাঝেও ফলগুলো আমাদের ভোগে লাগে। মোহাম্মদ আলী আম পাড়ার জন্য জোড়াতালি দিয়ে কোটা বানিয়ে নিয়েছে।

ছাব্বিশ সেলের প্রাঙ্গণে একটি কাঁঠালী চাপা গাছ রয়েছে। এর ফুলগুলো অনেকটা পাতা সদৃশ। কাঁঠালের গন্ধের সঙ্গে কিছুটা ঝাঁজ মিশ্রিত হয়ে এক প্রকারের তীব্রতা সমৃদ্ধ এই ফুলগুলো সুযোগ পেলেই প্রহরারত কারা-রক্ষীরা খুঁজে-পেতে পেড়ে নেয়। হালিম সাহেব এবং মোহাম্মদ আলী যখনই একটি ফুল আহরণ করতে সক্ষম হয়, সেটি সযত্নে এনে আমাকে উপহার দিয়ে থাকে। ফুলের গন্ধটা খুব একটা

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য না-হলেও হৃদয়ের যে উষ্ণতা নিয়ে তারা সেটা প্রদান করে তাকে মূল্যায়ন না-করে পারি না।

সেলের সর্ব পশ্চিমের কক্ষে বসবাসরত নও-মুসলিম মোহাম্মদ আলীকে বলি, তুমি যেখানটায় থাকছ ওখানে বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিন অবস্থান করে গেছেন।

সে বলে, আমি শুনেছি। সে অর্থে আমি গৌরবান্বিত।

নাইজেরিয়াবাসী এই যুবকের আদি নাম এন্থনি মার্টিন ওকাফোর। ডাক নাম রবার্ট ব্লাঙ্কসন। জন্মগতভাবে সে একজন ক্যাথলিক খৃস্টান। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে '৯৭ সালের শেষভাগে জেলখানার আর এক বন্দি অবসরপ্রাপ্ত লে. কর্নেল মোস্তফার সংস্পর্শে এসে সে ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়।

চট্টগ্রামের ডি.জি.এফ.আই এর অন্যতম সাবেক কর্মকর্তা লে. কর্নেল মোস্তফা তখন ইসলামী উম্মাহ কর্পোরেশন সম্পর্কিত মামলায় কারাগারে আবদ্ধ। মোস্তফা সাহেব ছিল একজন শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তার সাহচর্যে রবার্ট ধীরে ধীরে মানসিকভাবে ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে এবং শেষ অবধি ধর্মান্তরিত হয়। লে. কর্নেল মোস্তফা একটা কাজের মতো কাজ করেছে।

রবার্টের ব্যক্তিগত ইচ্ছা তার নাম হোক মুবিন। কিন্তু জেলখানায় কি করে যেন ইতিমধ্যেই সে মোহাম্মদ আলী নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। দু'জন মহান ব্যক্তির নামের সঙ্গে যুক্ত এই নামটি সে আর পরিবর্তন করে না। আশা আছে, মুক্তি পাবার পর কোর্টে এফিডেভিট করে কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে নিজের নাম মুবিন রাখবে। আমরা তাকে কখনও রবার্ট, কখনও মোহাম্মদ আলী বলে সম্বোধন করি। ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো প্রদর্শন করে একটি আকর্ণবিস্তৃত হাসি উপহার দিয়ে সে খুশি মনে সাড়া দেয়।

এমন মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। সেই সুদূর আফ্রিকা মহাদেশের নাইজেরিয়া দেশের সাবেক রাজধানী লাগোসের একজন শিক্ষিত যুবক আজ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে বিগত দশ বছর ধরে কারা-নির্যাতন ভোগ করছে।

'৯২ সালে আমেরিকান তরুণী মিস এলিয়েদা ম্যাকর্ড ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার হয় হিরোইন জাতীয় মাদক দ্রব্য শরীরের সঙ্গে বহন করার অপরাধে। রবার্টের বক্তব্য, পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে বাংলাদেশ ভ্রমণে আগত রবার্ট তার সাথে সোনারগাঁও হোটেলে সৌজন্য সাক্ষাৎকারে মিলিত হলে এ বিপাকে জড়িয়ে যায়। বাঁচার জন্য মিস এলিয়েদা রবার্টের নাম করে। বলে, সে তাকে মাদক প্রদান করেছে। পরে অবশ্য সে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে। কিন্তু ইতিমধ্যে যা ঘটার ঘটে যায়।

www.pathagar.com

রবার্ট গ্রেপ্তার হয়ে দশচক্রে ভগবান ভূত কথাটি সপ্রমাণ করে মিস এলিয়েদার সঙ্গে তিরিশ বছরের সাজা লাভ করে।

রবার্ট কতটা দায়ী, আদৌ সে জড়িত কিনা বা মার্কিন তরুণী ও তার সহযোগীদের সঙ্গে তার কতটা সম্পর্ক জানার কোন উপায় নেই। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মাদক পাচারের সে মামলায় মূল অভিযুক্তা হচ্ছে সেই আমেরিকান যুবতী। পশ্চাতে কোন আন্তর্জাতিক চক্র অদৃশ্য থেকে চাবি-কাঠি ঘুরাচ্ছে কিনা তাও জানার আজ আর উপায় নেই। অপরাধ করে খুব কম লোকই তা স্বীকার করে।

মিস এলিয়েদা মার্কিন নাগরিক। তার দেশের সরকারের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার ফলে সে ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়ে স্বদেশে চলে গেছে। কিন্তু একদা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের অধিবাসী কালো চামড়ার রবার্ট আজও জেলের ঘানি টানছে। তার পক্ষে সেভাবে দাঁড়াবার কেউ নেই।

তার ব্যারিস্টার কথা দিয়েছে হাইকোর্টে অচিরেই তার মামলার সুরাহা হয়ে যাবে এবং ফলাফল তার অনুকূলে আসার সম্ভাবনা প্রবল। রবার্ট অবশ্য আশঙ্কা করে যে, ক্ষমতাধর আন্তর্জাতিক চক্রের সঙ্গে মার্কিন তরুণী জড়িত ছিল তারা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে রাখার স্বার্থে এখানেও কল-কাঠি নাড়তে পারে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি রবার্ট যেন শীঘ্র মুক্তি পেয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে।

লাগোস বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পাস এই যুবক সঙ্গীতের বহুধা প্রতিভা নিয়ে জন্মেছে। গান রচনা, সুর দেওয়া, কণ্ঠ দেওয়া সর্বত্রই তার প্রতিভার বিকাশ। লাগোসের একটি প্রখ্যাত ব্যাণ্ডের সে সদস্য ছিল। ইতিমধ্যে আমেরিকার একটি গানের কোম্পানী তাদের লাগোস শাখার মাধ্যমে রবার্টের একটি এলপি প্রকাশ করেছে। এই এলপির একটি কপি ঢাকা জেলের কার্যালয়েও সংরক্ষিত আছে। জেলখানায় বসেও সে দশটি এলপি রচনা করেছে। মুক্তি পেলে সেগুলো প্রকাশ করবে। সে একজন যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞও বটে। লেখালেখিতেও তার হাত রয়েছে। একজন ঔপন্যাসিক হিসাবে কারাগারে বসেও সে অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছে। আমার পরামর্শ নিয়ে সে একটি উপন্যাসের নামকরণ করে। সুদিন এলে সে এসবের প্রকাশনার আশা রাখে। সাতটি উপন্যাসসহ ইতিমধ্যে সে প্রায় দশটি পুস্তকের রচনা সম্পন্ন করেছে। দেশে খেলাধুলার সঙ্গে জড়িত ছিল। ফুটবল তার প্রিয় খেলা। গোলরক্ষক হিসাবে তার সুনাম ছিল।

নাইজেরিয়ার পূর্বতন রাজধানী লাগোসে তার বাস। চার ভাই ও এক বোনের সংসারে সেদিনও পিতা-মাতা উভয়েই জীবিত ছিল। সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবার পর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মায়ের অতি অনুগত সন্তান রবার্ট সেকথা বলতে বলতে তার চোখ দুটি অশ্রু সজল হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

জয়েস বাবারা নামে একটি মেয়েকে সে ভালোবাসত। অনেক দিনের প্রেম। মেয়েটি তার জন্য অপেক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে রেখে সে মেয়েটির জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়নি। বারবার পত্র লিখে তাকে অন্যত্র বিয়ে করে সংসারী হবার পরামর্শ দিয়েছে। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে তার উপদেশ গ্রহণ করেছে। সে এখন বিবাহিতা এবং সন্তানের জননী।

নাইজেরিয়া সম্বন্ধে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা খুব সামান্য, কিন্তু তিক্ত। রাশিয়ার পথে বিমানের গোলমালে '৭২ সালে আমি ও কুষ্টিয়ার ডা. আসহাবুল হক হেবা একবার এক সপ্তাহ আটকা পড়েছিলাম লাগোস বিমানবন্দরে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত নাইজেরিয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেই সেখানকার সামগ্রিক শাসনব্যবস্থার রূপ কিছুটা উপলব্ধিতে এসেছিল। এয়ারপোর্ট একটা দেশের দরজা। সেটা অবলোকন করেই অভ্যন্তরের অবস্থা জ্ঞাত হওয়া যায়। এয়ারপোর্ট হোটেলের গেটে দেহপসারিণীদের যে দৌরাত্ম দেখেছিলাম তা অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি। একটি সুদেহী যুবতী এসে প্রাঞ্জল ইংরেজিতে সরাসরি প্রস্তাব দেয়, এই হোটেলে তুমি যে ডলার দিচ্ছ তার অর্ধেকে আমি তোমাকে সুন্দর ঘর, বিছানা, খাবার এবং আমাকে দেব।

শুধু তা-ই নয়, লোকজনের আনাগোনা উপেক্ষা করে সে অনায়াসে শারীরিকভাবে উত্তেজিত করার প্রয়াসে অশোভনভাবে আপত্তিকর অঙ্গে হাত বুলাতে চেষ্টা করে।

রবার্টকে সে অভিজ্ঞতার কথা বললে সে বলে, এখন অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সেসময় সামাজিক অবক্ষয় অতি নিম্নস্তরে ছিল বৈকি!

পত্রিকায় দেখলাম সম্প্রীতি সাবেক জেনারেল ওলসেগুন ওবাসাঞ্জো সে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। রবার্ট এই জেনারেল সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করে। দেশে প্রত্যাবর্তন করলে হয়ত সে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করবে। আইন ব্যবসায় ও রাজনীতিতে। প্রেসিডেন্টের দলেই তার যোগদানের সম্ভাবনা।

জেলখানায় রবার্ট বা মোহাম্মদ আলী এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। তার মতো নিষ্ঠাবান, স্পষ্টভাষী মানুষ সহজে দেখা যায় না। আফ্রিকার মানুষ হিসাবে তার গাত্রবর্ণও কালো, কিন্তু এই কালো রঙয়ের চামড়ার আড়ালে তার যে একটি শুভ্র মন রয়েছে সেটি অনবদ্য। সুগঠিত দেহের অধিকারী রবার্টের মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। মুসলমান হবার পর সালাম জানানোর দিব্যি একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে। দিনের মধ্যে যতবারই দেখা হোক, একটা প্রসন্ন হাসি দিয়ে অবশ্যই সে বলবে, আচ্ছালামু আলাইকুম।

তাকে বলি, দিনের প্রথম সাক্ষাতে একবার দিলেই চলবে।

www.pathagar.com

কিন্তু সালাম বিনিময় তার রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে কর্তব্য সচেতন ও অত্যন্ত নিয়মানুগ এই বিদেশী যুবককে আমরা সাতিশয় পছন্দ করলেও জমাদার, মিয়াসাব বা কয়েদি ও ফালতুদের কেউ কেউ তাকে তেমন পছন্দ করে না। সেও বিদেশী কিন্তু অতি কৃষ্ণ বর্ণের বিদেশী। আমাদের দেশের মানুষেরা বিদেশী বলতে অজ্ঞান। কিন্তু তাদের গায়ের রঙ শ্বেত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাদা চামড়ার দুই শত বছরের শাসনের প্রভাবমুক্ত হতে কতশত বছরের প্রয়োজন হবে জানি না। কেউ কেউ অভিযোগ করে রবার্ট ডায়েট বিক্রী করে প্রতি সপ্তাহে কয়েকশত টাকা পেয়ে থাকে। সত্য-মিথ্যা জানি না। নিরামিশাষী রবার্ট যদি তা করেও তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। সুদূর বাংলাদেশের জেলের অভ্যন্তরে তাকে দেখার কেউ নেই। কোনদিন ইন্টারভিউ হয় না। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ততটা নিন্দনীয় নয়। নিজের প্রাপ্যতা ও অধিকার সম্বন্ধে সে অতি সচেতন। তাকে কোনভাবে ঠকানো সম্ভব নয়।

কালো শব্দটির উপর তার সাংঘাতিক বিমুখতা রয়েছে। সেদিন বয়ানের সময় হালিম সাহেব 'যাদের অন্তরে কালো আছে' বললে পরে সে তার সঙ্গে দারুণ বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। কালো বলা হল কেন? এটা একটা হীনম্মন্যতারই নামান্তর।

তাকে শান্ত করতে হালিম সাহেবকে বেশ বেগ পেতে হয়।

সেদিন আকরাম সাহেবের হাসপাতাল যাওয়ার কারণে কে আজান দেবে একথায় ওবায়েদ বলে ওঠে, কাউলাকে ডাকলেই হয়।

সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলি, আর কখনও ভুলেও একথা মুখে উচ্চারণ করো না। এ শব্দটিতে তার প্রচণ্ড এলার্জি। সে সাতিশয় ক্ষুণ্ন হবে।

ওবায়েদ বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে ওঠে।

সুন্দরকে সুন্দর বললে সে অধিকতর সন্তুষ্টি লাভ করে কিন্তু অসুন্দরকে অসুন্দর বলে ডাকলে তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের মানুষ আমরাও কালো। আফ্রিকার মানুষদের চাইতে সামান্য কম। শ্যামলা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। সে দুর্বলতার কারণেই বোধহয় কালোর প্রতি অনীহা আমাদের প্রবল। ফরসা রঙ দেখে সৌন্দর্যের বিচার করি। দেহের সৌন্দর্যের চাইতে মনের সৌন্দর্য যে অধিকতর আকর্ষণীয়, সেটা সহজে উপলব্ধি করি না।

রবার্ট বিদেশী নাগরিক হিসাবে বিশেষ ডায়েট পেয়ে থাকে। কিন্তু সে স্বপাকে খায়। মাছ, মাংস বা ডিম স্পর্শ করে না। সে একজন পরিপূর্ণ নিরামিশাষী। শুধু তা-ই নয়, চা, কফি বা কোন প্রকারের ধূমপানও করে না।

www.pathagar.com

তার কোনই বদ্ অভ্যাস নেই। চা কফির পরিবর্তে সে গরম পানি পান করে, কখনও কোষ্ঠ কাঠিন্যে ভোগে না।

শরীরে বেশ শক্তি রাখে সে। কেবল শাক-সবজি ও ডাল-ভাত খেয়ে কি করে যে এত সুন্দর স্বাস্থ্য রক্ষা করছে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

আমাদের দেখায় ফল-মূল, মিষ্টি ইত্যাদি এলে আমরা সকলকে নিয়েই সেসব খেয়ে থাকি। রবার্টও তার অংশ পায়। সে তার রান্না করা সবজি প্রতিদিন কিছুটা আমাদেরকে ভাগ দেয়।

আমরা যতই বুঝাই সে আকরাম সাহেবকে বলেছে, আমি তাদের এত কিছু খাচ্ছি, তারা যদি আমার সামান্য ভেজিটেবল গ্রহণ না-করে তা হলে আমি আর তাদের দেওয়া খাবার নেব না। তার আত্মমর্যাদার কথা চিন্তা করে আমরা আর উচ্চবাচ্য করি না। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ইসলাম ধর্ম কেন গ্রহণ করলে?

সে বলে, কর্নেল সাহেবের কাছে এই ধর্মের বিভিন্ন দিক অবগত হয়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়ে উঠি। পবিত্র কোরানের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে আমার বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়। ক্রমশ আমার মানসিক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আমি স্বেচ্ছায় মুসলমান হই। আপনি তো দেখছেন ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে আমার কোন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়নি। বিশ্বাসের প্রশ্নটাই বড়।

ইসলাম ধর্মের কোন্ দিকটি তোমার সব চাইতে ভালো লাগে?

সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ও নবীজীর প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের ঘোষণা সম্বলিত আজান খুব ভালো লাগে। ধর্মের জন্য আস, কল্যাণের জন্য আস, নিদ্রা হতে নামাজ উত্তম এইসব মঙ্গলময় আহ্বান খুব ভালো লাগে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, গোছল করা, দিনে অন্তত পাঁচ বার প্রক্ষালন তথা অজু করা, নামাজে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনও খুবই স্বাস্থ্য সম্মত। ধর্মের মূল আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলামের প্রতিটি নির্দেশনা বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবন বিধান বলে আমার মনে হয়।

তাকে জিজ্ঞেস করি বাংলাদেশে প্রায় দশ বছর আছ, যদিও কারারুদ্ধ, তবুও অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে। এই দেশের কোন রাজনৈতিক নেতাকে তোমার সবচাইতে ভালো লাগে?

সে সামান্য হেসে বলে, একজন নয়, দু'জনের আমি ভক্ত। একজনকে না-দেখেই ভালো লাগে, তিনি বেগম খালেদা জিয়া।

খুবই বিস্মিত হই। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু কিছু বলার নেই। এটা তার ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রশ্ন। দোষও দেওয়া যায় না। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। বলি, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে?

সে বলে, স্যার! আপনি।

www.pathagar.com

বল কি? বাইরে আমার সমালোচনার অন্ত নেই! তুমি আমার মধ্যে কী দেখলে?

স্যার, এই জেলখানায় আমি অনেক রাজনীতিবীদদের দেখা পেয়েছি। তাদের মধ্যে আপনি সর্বোচ্চ পদে ছিলেন, দেশের উপ-প্রধানমন্ত্রী। বাইরে লোকে আপনাকে কি বলে বা কিভাবে জানে সেটা আমার বিচার্য নয়। আমি এখানে আপনাকে দেখছি কোন অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ না করতে, সবচাইতে কম কথা বলতে, স্বল্প আহার করতে এবং সর্বদা ধর্মীয় কাজ ও লেখাপড়ায় আত্মস্থ থাকতে। লোকে বলে, আপনি একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বক্তা। আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি বা কাগজে পড়েছি, বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার খুবই ভালো লেগেছে। তাই আমি আপনার গুণগ্রাহী।

এসব কথার উত্তর নেই। প্রশংসা শুনতে সকলেরই ভালো লাগে। এই বিদেশী মানুষটির আন্তরিক মূল্যায়ন আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

তাকে জিজ্ঞেস করি, এখানে কাদের দেখা পেয়েছ?

সে জানায়, আপনার দেখা পেয়েছি। আরও যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তারা হলেন জনাব নাজিউর রহমান মঞ্জু, ডা. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, খালেদুর রহমান টিটো, কে.এম. ওবায়দুর রহমান, ইকবাল হোসেন চৌধুরী, আবদুস সাত্তার, আবদুল মান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান, গয়েশ্বর রায়, নুরুল ইসলাম মঞ্জুর, মীর্জা আব্বাস, এ.বি.এম মহিউদ্দীন চৌধুরী, মোসলেম আলী খান, ফরহাদ মাজহার, জামাল হোসেন, আক্তারুজ্জামান বাবুল, আওরঙ্গ, গোলাম ফারুক অভি প্রভৃতি রাজনৈতিক অঙ্গনের ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। এঁরা অনেকেই মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী অথবা এমপি ছিলেন। সেনাবাহিনীর জেনারেল লতিফ, কর্নেল শামসুর রহমান,, কর্নেল মুনির চৌধুরী, লে. কর্নেল এস.এম. মোস্তফা, লে. কর্নেল কামাল, মেজর সিকান্দার, মেজর কাজী এমদাদ, মেজর ওয়াহিদুল, মেজর হালিম প্রমুখ উল্লেখ্য। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে সহকারি পুলিশ কমিশনার আকরাম হোসেন ও ইন্সপেক্টর আমিনুল ইসলাম।

আমাদের নামাজের জন্য আজান দেওয়ার দায়িত্বে রয়েছে এসি আকরাম সাহেব। আকামত দেওয়াও তার কাজ। সে কোর্টে গেলে, হাসপাতালে বা দেখায় গেলে মোহাম্মদ আলী তার দায়িত্ব পালন করে। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সে আজান দিয়ে থাকে। তার কণ্ঠের স্বতন্ত্র মূর্ছনায় এক শ্রুতিমধুর ধ্বনি সূচিত হয়।

আমাদের ভালো লাগে।

আশ্চর্য মানুষ এই রবার্ট। দশ বছর হল জেলখানায় সে রয়েছে। কোন দেখা নেই, কোন খোঁজখবরও নেই। তাদের দেশের সরকার থেকে এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর তার

www.pathagar.com

আস্থার অভাব। সে বলে, স্যার, আপনারা সরকারে ছিলেন, এদিকটা পর্যালোচনা করে দেখেননি কেন? কত সামান্য কারণে কত মানুষ বিচার-বিভ্রাটে জীবনের মূল্যবান সময় জেলখানায় অতিবাহিত করছে। বিচারাধীন অবস্থায় অহেতুক দীর্ঘ সূত্রিতা অবলম্বন করা হয়। মানুষ নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ন্যায়বিচারের জন্য অর্থ ব্যয়ের সঙ্গতি থাকে না।

তার কথা উপলব্ধি করি। নিজেরাও ভুক্তভোগী। তাকে বুঝাবার চেষ্টা করি। অনেক কথা বলতে হয়। কিন্তু বলে লাভ কী! সে তো অযৌক্তিক কোন কথা বলেনি!

আমাকে লেখালেখি করতে দেখে একদিন হাসিমুখে এগিয়ে এসে একটি বলপেন ও অতিরিক্ত একটি শিশ উপহার দেয়।

বলি, আমার কাছে রয়েছে, দেবার প্রয়োজন নেই।

সে বলে, স্যার, আপনাকে লিখতে দেখে ভালো লাগছে। কেউ এসব করে না। আমার এই ভালোলাগাটিকে স্মরণীয় করার জন্য এই সামান্য উপহার। গ্রহণ না-করলে ব্যথিত হব।

সানন্দে তার উপহার গ্রহণ করি। উপহারটির মূল্যের প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে তার যে হৃদয়াবেগ জড়িত তাকে মর্যাদা না-করে পারি না।

আমাদের মধ্যে যখন ফল-ফলাদি বা অন্য খাবার বিনিময় হয় অধিকাংশ সময়ই আমরা তা নীরবে গ্রহণ করি। কিন্তু একটি উৎকৃষ্ট বস্তু যদি তার কাছে পৌঁছে সে ছুটে এসে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আমি অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকে বাইরের খাবার বন্ধ করেছি। শুধুমাত্র জেল ডায়েটে জীবন ধারণের চেষ্টা করছি।

আমার বাসায় গোটা কয়েক কাঁঠাল গাছ রয়েছে। তার একটির ফল অতিশয় উত্তম, বড় বড় কোয়া এবং অতি সুস্বাদু। দেখায় সালেহা গোটা দুই কাঁঠাল নিয়ে এসেছিল। তা খেয়ে রবার্টের কি আনন্দ!

স্যার, এত বড় কাঁঠাল জীবনে খাইনি। যেমন সাইজ তেমন স্বাদ। দুটি কোয়ার বেশি খাওয়া যায় না, এত বড়!

তার অন্তর নিঃসৃত আনন্দের প্রকাশ দেখে মন ভরে ওঠে। সেদিন তাকে পেঁপে পাঠাতে তা খেয়ে দৌড়ে আসে, স্যার, আপনার বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস অতি উপাদেয়। গত দশ বছরে এত মিষ্টি পেঁপে খাইনি।

বলি, মি. রবার্ট, ভাগ্যকে প্রশংসা কর। পেঁপে আমার বাড়ির নয়, আমার স্ত্রী কিনে এনেছে।

তারপরও তার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

এ ক'বছরে সে ভালো বাংলা রপ্ত করেছে। লিখতে-পড়তে পারে না-কিন্তু অনায়াসে কাজ চালাবার মতো কথা বলতে পারে। কথ্য ও সাধু ভাষার মিশ্রণে

www.pathagar.com

কখনও তার বক্তব্যে কিছুটা তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভাষার সুললিত লয়টি নয়, আমরা মানুষটির অন্তরকে মূল্যায়নের প্রয়াস পাই।

একটি স্বচ্ছ-মন অনায়াসেই আর একটি মনকে প্রভাবিত করতে পারে। রবার্টের মোহাম্মদ আলীতে রূপান্তরে যেমন আনন্দিত হয়েছি, তার সহজ-সরল মনের অকৃত্রিম সব অভিব্যক্তিতেও উজ্জীবিত হই।

একে-একে আরও তিন জন অভিযুক্ত ডিভিশনপ্রাপ্ত হয়ে ছাব্বিশ সেলে আসে। তাদের মধ্যে ঢাকা টিকাটুলির আবুল কালাম আজাদ স্বল্পদিনের মধ্যেই জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়। স্থানীয় একটি হত্যা মামলায় তাকে জড়িত করা হয়েছে। তার বক্তব্যমতে হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হবার পর সে-ই নিহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে প্রেরণ করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি গ্রহণে তৎপর হয়। অভিযোগও তারই উদ্যোগে দায়ের করা হয়। আজাদ একসময় খুব সংহতির সদস্য ছিল। আবু হোসেন বাবলার সহকর্মীরূপে সে আমাদের দলের একজন সক্রিয় কর্মী ছিল। সে বলে, স্যার, বহুবার আপনার সান্নিধ্যে আসার সুযোগ হয়েছে। আমাকে তুমি করে ডাকবেন।

সে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করে। বিদায়ের দিনও তা-ই করে। সদালাপী দীর্ঘ দেহের অধিকারী আবুল কালাম আজাদ এখন বিএনপি'র মহানগরীর সভাপতি সাদেক হোসেন খোকার সঙ্গে কাজ করছে। আগামী নির্বাচনে একজন কমিশনার হওয়ার প্রত্যাশী। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বাচনের প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে রাখার মানসে শত্রুতামূলকভাবে তাকে মামলায় জড়ানো হয়েছে বলে জানায়। কয়েক দিনের মধ্যেই তার মুক্তির নির্দেশ এসে যায়। মামলার বাদী নিজেই কোর্টে গিয়ে এ্যাফিডেবিট করে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে।

আজাদের মুক্তির পর যে লোকটির ছাব্বিশ সেলে আগমন ঘটে, সে নিজেকে কখনও সাইন্টিস্ট, কখনও জুয়োলজিস্ট বা কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার বলে পরিচয় দেয়। বস্তুত কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। নাম নূরুজ্জামান। এখানে তার নাম পড়েছে মদন। কার্যকারণ সহজেই অনুমেয়। পরিবেশ ভুলে সর্বক্ষণ হেঁড়ে-গলায় চিৎকার-চেঁচামেচি করায় অভ্যস্ত এই লোকটির সঙ্গে প্রথম

www.pathagar.com

আলাপেই বিব্রত বোধ করি। সে বলে, তার পৈতৃক বাড়ি নাকি বিক্রমপুরের শেখর নগরে, ঢাকাতেই স্থায়ী বসবাস। দেশের বাড়ির কথা শুনে অধিকতর বিড়ম্বনায় পড়ি। তার আচার-আচরণ স্বাভাবিক মনে হয় না। জোরে কথা বলাই নয়, যখন তখন যার তার ঘরে বিনা-অনুমতিতে প্রবেশ করা, চা ইত্যাদি খেতে চাওয়া, জোরে জোরে অন্যের অসুবিধা সৃষ্টি করে কোরান তেলাওয়াত করা বা অন্য কিছু আমল করা তার নিকট খুবই স্বাভাবিক। অন্যদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। কয়েকবার সাবধান করার পরও তার বোধোদয় হয় না। ফালতু, মিয়াসাব, ডাক্তার ও জেল কর্তৃপক্ষ সকলেই অতিষ্ঠ। তাদের অভিমত, মদনের উপরের ভাগের কয়েকটি বস্তু হারিয়ে গেছে, ঢিলা থাকলে টাইট করা যেত কিন্তু এক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়।

রুম পরিবর্তন করে সে আমার পাশের কক্ষে আসার ফলে আমার অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু কি করা যাবে! বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে সহ-অবস্থানই জেল জীবন! তার জেলে আগমনের হেতু কি তাও সঠিকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ নেই। হরবর করে বলার মাঝে যেটুকু বুঝা গেল, লেন-দেন ঘটিত কি এক ব্যাপারে সে বোধহয় কাউকে হত্যার চেষ্টা করেছে। বারবার রিভলবারের কথা বয়ান করছিল। তার কথা না-শুনে যেমন পারা যায় না, তেমনি সেসব সহজে বোধে আসারও উপায় নেই। আমরা সকলেই প্রার্থনা করি, সে যেন শীঘ্র মুক্তি পায়।

ইদানীং ছাব্বিশ সেলে আর একজন পুলিশ কর্মকর্তার আগমন ঘটেছে। তাকে নিয়ে তিন জন হল। ইন্সপেক্টর জিয়াউল হাসান ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চে কর্মরত ছিল। কিছুদিন পূর্বে সংবাদ পত্রে আমরা একটি খবর দেখে আশ্চার্য বোধ করেছিলাম। পুলিশের একজন সোর্সকে হত্যা করে মৃতদেহ ওরা ডিবি অফিসের ছাদে পানির ট্যাংকে লুকিয়ে রাখে বলে প্রকাশ। সে মামলাতেই জিয়াকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে। সে অবশ্য ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে। বিভাগীয় প্রতিহিংসার শিকার হয়ে তার এই হাজতবাস বলে সে জানায়। পুলিশ অফিসারসুলভ সুগঠিত দেহের অধিকারী ইন্সপেক্টর জিয়া অমায়িক ব্যবহারে সকলের মন জয় করে। এই মামলায় সে এর পূর্বেও জেল খেটে গেছে। মাঝে জামিন হয়েছিল। জামিন কেটে দেওয়ার ফলে এবার তার দ্বিতীয় দফা আগমন। সে বিনীতি কণ্ঠে অনুরোধ করে, স্যার, আমাকে তুমি বলে ডাকবেন। আমি আপনার অফিস ও বাসায় বহুবার গিয়েছি।

আমি স্মরণ করতে ব্যর্থ হলে সে মনে করিয়ে দেয়, পুলিশের

www.pathagar.com

স্পেশাল স্কোয়াডের সার্জেন্ট কিবরিয়ার সঙ্গে আমি ছিলাম। তার সঙ্গেই আপনার ওখানে গিয়েছি।

মনে পড়ে, সার্জেন্ট কিবরিয়া এক সময় আমার সুপরিচিত একজন অফিসার ছিল। আমাদের অঞ্চলে চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ড ব্যাপকতা লাভ করলে সেসব দমনের জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তাতে তারাও কখনও সক্রিয় অংশ নেয়। সার্জেন্ট কিবরিয়ার ছিল একজন দক্ষ সাহসী ব্যক্তি। কিবরিয়াকে নিয়ে পুলিশের লোকেরা গর্ব করত। দুঃখের বিষয় সে আর ইহজগতে নেই। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় অসময়ে সে মৃত্যুবরণ করে। জিয়ার মুখে কিবরিয়ার আলোচনা শুনে সেসব দিনের স্মৃতি আর একবার মনের পটে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

জিয়াউল হাসানের পূর্বে এখানে আরও একজনের আগমন ঘটে। বঙ্গভবনের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা উত্তোলন এবং বিতরণকারী কর্মকর্তা জনাব মান্নান সিদ্দিকী চল্লিশ লাখ টাকা আত্মসাতের একটি অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হয়ে এখানে আগমন। এমন শান্ত প্রকৃতির ও নির্বিরোধী লোক সহজে দেখা যায় না। একসময় সে প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের অতিশয় প্রিয়ভাজন ছিল। তাঁকে ছাড়া সে কিছুই বুঝত না। আজ ভাগ্যের ফেঁর সে অভিযুক্ত হওয়ার পর বিচারপতির বিচারও পাল্টে গিয়েছে। আরও কতিপয় অভিযোগ আনয়ন করে তার বিরুদ্ধে গোটা কয়েক মামলা ঠুকে দেয়া হয়েছে। স্বর্গ হতে বিদায় হয়ে সিদ্দিকী সাহেবের দুঃখের অন্ত নেই। সে বলে, প্রেসিডেন্ট সাহেব একসময় আমার উপর এতটা নির্ভর করতেন যে, অন্য কর্মকর্তারা হিংসা করত। আজ দুঃখের দিনে তিনি যে এভাবে মুখ ফিরিয়ে নেবেন ভাবা যায় না। আমাকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করার পর আশা করেছিলাম তিনি অন্তত আমার অসহায় পরিবারের তত্ত্ব-তালাশ করবেন। কিন্তু দেখা গেল উল্টো। সব সুবিধাদি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গভবনের কোয়ার্টারের ফোনটি পর্যন্ত কেটে দেওয়া হয়েছে। অসুস্থ শিশু সন্তানকে নিয়ে বিপদগ্রস্থ আমার অসহায় স্ত্রীকে মুখে সমবেদনা জানাবারও কেউ নেই।

বলতে বলতে মান্নান সিদ্দিকীর দু'চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। আমরা নীরবে তাকিয়ে থাকি, সমবেদনা জ্ঞাপনের ভাষা খুঁজে পাই না।

ছাব্বিশ সেল এবার পূর্ণ হয়েছে। হাউস ফুল। বারোটি ঘরেই লোক রয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত কক্ষগুলোও ঝাড়া-মোছা করে বাসযোগ্য করা হয়েছে। সেলে স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। নতুন বিশ সেল থেকে আমাদের মামলার দু'জন আসামী তাহের উদ্দীন ঠাকুর ও মেজর (অবঃ) খায়রুজ্জামানকে কিছুদিন পূর্বে ছাব্বিশ সেলে আনা হয়েছে। বোধগম্য কারণেই ঠাকুরের খুব

www.pathagar.com

বেশি আগ্রহ ছিল না। কিন্তু খায়রুজ্জামান সাহেবের বারংবার অনুরোধে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এখানে প্রেরণ করে।

পূর্বেই বলেছি, ঠাকুরের সাথে আমাদের কোনদিনই সহজ হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল না। প্রথম ছাত্রলীগ, পরে ছাত্রইউনিয়ন হয়ে বামপন্থী রাজনীতির ধারক হওয়ার ফলে আমাদের সাথে তার সুসম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সাংবাদিকতার পেশার সুযোগে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে নিজের আখের সে গুছিয়ে নেয়। 'ইত্তেফাকে'র প্রতিনিধি হিসাবে শেখ সাহেবের সফরসঙ্গী হয়ে সুন্দর মুখশ্রী এবং সুন্দরতর বাক্যজালে তাকে মোহমুগ্ধ করে '৭০-এর নির্বাচনে সে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়ে পরে তথ্য দফতরের প্রতিমন্ত্রীরূপে শেখ সাহেবের নৈকট্যে চলে আসে। টুকটুক করে কথা বলে পরিবেশ আয়ত্ব করার গুণ রয়েছে তার। অবশ্য টেবল-টকের বাইরে সে কখনও যেভাবে শেখ সাহেবকে তোষামোদ করত, দেখে আমাদের লজ্জা হত, বিরক্তিও উৎপাদন করত। সে যা-ই হোক, এই মামলায় তার কারণেই আমরা জড়িত হয়েছি। তার তথাকথিত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দির বলেই সরকার আমাদেরকে এই জঘণ্য মামলায় জড়িত করেছে। স্বভাবতই আমরা তাকে দেখে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতে পারি না। একরারী আসামীদেরকে পৃথক রাখার কথা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি মনে করে তাকে আমাদের সাথে রাখে বোধগম্য হয় না। আমাদের অস্বস্তি বাড়ে বৈ কমে না।

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, ঠাকুর একটি পরিশীলিত মনের সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাবাপন্ন রুচিবান মানুষ। এখানে পারতপক্ষে সে কোন সাত-পাঁচে থাকে না। নিজের চেয়ারটিতে বসে আর একটি চেয়ার পা দুটি তুলে রেখে নীরবে সময় কাঁটিয়ে দেয়। পায়ে পানি এসেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ডিভিশন না-পেয়ে একাকী যে অমানবিক দুঃখ-কষ্ট জেলখানার অভ্যন্তরে ভোগ করেছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে অকাল বার্ধক্যের দেহ কাঠামোতে।

আমার সঙ্গে বসে বসে কখনও সাহিত্য, সঙ্গীত ও দেশ-বিদেশের খবরাখবর নিয়ে আলাপচারিতা করে। বেলা এগারোটায় বেশ করে গুছিয়ে পেঁয়াজ, মরিচ, তেল দিয়ে মুড়ি মেখে খাওয়া চাই। আমাকে দলে টানার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঘড়ি ধরে প্রতিদিন মুড়ি খেতে মন চায় না। মান্নান সিদ্দিকী সাহেবকে রোজকার সাথী করে নিয়েছে। প্রতিদিন বিকেলে ছাব্বিশ সেলের কাঁঠালিচাঁপা গাছটি থেকে ফুল পেড়ে এনে ঠাকুর আমাকে উপহার দেয়। অন্যরা এ নিয়ে জনান্তিকে দু'কথা বললেও সে প্রতিদিনই ফুল এনে আমাকে উপঢৌকন দেয়। এর মধ্যে কোন ব্যত্যয় দেখা যায় না। সাংবাদিক মানুষ তাহের উদ্দীন ঠাকুর। একসময় দেশের অনেক বরেণ্য রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র নেতার সাহচর্যে এসেছিল। স্মৃতি মন্থনে প্রায়ই

www.pathagar.com

নানা গল্প করে। বিস্তৃত অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণিত সব কথকথা শুনতে ভালো লাগে।

ঠাকুর সুশ্রী দেহের অধিকারী। অধিকন্তু সে একজন সুপুরুষ। যৌবনে এবং ছাত্রজীবনে নানা রোমান্টিক ঘটনার জড়িত থাকা বিচিত্র নয়। সে ধরনের কিছু কিছু ঘটনার কথা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়ার সময় তার একটি ঘটনা শুনে প্রচুর আনন্দ পাই। সে তখন কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। একে ছাত্র নেতা, তদুপরি দেখতে সুন্দর এবং এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারের সন্তান ঠাকুরের প্রণয়প্রার্থীনীর অভাব হওয়ার কথা নয়। কলেজেও জনৈকা ছাত্রী অনেকটা এগিয়েছিল। মেয়েটি ভালো ডিবেটও করত। হিন্দু সভ্রান্ত ঘরের মেয়ে সে। সে সময় কলেজের অধিকাংশ মেয়েই ছিল সে সম্প্রদায়ভুক্ত। তাতে মন দেওয়া-নেওয়া বাধত না। একদিন ডিবেট হচ্ছিল। বিষয়, মেয়েদের রান্না ঘরে ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ছেলেরা প্রস্তাবের পক্ষে। তাদের মূল বক্তা ঠাকুর। বিপক্ষে স্বভাবতই মেয়েরা। কাকতালীয়ভাবে সেদিকে প্রধান বক্তা তারই প্রণয়প্রার্থিনী সেই মেয়েটি। মেয়েটি বক্তব্য রাখার শেষ পর্যায়ে অতি আবেগেতাড়িত হয়ে, আমরা রান্না ঘরে ফিরে যাব না, যাব না বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।

সে যা-ই হোক, ডিবেটে ছেলেদের জয় হয়। তারপর থেকে যখনই কোন মেয়ের সঙ্গে কলেজ প্রাঙ্গণে ঠাকুরের দেখা হত, মেয়েরা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মন্তব্য করত, ঠাকুরকে দিয়ে আর চলছে না, আমাদেরকে তো কিচেনে যেতেই হবে।

কথা শুনে সে যতই জব্দ হোক, মেয়েদের বাচন-শৈলী তাকে মুগ্ধ করে। এতদিন পর সে গল্প শুনে আমরাও আনন্দ লাভ করি।

এর মধ্যে ছাব্বিশ সেলে এসে উপস্থিত হয় জুবায়ের মোহাম্মদ আদেল। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের একসময়ের ডেপুটি মেয়র, মহানগরীর অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের পুত্র জুবায়ের।

জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেলের সঙ্গে বরাবরই আমার সুসম্পর্ক। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের জামাতা জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল আমার ভাতিজা শামিমের শ্বশুর বাড়ির সুবাদে আমার আত্মীয়, সম্পর্কে বিয়াই। জুবায়ের তাই আমাকে চাচা বলে ডাকে এবং একজন অভিভাবকের মতো সমীহ করে। তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল নিউইয়র্কে। ১৯৯২-তে আমি যখন সেখানে জাতীয় পার্টি সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে যাই তখন সে হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে। জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল একজন অতি সাদাসিধা মানুষ। বিত্ত-বৈভব ও

www.pathagar.com

অর্থ-সম্পদে ঢাকার একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাসিন্দা হয়েও খুবই সাধারণ জীবন-যাপন করে। বিনয়ী এবং ভদ্র এই মানুষটির মধ্যে অর্থ সম্পদের কোন বড়াই কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি। সে কারণে তাকে আমার খুবই ভালো লাগে।

আওয়ামী দুঃশাসনের যাঁতাকলে প্রায় অজাতশত্রু জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল এবং তার দুই পুত্রও বাদ যায় না। একে তো জাতীয় পার্টি করে, তদুপরি ঢাকাতে সে নির্বাচন প্রার্থী হবে। কাজেই তাকে দলে আনা প্রয়োজন, অন্যথায় ঘায়েল করতে হবে। যথাবিধি তাকে আওয়ামী লীগে যোগদানের প্রস্তাব রাখা হয়। সে তা প্রত্যাখ্যান করলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত হয়। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান খেলার দিন কোন কোন অবুঝ বালক ও কিশোর যে দেশকে সমর্থন করে তার পতাকা কখনও উত্তোলন করে থাকে। জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল সাহেবের পুরনো ঢাকার বিশাল বাড়িতে অনেক ঘর ভাড়াটে। বহু মানুষজন সেখানে বসবাস করে। সেখানে কোন একস্থানে একটি পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন দেখে ষড়যন্ত্রকারীরা সুযোগ পেয়ে যায়। পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলনের দায়ে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে বয়োবৃদ্ধ আদেল সাহেব ও তার উপযুক্ত দুই পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। শুধু তা-ই নয়, তাদের পাড়ায় তাড়া মসজিদ এলাকায় কিছুদিন পূর্বে একটি নিম্নশ্রেণীর দুষ্কৃতিকারী ছেলে তার বিপক্ষের হাতে নিহত হলে আওয়ামী লীগের তথাকথিত ডাঙ্গর নেতা হাজী সেলিম নিজে উপস্থিত হয়ে আদেল সাহেব ও তার ছেলেদেরকে সেই মামলায় জড়িত করে দেয় এবং গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

জাহাঙ্গীর আদেলের ছোট ছেলে তারেক বাসায় ছিল না-বলে সে ধরা পড়ে না। জুবায়ের এবং তার পিতাকে জেলে পাঠানো হয়। বার দু'য়েক জেল খেটে আদেল সাহেবের জামিন হয়। কিন্তু জুবায়েরের জামিন হয় না। ইতিমধ্যে তার মাতার মৃত্যু হয়েছে। সে উপলক্ষে পিতার সাথে তাকে প্যারল দেওয়া হয়েছিল। প্যারল শেষে জেলে প্রেরণ করা হলে সে ছাব্বিশ সেলে এখন আমাদের সাথী।

আকরাম সাহেবের সঙ্গে এককক্ষে এখন সে আছে। মধ্যবয়সী জুবায়ের ভালোবেসে বিয়ে করেছিল কৃষকশ্রমিক পার্টির নেতা মরহুম এ.এস.এম. সোলায়মানের কন্যাকে। তাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কিন্তু বিবাহ বেশিদিন টেকেনি, বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে।

জুবায়ের তার ছেলে ও মেয়ের জন্য সর্বদাই চিন্তিত। তারা এখন টিন এজার। মায়ের অবর্তমানে পিতা ও পিতামহীর উপর অনেক নির্ভরশীল ছিল। পিতামহী পরলোকে চলে গেল, পিতা গেল জেলে। বাচ্চাদের

www.pathagar.com

দুশ্চিন্তায় জুবায়েরকে প্রায়ই বিমর্ষ দেখায়। আকরাম সাহেব আমাকে অভিযোগ করেছে, আপনার ভাতিজাকে সামলান, এত সিগারেট খাওয়া ভালো নয়।

জুবায়ের একমাত্র আমার সামনেই ধূমপান করে না। তাকে এ বিষয়ে বলতে সঙ্কোচ আসে। শুনলাম সে মশারি না টানিয়ে ঘুমায়।

ধমক দিলাম, শহরে ডেঙ্গু জ্বর হচ্ছে, অবশ্য মশারি টানাবে।

সে নীরবে আমার কথা মেনে নেয়। আকরাম সাহেব এসে বলে, স্যার, আপনার কথায় কাজ হয়েছে, এখন মশারি ব্যবহার করে।

জুবায়ের স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠেছে। জিয়ার সঙ্গে মিলে প্রায়ই মাথায় মেহেদি পাতা বাটা এবং আর আর কিসব দিয়ে চুল কালো করার প্রয়াস পায়। কিছু কিছু শরীর চর্চারও চেষ্টা করে। এতদিন সে ছিল শুকনো পাতলা গড়ণের। তার ইদানীং এসব প্রচেষ্টা দেখে মন্দ লাগে না।

তার আড়ালে তাকে পালোয়ান বলে আমরা ঠাট্টা করি।

আওয়ামী রাজনৈতির শত্রুতার আর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ জুবায়েরের অহেতুক কারা-নির্যাতন ভোগ করা।

প্রায় পাঁচ বছর পিজি হাসপাতালে কাটিয়ে ক্যাপ্টেন (অবঃ) নুরুল হুদা হিরু এবার জেলখানায় আসতে বাধ্য হয়েছে। আমরা বলি, হিরু একটা বেটা! আওয়ামী লীগ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখিয়ে হাইকোর্টের এক সূক্ষ্ম আদেশের ফলে এত দীর্ঘদিন হাসপাতালে কাটিয়ে এল। শেষ পর্যন্ত শুনানি শেষ হওয়াতে তাকে এখানে আসতে হয় এবং তারও স্থান হয় ছাব্বিশ সেলে। সে কারণেই এখানকার তিনটি কক্ষে এখন দু'জন করে বাস করে।

হিরুর সম্বন্ধে এখানে আর লিখতে চাই না। পিজিতে থাকাকালীন একটি রচনায় তার কথা বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি। মঞ্জুর সে ছোট ভাই। এখন দু'ভাই একসঙ্গে জেল খাটছে। দেখে বড়ই কষ্ট বোধ করি।

পিজিতে যখন ছিলাম আমাদেরকে কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি। এমন কি কাজের লোক বা ফালতুও ছিল না। হিরু সেসময় আমাদের তিন প্রবীণ ও অসুস্থ বন্দির জন্য যা করেছে তা বলার নয়। সে ঠাট্টা করে বলত, আমি আমার তিন বড় ভাইয়ের একমাত্র ফালতু।

সে পাঁচটি মাস তার ঐকান্তিক সাহায্য-সহযোগিতা না-পেলে আমাদের সেখানে তিষ্টানো দায় হয়ে পড়ত।

মঞ্জুর অনুরোধে তাকে নিয়ে আমি হিরুর জামিনে মুক্তির জন্য চেষ্টা করেছিলাম। কোন ফললাভ হয়নি। অধিকন্তু, একসময় আমরাই তার কাছে চলে এলাম।

তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেরনিয়াবাত হত্যা মামলায়। বরিশালের রাজনীতির প্রভাব সপক্ষে রাখার স্বার্থে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হীন-

www.pathagar.com

মানসিকতার বশবর্তী হয়ে হাসিনার ফুপাত ভাই চীফ হুইপ আবুল হাসনাতের রোষানলে পরে দুই ভাই এখন খুনের মামলায় অভিযুক্ত এবং দীর্ঘদিন ধরে কারাভোগ করছে। সেরেনিয়াবাত হত্যা মামলা যদিও ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানেরই একটি অংশ, তবুও কেবল মাত্র ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে প্রতিপক্ষকে নিঃশেষ করার জঘন্য মানসিকতায় হিরুর বিরুদ্ধে এই মামলা। ঘটনার বহু পূর্বে সে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নিয়ে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবুও তার রেহাই নেই। মামলার নথিপত্র ঘাঁটলেই অভিযোগের অসারবত্তা পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

সে যা-ই হোক, কাজের মানুষের উপরই কাজ চাপে। ছাব্বিশ সেলের বর্তমান ম্যানেজার সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা জিয়াউল হক জিয়াকে প্রায়ই কোর্ট-কাচারি করতে হচ্ছে। ম্যানেজারিতে সে বেশি সময় মনোযোগ দিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে হিরু নিজের থেকেই তার অনেকটা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার একটু সুব্যবস্থা করার জন্য তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। হিরু জেলখানায় একজন উপকারি সহবন্দি।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর সাহেব তার স্বেচ্ছা নির্বাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রায় বছর দু'য়েক পর অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে খুলনার একটি মামলায় আওয়ামী লীগ সরকার তাকে পনেরো বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে তার প্রয়াত পিতার নামে খুলনাতে একটি ক্যান্সার হাসপাতাল নির্মাণের জন্য পারিবারিক সম্পত্তি থেকে একশত বিঘা জমী প্রদানের অঙ্গিকার করে প্রধানমন্ত্রিত্বের ক্ষমতার অপব্যবহার করে রিলিফের গম দ্বারা সে জমি উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করেছে। তার অনুপস্থিতিতে তড়িঘড়ি করে যখন ওরা তাকে সাজা দেয়, খবরের কাগজে পড়ে তখন মন্তব্য করেছিলাম, এ মামলা ধোপে টেকা দায়।

অন্য একটি মামলায়ও ঠুনকো অভিযোগে তাকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কাজী জাফরের আওয়ামী বিরোধী ভূমিকা সর্বজন বিদিত। সে কারণেই তার ভাগ্যে এই কারাদণ্ড। দেশে থাকতেই জাফরের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। তার কিডনি ক্ষতিগ্রস্থ। কিডনির চিকিৎসা করাবার জন্য সে সিডনিতে গিয়েছিল। সেখানে কারাদণ্ডের খবর পেয়ে অসুস্থাবস্থায় আর দেশে প্রত্যাবর্তন করেনি। আওয়ামী কুশাসনের অবসানে

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে জাফর দেশে প্রত্যাবর্তন করে। বিমানবন্দর থেকেই তাকে জেলে নিয়ে আসা হয়। শারীরিক কারণে দু'একদিন পরই তাকে পিজিতে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু সেখান থেকে কয়েকদিন পরই তাকে ডিসচার্জ করে দিলে তাকে ছাব্বিশ সেলে আমাদের সান্নিধ্যে আনা হয়। দীর্ঘ চার বছর পর তার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। দু'জন দু'জনকে চোখের পানিতে বুকে জড়িয়ে ধরি।

সারা দেশ জানে, আমরাও কখনও অস্বীকার করিনি, জাফর এবং আমি দুই মেরুতে অবস্থান করি। ছাত্রজীবন থেকে সে ছিল বামপন্থী। আমাকে বলা হয় ডানপন্থী। আমি জানি, আমি জাতীয়পন্থী তথা মধ্যপন্থী।

সে যা-ই হোক, সে ছাত্রজীবনে ছাত্রইউনিয়ন, পরে ন্যাপ এবং তার পরে ইউপিপি করলেও অনেকের মতে সে একজন চীনপন্থী কমিউনিস্ট। ইউপিপি থেকে সে জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিসভায় যোগ দেয় এবং পরে এরশাদ সাহেবের সঙ্গে জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়ে তার মন্ত্রী সভায় আসন পায়, পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করে। প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে সদস্য নির্বাচিত হয়ে সে প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরব অর্জন করে।

একবার জাফর সাহেব আমাকে তার এলাকায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এক জনসভায় নিয়ে গিয়েছিল। তার এলাকার লোকজন আমার বক্তৃতা শুনতে চায়। সেখানে আমি বলেছিলাম, আপনাদের সন্তান কাজী জাফর একটা বেটা! একবার এমপি হয়েই প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। আমি পাঁচ বার এমপি হয়েও উপ-প্রধানমন্ত্রীর উপরে উঠতে পারিনি।

লোকজন খুব করতালি দিচ্ছিল। জাফর হাসতে হাসতে বলে, ভাই! আপনি আমার পক্ষে বলছেন না বিপক্ষে বলছেন?

আমি তাকে আশ্বস্ত করি তার পক্ষেই বলছি। সারা জীবন আমরা দুই মেরুর হয়েও এরশাদ সাহেবের রাজনীতিতে এসে একত্র হই। কিন্তু বিভিন্ন প্রশ্নে আমাদের মতানৈক্য থেকেই যায়।

কিন্তু যেদিন মানিক মিয়া এ্যাভিনিউর বিশালতম জনসমাবেশে নাজিউর রহমান বক্তৃতারত কাজী জাফরকে অপদস্থ করে সেদিন আমি জাফরের পক্ষ অবলম্বন না-করে পারিনি। একজন প্রবীণ রাজনীতিবীদ এবং সর্বোপরি সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে এইভাবে জনসমক্ষে দৈহিকভাবে আক্রমণ করা কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারে না। সেখান থেকেই নাজিউর এবং তার কারণে নেতা এরশাদ সাহেবের সাথে আমার দ্বন্দ্ব বাধে এবং তার ফলশ্রুতিতে একসময় জাফর ও আমি দলকে পৃথক করি। পরে অবশ্য দল একীভূত হয়। জাফর সম্বন্ধে যার যে মতই থাক না-কেন, এ কথা অবশ্য

www.pathagar.com

বলা সঠিক যে সে সর্বোতভাবেই একজন পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তার কর্মধারা বা চিন্তা-চেতনার সাথে যে-কোন লোকের দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু সে-সবের কার্যকারীতা সম্বন্ধে আদৌ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। মত ও পথ নিয়ে পার্থক্য থাকলেও অনেক রাজনৈতিক প্রশ্নেই কাজী জাফরের সঙ্গে আমার চিন্তা-চেতনার মিল হত। ক্যাবিনেটে বসেও এসব ক্ষেত্রে আমাদের মতৈক্য দেখে প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং কোন কোন সহকর্মী বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকত।

সে যা-ই হোক, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জাফর সাহেবকে জেলখানায় আমরা যতটুকু সম্ভব সহৃদয় সাহচর্য দিয়ে উজ্জীবিত করার প্রয়াস পাই। আশা করি শীঘ্রই হাইকোর্টে তার আপিল গৃহীত হবে এবং সে মুক্তি পেয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করবে। হলও তা-ই, আজই সুসংবাদ এসেছে। বড় মামলায় জামিন হয়ে গেছে, অচিরেই পরেরটাও হয়ে যাবে।

কাজী জাফর খুব শীঘ্রই মুক্তজীবনে ফিরে যাবে। কিন্তু আমরা?

আমাদের বন্দরের কাল কবে অবসান হবে? আল্লাহ্ গাফুরুর রহিমই সঠিক বলতে পারেন।

জাফর সাহেব অচিরেই মুক্তি পেয়ে বাইরের জগতে চলে যায়। বঙ্গভবনের কর্মকর্তা মান্নান সিদ্দিকী কিন্তু এই পৃথিবীর জ্বালা-যন্ত্রণা থেকেই চিরমুক্তি লাভ করে। আমার সুদীর্ঘ কারা-জীবনে কোন সহবন্দির মৃত্যু এবারই প্রত্যক্ষ করি। চুপচাপ প্রকৃতির এই সরকারি কর্মচারিটিকে শুনেছি ব্যক্তিগত বিরাগের বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে অর্থ আত্মসাতের কয়েকটি মামলা দায়ের করেন। সরকারি অর্থ তছরুপের এ ধরনের মামলায় সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের একাধিক কর্মচারী বা কর্মকর্তা জড়িত থাকে। যারা বিল পাস করে তারাও বাদ যায় না। মান্নান সিদ্দিকীর ক্ষেত্রে সে একাই কেবল অভিযুক্ত। সে ছিল Drawing and Disbursement officer. একাউটেন্ট, বিল ক্লার্ক, ব্যাংকের লোক এবং এজির স্টাফদের সহযোগিতা ব্যতিরেকে চেকের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ প্রায় অসম্ভব। মান্নান সিদ্দিকী বলেছিল, এক মামলায় এ.জি'র স্টাফদের আসামী করলে তারা ধর্মঘটের হুমকি দিয়ে রেহাই পায়।

www.pathagar.com

একদা শাহাবুদ্দিন সাহেবের প্রিয়ভাজন মান্নান সিদ্দিকী একসময় তার কোপানলে পতিত হয়ে আজ গোটা তিনেক মামলায় আসামী হয়ে আমাদের সঙ্গে ছাব্বিশ সেলে শ্রেণীপ্রাপ্ত বন্দি হিসাবে ছিল। দুটি মামলায়, যেগুলোতে অধিক অর্থ জড়িত, তার সাজা হলে সে হাইকোর্ট থেকে জামিন পায়। তার পরও মাত্র পঁচিশ হাজার টাকার একটি মামলায় তার জামিন দেওয়া হয় না। তার অভিযোগ, বঙ্গভবন থেকে কলকাঠি নেড়ে তাকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে। জজকোর্টে জামিন মুভ করা হয়েছে। যে কোনদিন মুক্তি পেয়ে চলে যাবে বলে কাপড়-চোপড় সব গোছগাছ করে রেখেছে। ইদানীং তার মুখে একটি সপ্রতিভ হাসি লক্ষ্য করা যেত। তার স্ত্রী ছোট ছোট দুটি শিশু সন্তান নিয়ে বঙ্গভবনের শত বিরূপতার মধ্যেও কোন প্রকারে সেখানে টিকে আছে। ফোন কেটে দিয়েছে, গাড়ি নেই, কোয়ার্টার ছাড়ার তাগিদ প্রতিদিন বাড়ছে। তার স্ত্রী অধীর আগ্রহে স্বামীর মুক্তির দিন গুণছে। পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান মান্নান সিদ্দিকী। তারা দু'জনই জীবিত। সন্তানের মুক্তির আশায় বৃদ্ধ জনক-জননী অধীর আগ্রহে দিনাতিপাত করছে।

এরমধ্যে তার পরপারের ডাক এসে যায়। কোন জামিন, বেলবণ্ড বা উকিল-মোক্তারের প্রয়োজন হয় না। স্বয়ং আজরাইল ফেরেশতা এসে শিয়রে দাঁড়ায়।

মান্নান সিদ্দিকীর বয়স বড় জোর চল্লিশ পার হয়েছে। স্বাস্থ্য ভালো। সামান্য একটি ভুঁড়িও গড়ে উঠেছে। দিনের অধিকাংশ সময় বারান্দায় চুপচাপ বসে পড়াশোনা করত। কারো সঙ্গে আলাপরত হলে তার বিরুদ্ধে যে অন্যায় মামলা দায়ের করা হয়েছে কেবল সে সম্বন্ধেই অভিযোগের স্বরে কথা বলত।

তার সব অভিযোগ-অনুযোগের পালা শেষ। আমরা কেউ কিছু জানতেও পারি না। সেলে তার সহবন্দি হাসান সাহেবের কাছ থেকে পরদিন অনেক বেলায় সব শুনি। রাত্রে সেল বন্ধ হয়ে গেলে এবং ঘুমিয়ে পড়লে অন্যদের বিষয়ে কিছু অবগত হওয়ার সুযোগ থাকে না। অধিক রাত্রে সিদ্দিকী সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং জেলখানার ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে তার অবস্থা সঙ্গটাপন্ন দেখে তাকে সঙ্গে সঙ্গে হৃদরোগ হাসপাতালে স্থানান্তর করে। শুনেছি এই সঙ্কটাপন্ন রুগীকেও দীর্ঘ পথ হাঁটিয়ে গেটে নেওয়া হয় এবং রিকশা করে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখান থেকে তিন-চার দিন পরই নিদারুণ সংবাদ আসে, মান্নান সিদ্দিকী আর নেই! দুনিয়ার সকল দেনা-পাওনা সাঙ্গ করে ২৪শে নভেম্বর, ২০০১ সালে সে চিরকালের মতো এই অবিনশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে।

তার স্ত্রী, দুটি শিশু সন্তান এবং বৃদ্ধ পিতা-মাতার শোকের পরিমাপ

www.pathagar.com

বিবেচনা করে আমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। কিন্তু কিছুই করার নেই। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া যাবে না। কখন কার সময় হবে জানা নেই। আমরা কোন কোন মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলে আখ্যা দিই। কিন্তু মহাকালের যিনি মালিক, তিনি সকলের জীবন-মৃত্যুর নির্ঘণ্ট ঠিক করে রেখেছেন। মানুষের কোন কিছুই করার নেই।

আমরা তার রুহের মাগফেরাত কামনায় আমাদের দুর্বল হাতগুলো তাঁর দরবারের উদ্দেশ্যে তুলে ধরি।

বাইরের জগতের আরো দুটি মৃত্যু সংবাদ আমাকে যারপরনাই ব্যথিত করে। আমার এক ভাগ্নে, বিক্রমপুরের অন্যতম সুযোগ্য সন্তান শিল্পপতি আবদুল কাদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে তার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার অফিসে ঢুকে দুষ্কৃতিকারীরা উপর্যুপরি গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২০০১ সালের ২রা অক্টোবরের নির্বাচনে এলাকাতে সে বিএনপি প্রার্থীর পক্ষে কাজ করে এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। নির্বাচনে তাদের জয় হয়। তারপরই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। তাদের বাড়িও আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাজির পাগলা। আমার মামা মরহুম আবুল বাসার হাওলাদার সাহেবের উদ্যোগ আয়োজনে আমাদের গ্রাম দোগাছিতে দীর্ঘদিন পর আবার বাজার, পোস্ট অফিস, মসজিদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেসময় আমি সরকারে ছিলাম বিধায় মামার স্বপ্ন সফল করে তুলতে পারি। মামার ইন্তেকালের পর আমরা বাজারটির নাম দিই 'মামার বাজার।' সেই বাজার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার আধিপত্য নিয়ে সেখানে একটি স্নায়ুযুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

আমরা তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখলেও গ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষাকারী কাদের এবং তার ভাই বাসার অনেকটা জড়িয়ে পড়ে। বাসার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলেও কাদের শুধুই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সমাজ-সেবায় সম্পৃক্ত ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাদের অর্থ আছে তাদের মনের বড় অভাব। বিত্ত ও চিত্ত একসঙ্গে পাওয়া সহজ নয়। এক্ষেত্রে কাদের একটি ব্যতিক্রম। সে একজন শিল্পপতি এবং অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী। তেমনি তার বড় মন এবং সেরকমই তার বদান্যতা। কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠান তার কাছে হাত পেতে কখনও নিরাশ হয়নি। যেমন প্রচুর আয় করে, তেমনি মানুষের প্রয়োজনে অকাতরে দান করে থাকে। কাদেরের জুড়ি সারা বিক্রমপুরে খুঁজে পাওয়া ভার।

'৯১-তে আমি যখন রংপুরের পীরগঞ্জে জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি তখন বাসার এবং কাদের দুটি পাজেরো নিয়ে সেখানে ছুটে যায়। যথেষ্ট খাটা-খাটুনি করে এবং অর্থও ব্যয় করে। সেবার বিএনপি সরকারের আমলে আমাকে যখন বিক্রমপুরে যেতে দেওয়া হয় না, পুলিশ ও শত শত অস্ত্রধারী ক্যাডার দিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করে আমার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

সর্বাত্মক অভিযান চালায় তখন বাসার ও কাদের তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমার সপক্ষে লড়ে যায়। একটি সভায় যোগদানের উদ্দেশে কাদের আমাকে তার গাড়িতে করে রাতের অন্ধকারে গ্রামে নিয়ে যায়। বিএনপি অবশ্য আমাদের কোন সভা করতে দেয় না। এমন কি আমি কাদেরদের বাড়িতে অবস্থান নিলে তারা সেখানেও সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করে। বাসার-কাদেররা সেদিন অসম সাহসিকতার সাথে সে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে।

কাদেরের বয়স বোধহয় চল্লিশও পাড় হয়নি। স্বাস্থ্যজ্জ্বল দেহে কালো চাপ দাঁড়িতে তাকে সুন্দর মানাত। মুখে সব সময়ই একটি অমলিন হাসি। সে যখন এসে মামা বলে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ভরাটকণ্ঠে ডাক দিত, আমার মনটা ভরে যেত। কাদেরের মা আমার বুজি এখনও জীবিত আছে। সে যে কি করে তার গর্ভের এই সেরা সন্তানটির শোক সহ্য করবে জানি না।

বুজির সাথে যখনই দেখা হত, আমাকে বলত, ভাগনেদের দেখে রেখো।

আমি বলতাম, বুজি, আমার বয়স হচ্ছে, ভাগ্নেদেরই বলুন আমাকে যেন দেখে রাখে।

কাদের তার বড় ভাইয়ের শ্যালিকাকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিল। কয়েকটি সন্তান-সন্ততি নিয়ে ছিল তার সুখের সংসার। সব তছনছ করে সন্ত্রাসীদের বুলেট কাদেরের দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেল।

এদেশে বুলেটের আঘাতে আর কত মায়ের বুক খালি হবে, আর কত স্ত্রী বিধবা হবে, পুত্র-কন্যা পিতৃহীন হবে এবং দেশের অগণিত মানুষেরা তাদের সুখ-দুঃখের সাথী কাদেরের মতো পরোপকারী বড় অন্তকরণের মানুষ হারাবে জানি না। এই হত্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন হবে কিনা তাও জানি না। সরকার আসে, সরকার যায়। কিন্তু সন্ত্রাস বিদূরীত হয় না। নিরসন হয় না না-হক খুনের তাণ্ডব।

জানি না, এভাবে আর কত কাল চলবে! কাদেরের স্ত্রী সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেছে তার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কোন অগ্রগতি নেই। বরং পরিবারের সদস্যদের প্রতি হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাদের নিহত হয়েছে, এখন তার দুর্ভাগা পরিবার আরও অসহায়তায় ভুগছে। জানি না কবে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটবে!

এর মাঝে সংবাদপত্রে দেখি, আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ছোট ভাইয়ের মতো, এককালীন ছাত্র নেতা, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়ামের সদস্য মাহবুবুল হক দোলন ইন্তেকাল করেছে। বেশ কিছুদিন থেকেই শুনছিলাম সে গুরুতর অসুস্থ। বারডেম হাসপাতালে যখন বহুমূত্রজনিত জটিলতায় তার একটি পা কেটে ফেলে, আনোয়ার তাকে হাসপাতালে

www.pathagar.com

দেখতে যায়। দোলন দুঃখ করে বলে, মোয়াজ্জেম ভাইয়ের সঙ্গে বোধহয় আর দেখা হবে না।

আনোয়ারের মুখ থেকে সেকথা শুনে আমার মন ব্যথায় ছেয়ে যায়। সে ঠিকই বলেছিল, তার সাথে আর দেখা হল না। তার সব কোলাহল চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে। বিপুল দেহভার নিয়ে কিছু একটা খেতে খেতে হেলে-দুলে সে আর কোনদিনই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে না।

ছাত্রজীবনেই তার সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা। মুসলিম লীগ ও তাদের ছাত্র প্রতিষ্ঠান এনএসএফের নেতা হয়েও মাহবুবুল হক দোলন আমাদের সাথে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং এক সময় কারাবরণও করে। ছাত্রজীবন শেষে মুসলিম লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ, বিএনপি এবং সর্বশেষ জাতীয় পার্টির রাজনীতিতে সে সক্রিয় ছিল। দোলন কখনওই নীরব থাকতে পারত না। সে যেখানেই থাকত নিজস্ব একটি পরিমণ্ডল গড়ে তুলত এবং সর্বদা কর্মব্যস্ত থাকত।

আমরা রসিকতা করে বলতাম, ওর বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছে দোলন, সে তো দুলবেই।

আমার সঙ্গে সে জাতীয় পার্টির যুগ্ন-মহাসচিব হয়েছিল। পরে প্রেসিডিয়ামের সদস্য হয়। সার্বিকভাবে একজন পূর্ণ রাজনৈতিক কর্মী ছিল দোলন। তার মধ্যে প্রচুর সাংগঠনিক শক্তি ছিল। সে ভালো বলতে পারত। তার লেখনীও ছিল সচল। কিন্তু এত গুণসম্পন্ন হয়েও রাজনীতি ক্ষেত্রে তার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি। তার অনেক অনুগামী ও কর্মী মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দোলন একবার সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়নি।

কুমিল্লা দাউদকান্দির এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে তার জন্ম। তার পিতা ছিলেন একজন সফল সরকারি কর্মকর্তা। তিনি যখন বাগেরহাটের মহকুমা অফিসার ছিলেন, তখন খান জাহান আলীর মাযার প্রাঙ্গণের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। বাগেরহাটে জনসভা করতে গিয়ে দোলনসহ সেসব দেখে আমরা তার প্রশংসা করি। দোলন খুব খুশি।

আমি ওকে দেখা হলেই সাবধান করতাম, দোলন, ডায়েবেটিসের রুগী তুমি, বেশি খাবে না।

কিন্তু সে কখনওই তা শুনত না। হেসে উচ্চস্বরে সালেহাকে ডেকে বলত, ভাবী, আমি দোলন। কিছু খাবার-দাবার পাঠান।

সালেহার কাছে কেউ খেতে চাইলে সে খুব খুশি হয়। সঙ্গে সঙ্গে নানা খাদ্যদ্রব্য নিচে আসতে থাকে। দোলন নিজে যেমন খেতে ভালোবাসত, লোকজনকে কর্মীদেরকে ঠিক তেমনি ভাবে খাওয়াতেও পছন্দ করত। তার মনও ছিল বিশাল। বাংলাদেশের সর্বত্র সে অক্লান্তভাবে রাজনীতির কারণে ছোটাছুটি করত। যেখানেই একটা ভালো কিছু তার দৃষ্টিতে পড়ত, সে তা

www.pathagar.com

নিজের বাসার জন্য অবশ্যই নেবে এবং তার খানিকটা ভাগ আমার বাসায়ও দেবে। আমি সালেহাকে ঠাট্টা করে বলতাম, দোলনের কাছ থেকে এত কিছু পাও বলেই তুমি তাকে এত আপ্যায়ন কর।

সালেহা হেসে বলত, দোলন ভাই খেতে ভালোবাসে। যে খেতে পছন্দ করে তাকে খাওয়াতে পারলে মেয়েরা খুশিই হয়।

এক জনসভা করার জন্য দোলনের গ্রামের বাড়িতে সদলবলে গিয়েছিলাম। দোলন যে কত প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেছিল তা বলে শেষ করা যাবে না। যত বড় তার দেহ, তত বড় ছিল তার মন। সেই দোলন আমাদের সকলকে ছেড়ে চিরতরে চলে গেল। তার কথাই ঠিক হল, আর দেখা হল না।

ছাব্বিশ সেলে একদিনের জন্য আ.স.ম. আবদুর রব এসে উপস্থিত হয়। নির্বাচনের সময় দুই লাখ পাঁচ হাজার জাল ব্যালটসহ সে ধরা পড়ে। পরে পুলিশ ও অফিসারদের সঙ্গে তাই নিয়ে বিতণ্ডা ও হাতহাতি হলে তাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। আওয়ামী মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে সে-ই কারাবরণে প্রথম হয়।

সেদিন লক-আপের পর কারা-রক্ষীদের সঙ্গে এসে সে আমার সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে সালাম জানায়। সে আওয়ামী মন্ত্রিসভার সদস্য ছিল। তারাই আমাদেরকে বিগত চার বছর আটক রেখেছে এবং জেলহত্যা মামলার মতো একটা জঘন্য মামলায় আসামী করেছে। রাগ-দুঃখ মনের অভ্যন্তরে রেখে প্রত্যাভিবাদন করি এবং সময়োচিত খোঁজখবর নেই। পরদিন সকালে উঠেও তার কক্ষের সামনে গিয়ে তার তত্ত্ব-তালাশ করি। রব হয়ত এতটা আশা করেনি।

ছাব্বিশ সেলের অন্য সব বন্দিরা কিন্তু বিষয়টা ভালোভাবে নিতে পারেনি। সকলেই কম-বেশি ওদের সরকারের দ্বারা নির্যাতীত। তারা রবের উপস্থিতি মোটেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। রব একবার তাহের ঠাকুরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, চিনতে পারেন?

ঠাকুর জবাব দেয়, আপনাদের দ্বারা পাঁচ বছর বন্দি হয়ে আছি, আপনাকে চিনব না!

www.pathagar.com

রব আর সেখানে দাঁড়ায় না। আকরাম সাহেবের হাত ধরে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, নির্বাচনের ফলাফল এমন হল কেন বলতে পারেন?

আকরাম সাহেব জবাব দেয়, আপনারা বহু মানুষের অভিশাপ কুড়িয়েছেন। সে কারণেই এই বিপর্যয়।

রব এসে আমাকে বলে, ভাই, আপনার সময় হলে আমাকে একবার ডাকবেন, কথা বলব।

তাকে ডাকার প্রয়োজন বা সুযোগ হয়নি। তাকে কেন্দ্র করে ছাব্বিশ সেলের আবহাওয়া ক্রমেই উত্তপ্ত হচ্ছিল। আমার উপস্থিতির কারণেই হয়ত সেটা ফেটে পড়ার সুযোগ পায়নি। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আঁচ করে অনতিবিলম্বে তাকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

কয়েকদিন পর সেখানে থেকেই সে মুক্তি পেয়ে চলে যায়। আমাদের সঙ্গে বিব্রতকর দেখা-সাক্ষাৎ হবার আর সুযোগ থাকে না।

ছাব্বিশ সেলে আর এক অবসরপ্রাপ্ত মেজর এসেছে দু'বছরের সাজা নিয়ে। ডিভিশন পেতে পেতে ছ'মাস অতিবাহিত হয়েছে। আর একবছর পার হলেই মেয়াদ শেষ হবে। দু'বছরের সাজায় মাফ মার্কা বাদ দিয়ে আঠারো মাসের মতো খাটতে হয়।

ছিমছাম সুন্দর দেহে পাকা গোঁফের এই মানুষটির চাল-চলন এবং আচার-আচরণ খুবই অমায়িক। তার বাচনভঙ্গীও প্রশংসনীয়। কিন্তু সব চাইতে আকর্ষণীয় তার বেশভূষা। কখনও সফেদ পাজামা-পাঞ্জাবি, আবার কখনও ফুলপ্যান্ট-ফুলশার্ট। একসময় পাকিস্তানিদের মতো এক রঙের কুর্তা পাজামা পরে সে ঘর থেকে বের হয়। কখনও দেখা যায় সাদা লুঙ্গির সঙ্গে গেঞ্জির উপরে ফিনফিনে চাদর। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওটা নামাজের পোশাক। কখনও সে জমকালো একটি ড্রেসিং গ্রাউন পরিধান করে সেলের বারান্দায় বিচরণ করে। প্রায় সব পোশাকেই তাকে মানায়। অবশ্য জেল অভ্যন্তরে আমি সচরাচর কাউকে ড্রেসিং গ্রাউন পড়তে দেখিনি। মোজাম্মেল হোসেন লোকটি নিঃসন্দেহে দর্শণধারী এবং শৌখিন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সে করাচী মালির ক্যান্টনমেন্টে আটকা ছিল। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে অচিরেই একটি সামরিক কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরিত হয়। সেখান থেকে '৭৫-এর পট-পরিবর্তনের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে আর্মী সার্ভিসেস কোরে গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করে এবং দক্ষতার সঙ্গে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। ইতিমধ্যে ১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর দেশে সিপাহী-জনতার বিপ্লব সাধিত হয়। পরবর্তীতে তার কিছুটা ধাক্কা মেজর মোজাম্মেল হোসেনের উপরেও আসে। একসময় তাকে সামরিক বাহিনী থেকে অবসর দেয়া হয়। সে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে ভালো কাজ পেয়ে যায় এবং স্বীয় কর্মনৈপুণ্য ও যোগ্যতার ফলে সকলের

www.pathagar.com

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে তাকে পেট্রো-বাংলায় প্রেরণ করা হয় এবং অনেক বয়োজেষ্ঠ্য ব্যক্তিদের ডিঙ্গিয়ে সে অচিরেই সেখানে সেক্রেটারির পদে প্রমোশন লাভ করে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে সে ট্রেনিং ও ডিগ্রী লাভ করে। অন্যান্য কতিপয় অফিসারসহ যুক্তরাষ্ট্রে এক সফরে গিয়ে সে তিন শত পঁচিশ ডলার বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ করে ফেলে।

কর্মক্ষেত্রে পরপর উন্নতি এবং দৃষ্টিগ্রাহ্য সাফল্যের কারণে সে অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের ঈর্ষার বস্তুতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় তদন্তে তাকে সেই অপরাধে চাকরিচ্যুত করে মামলা দায়ের করা হয়। আত্মবিশ্বাসী মোজাম্মেল হোসেন চাকরী চলে যাওয়ায় বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করে না। বরং সে প্রাইভেট খাতে অতি উচ্চবেতনে কাজ সংগ্রহ করে নেয়। মামলাটির বিষয়ে খুব একটা যত্নবান না-হওয়ার দরুণ একসময় পঁচা শামুকে পা কাঁটে। তার দু'বছরের জেল এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা হয়ে যায়। ঊর্ধ্বতন আদালতেও রায় বহাল থাকে এবং যথাসময়ে সে ছাব্বিশ সেলে এসে আমাদের কারা-সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়।

সে বলে, স্যার, আপনার আমি একজন অ্যাডমায়ারার। যখন মন্ত্রী ছিলেন আপনার অফিসে যেতাম। আপনার বক্তৃতা-বিবৃতি খুব ভালো লাগত।

তার কথা শুনে মন্দ লাগে না, প্রশংসায় মজে না এমন লোক কমই আছে। মোজাম্মেল সাহেবের সঙ্গে এরশাদ সাহেবেরও পরিচয় রয়েছে।

আমাদের সেলে এখন আর্মী এবং পুলিশ সমান-সমান। খায়রুজ্জামান, নূরুল হুদা এবং মোজাম্মেল হোসেন আর্মীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। অন্যদিকে আকরাম সাহেব, আমিনুল ইসলাম ও জিয়াউল হাসান পুলিশের লোক। মাঝখানে আমরা ক'জন নিরীহ পাবলিক। ছাব্বিশ সেল এখন খামোখাই নানা টেনশনের কেন্দ্রবিন্দু।

আর ভালো লাগছে না।

সে যা-ই হোক, মোজ্জামল হোসেন একজন সুখকরসঙ্গী। পারিবারিক জীবনে সে খুবই সুখী। স্ত্রী সার্বক্ষণিক গৃহিণী। চারটি পুত্র সন্তানের সে গর্বিত পিতা। সেদিন কথায় কথায় বলছিলাম, আপনি তো ভাগ্যবান ব্যক্তি। চার পুত্র আপনার ঘরে চারটি মেয়ে নিয়ে আসবে।

সে হাসিমুখে জবাব দেয়, ঠিক বলেছেন স্যার, আমি আমার পুত্রবধুদের প্রত্যেককে প্রতি ঈদে দুটি করে শাড়ি উপহার দেব। একটি শ্বশুর হিসাবে, অন্যটি পিতা হিসাবে। কন্যার অভাব পুত্রবধুদের দ্বারা পূরণ করব।

কথাগুলো শুনে খুবই ভালো লাগে। মনে মনে প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ যেন তা-ই করেন।

মেজর খায়রুজ্জামান সাহেবও একজন ভালো সঙ্গী।

www.pathagar.com

গোপালগঞ্জের অধিবাসী এই ব্রাইট আর্মী অফিসারটি নিয়তির দোষে আজ কারাগারে নির্যাতীত হচ্ছে।

তাকে প্রথমে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আসামী করতে চেয়েছিল। সেভাবেই গ্রেপ্তার করেছিল। কিন্তু তদন্তে দেখা গেল ঘটনার সময় সে ভারতে ট্রেনীংরত। সে কারণে তাকে সেই মামলায় জড়িত করা যায় না। কিন্তু তাতে কি? কোন না কোনভাবে তাকে জড়াতেই হবে। কারণ?

কারণ হচ্ছে এই যে, ১৫ই অগাস্টের অভ্যুত্থানের পর ভারত থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে বঙ্গভবনে ট্যাংকবাহিনীর স্কোয়াড কমাণ্ডার হিসাবে প্রেরণ করা হয। সেখানেই নিয়োজিত থেকে সে তার কর্তব্য করে। সে সময় বঙ্গভবনে অবস্থানকারী ১৫ই আগস্টের ঘটনার নায়কদের সাথে তার ওঠা-বসা খুবই স্বাভাবিক।

'৭৫-এর অক্টোবরের শেষ দিকে যখন খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল তখন খায়রুজ্জামান সাহেব তার কমান্ডারের সহায়তায় বিষয়টি তদানীন্তন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে অবহিত করে। জিয়াউর রহমান সাহেব তাকে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়ে বঙ্গভবনের দায়িত্বে কর্তব্যরত থাকারই পরামর্শ দেয়। তারপর ১লা নভেম্বর যখন খালেদ মোশাররফের কাউন্টার অভ্যুত্থান অনুষ্ঠিত হয় তখন সে তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা না-করে পক্ষান্তরে বিরোধিতাই করে। বিষয়টি আরও জটিল আকার ধারণ করে যখন খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাসীন হয় এবং সে ১৫ই আগস্টের নায়কদের সাথে দেশত্যাগ করে চলে যায়।

পরে জিয়াউর রহমান সাহেবের আমলে অন্যান্যদের সঙ্গে খায়রুজ্জামান সাহেবও বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে গৃহীত হয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে কাজ করে। সে যখন লন্ডনে ছিল এরশাদ সাহেবের আমলে আমার সঙ্গে সেখানে তার দেখা হয়েছিল। আমি তখন সরকারে। বিভিন্ন দেশ ঘুরে ফিলিপাইনে তার শেষ পোস্টিং হয় মিশন অধ্যক্ষ হিসাবে। আওয়ামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে দেশে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে ওএসডি হিসাবে যোগদানের অব্যাবহিত পর তাকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে সুবিধা করতে না-পেরে জেলহত্যা মামলার আসামী করে নেয়। কোন না কোনভাবে তাকেও জড়াতেই হবে। অবশ্য এখানেও ঠাকুরের স্বীকারোক্তিমূলক জবাবনবন্দি কাজ করেছে বৈকি!

পঞ্চাশোর্ধ বয়সের খায়রুজ্জামান সাহেব সুন্দর একহারা গড়ণের অধিকারী। ছাব্বিশ সেলে সময়-নিষ্ঠা এবং নিয়মিত শরীর চর্চার জন্য সে খ্যাত। জেলের অভ্যন্তরে একজন সুসঙ্গী খায়রুজ্জামান প্রয়াত সিনিয়ার মন্ত্রী মশিউর রহমানের জামাতা। কোন কিছুতেই জড়িত না-থেকেও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজ সে পাঁচ বছর ধরে জেল খেটে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় ব্যক্তি গুলশানের শিল্পপতি লতিফুর রহমান সাহেবের কিশোরী কন্যা নাজনিন হত্যাকাণ্ডের অন্যতম আসামী তার বাড়ির ঠিকাদার হাসান। সারাক্ষণ ধর্ম-কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। চুপচাপ প্রকৃতির সোজা-সরল মানুষটিকে দেখলে বুঝা যাবে না কি করে তাকে একটি লোমহর্ষক হত্যা ও নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। তাকে দেখলে এবং তার বক্তব্য শুনলে অবাক হতে হয়। কিন্তু একজন পিতা তার নিজের কন্যা সম্বন্ধে এ ধরনের অভিযোগ কখন কিভাবে উত্থাপন করে বিবেচনায় আনলে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সত্যি কথা না জেনেও তার প্রতি মনের সহৃদয় বহিঃপ্রকাশ স্বতস্ফূর্ত হয়। মিষ্টির মধ্যে আমিরতি এবং শনপাপড়ি হাসান সাহেবের প্রিয় খাদ্য। ক্রমে সে আমার সান্নিধ্যে এসে নৈকট্য লাভ করে এবং আমাকে সে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। তার প্রিয় মিষ্টিও খেতে সাধাসাধি করে। কেউ যখন দেখে না, তখন দু'-চারটে মিষ্টি খেয়ে নিই এবং হাসান সাহেবকে কপট বকাঝকা করি ডায়াবেটিসের রুগীকে মিষ্টি খাওয়াবার অপরাধে

আকরাম সাহেব উত্তেজিত হয়ে এসে জানায়, স্যার, আজ কাদের সিদ্দিকী নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সম্মেলন আহ্বান করেছিল। সম্মেলন চলাকালীন সময়ে সরকারি দলের সশস্ত্র ক্যাডাররা সেখানে প্রবেশ করে সন্ত্রাসী চালায়। প্রচুর গোলাগুলি ও বোমাবর্ষণ করে সম্মেলন ভণ্ডুল করে দেয়।

শুনে স্তব্ধ হয়ে যাই। দল করার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার বুলি অহরহ কপচিয়ে এই স্বৈরতন্ত্রী সরকার নিজেদের হিংস্র চেহারা আর একবার উন্মোচন করে।

১৯৯২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার সায়েদাবাদে বিএনপি সরকার জাতীয় পার্টির মহাসমাবেশে যে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভেঙে দিয়েছিল, আজ এই শতকের শেষভাগে ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকারও তার চরম ভয়াল রূপ আর একবার তুলে ধরল। সভ্য সমাজে রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে শত শত আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের উপস্থিতিতে সরকারি দল সন্ত্রাসীদের দ্বারা যে নগ্ন হামলা চালিয়ে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করল তার কোন তুলনা হয় না। এরা নাকি গণতান্ত্রিক! মুখে আইনের শাসন আর সংসদীয় রীতি-নীতির কত না-বাগাড়ম্বর।

www.pathagar.com

পৃথিবীর সভ্য সমাজ কি এখন চোখ বুজে আছে! তারা কি অমার্জনীয় ফ্যাসিস্ট কাণ্ড-কীর্তি অবলোকন করছে না? মহিলাকে ডেকে ডেকে আরও পুরষ্কৃত করুন। গণতন্ত্রের কি ভয়ঙ্কর ভেল্কিই না-সে দেখাচ্ছে! আরও খেতাব, আরও উপাধি চলে আসা উচিত। যারা দেশী কুত্তম টাইটেল দিয়েছিল, তারা এক্ষণি বঙ্গ বাঘিনী উপাধি অনায়াসে প্রদান করতে পারে! দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয় তার এই রুদ্ররূপে যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়ে তাকে গণতন্ত্রের মানসকন্যা আখ্যায়িত করে আর একবার ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করতে পারে!

সবার উপরে চাটুকারিতা সত্য তাহার উপরে নাই! গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বুলি কপচানো অনেক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শিখণ্ডিদের মুখে এখন টু শব্দটি শোনা যাবে না। বিড়াল নয়না নিঠুরা ললনার ভ্রূভঙ্গীতে তারা তটস্থ।

অবশ্য আওয়ামী লীগের জন্য এটা কোন নতুন নয়।

'৫৭ সালে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে যখন ন্যাপ গঠিত হচ্ছিল, আজকের প্রধানমন্ত্রীর পিতার নেতৃত্বে সেদিন ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলেও একই ধারার আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। তখন ছিল লাঠি, হকিস্টিক বা বেশির পক্ষে ছুরি-চাকু। আজ তাঁর কন্যার আমলে বন্দুক, পিস্তল, রাইফেল আর বোমার ছড়াছড়ি।

মাওলানা ভাসানী সেদিন যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিলেন আজ বেয়াল্লিশ বছর পরে টাঙ্গাইলের আর এক কৃতিসন্তান কাদের সিদ্দিকী অনুরূপ পরিস্থিতিতে নিপতিত। সময়ের সঙ্গে আক্রমণের তীব্রতা ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি কেবল বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

পাপ বাপকেও ছাড়ে না। অপকর্মের এই ঋণ একদিন তাকে শুধতে হবে। পিতাকে যেভাবে তার প্রতিদান দিতে হয়েছিল, কন্যাকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হয় কিনা ইতিহাসের এই অমোঘ শিক্ষাটি প্রত্যক্ষ করার অভিলাষে অনেকে অপেক্ষায় রয়েছে।

আওয়ামী লীগের মধ্যে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে এ ধরনের ব্যক্তি এখনও রয়েছে। কিন্তু অরাজনৈতিক এই এক মহিলার আঁচলের তলায় তারা কী করে চাপা পরে আছে বোধগম্য নয়। প্রবীণ নেতৃবৃন্দের যদি বিন্দুমাত্রও মর্যাদাবোধ ও স্বকীয়তা অবশিষ্ট থাকত তা হলে এই অসহিষ্ণু মহিলার খুঁড়ে আত্মসমর্পন না করে তারা একটা অবস্থান গ্রহণে সক্রিয় হত। কিন্তু একপাল নিরীহ ভেড়ার রাজত্বে শিংওয়ালা এ ভেড়িটার তীব্র গুঁতায় আর সকলে ধরাশয়ী। নিষ্বুরস খাইয়ে তাদের কোন প্রকারে জীবনে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। স্বাধীন চিন্তা-চেতনার কোন অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

পণ্ডিত মশাই চলিয়া গেল, জুতা জোড়া পড়িয়া রহিলেন—অবস্থাটা অনেকটা তা-ই।

গত কালকের কাগজেই আরও পড়লাম তারা একটা পুস্তক বাজেয়াপ্ত করেছে। মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া রচিত 'মোনাফিকের শবযাত্রা' নামে গ্রন্থটির প্রকাশনা, বিক্রয়, বিতরণ, সংরক্ষণ ও মুদ্রণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে পুস্তকটিতে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কন্যার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। চমৎকার গণতন্ত্র! চমৎকার বাকস্বাধীনতা! মুক্তচিন্তা ও চেতনার কী ব্যাপক সুবন্দোবস্ত!

মত প্রকাশের স্বাধীনতা ততক্ষণ অবশ্যই দেওয়া যাবে যতক্ষণ তারা প্রশংসায় উদ্বাহু নৃত্য করবে। পক্ষে লিখলে অতি উত্তম, বিপক্ষে লেখা সহ্য করা হবে না। বিরূপ সমালোচনা করলেই খড়্গ নেমে আসবে। জিন্দাবাদ অবশ্যই চাই কিন্তু নিন্দাবাদ কক্ষনোই নয়। এই না-হলে আওয়ামী গণতন্ত্র! সমালোচনা এখানে নৈব নৈব চ।

উল্লিখিত পুস্তকটি আমার পড়ার সুযোগ হয়নি। ওটা নিষিদ্ধ হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কোন পত্রপত্রিকা বা পুস্তক নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তার কাটতি বেড়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় যেসব প্রকাশনার বিষয়ে সামান্য অনুসন্ধিৎসা লক্ষ করা যায়, কোন কারণে একবার সেটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে মানুষের আগ্রহ অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পায়। গোপনে সেটি প্রকাশিত হয়ে বাজার সয়লাব করে ফেলে। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ মানব সমাজের আদি পিতা-মাতার উত্তরাধিকার সূত্র ধরে মানব স্বভাবে মজ্জাগত হয়ে আছে। পিন-আপ করা ম্যাগাজিনে কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা থাকার কারণে অপ্রাপ্ত-বয়স্কদের মধ্যে তার বিপুল চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।

সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে লেখক ও প্রকাশকের প্রতি প্রকারন্তরে পৃষ্ঠপোষকতাই প্রদর্শন করল। এখন সকলেরই আগ্রহ লক্ষ্য করা যাবে বইটিতে কী আছে জানার। একসময় নিষিদ্ধ হওয়ার কারণেই সেটি বহুল প্রচারিত হবে এটা শতসিদ্ধ। এই বইটির কথা দিয়েই এটা বিবেচনা করা যায়। কত বই পুস্তক প্রতিদিন প্রকাশিত হচ্ছে, প্রকাশনা উৎসব হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় রিভিউ বের হচ্ছে। সমালোচকদের মূল্যবান প্রবন্ধ বের হচ্ছে, কিন্তু সেসব সম্বন্ধে কৌতূহল খুবই সামান্য। অনেক সময়ই সেসব চোখ এড়িয়ে যায়। কিন্তু এই সংবাদটি ঠিকই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিষয়টি সম্বন্ধে অন্যদের বক্তব্যও কর্ণগোচর হয়। বইটি ও তার লেখকের নাম মনে গেঁথে যায়। এখন থেকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকব যদি কোনভাবে এই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করা যায়।

আদি পিতা-মাতা সেটি আস্বাদন করেই পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁদেরই পথ ধরে আমরাও আজ এখানে বিরাজমান। এই চিত্রনাট্যের

www.pathagar.com

পশ্চাতে একটিমাত্র গন্ধম ফল জড়িত, সেকথা মানবকুলের বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ নেই।

আমার আপত্তি অবশ্য অন্যত্র, বিষয়টি নীতিগত। পক্ষে লিখলে অতি আদরণীয়, আর বিপক্ষে লিখলেই নিন্দনীয়। শুধু তা-ই নয়, ক্ষমতার মদে মত্ত হয়ে তাকে বাজেয়াপ্ত করা বা নিষিদ্ধ করা অনৈতিক। পক্ষে-বিপক্ষে সকলেরই বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা থাকতে হবে। প্রয়োজনে এক বক্তব্যকে শত বক্তব্য দ্বারা খণ্ডন করা যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই অন্যের স্বাধীন চিন্তা-চেতনায় বাধ সাধা যাবে না। নিয়ন্ত্রণের বাধা-নিষেধের অক্টোপাশে মুক্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ রুদ্ধ করা যাবে না।

সরকারের যদি পাল্টা বক্তব্য থাকে বা একটি বিশেষ রচনা সম্বন্ধে যদি মৌলিক আপত্তির কারণ থাকে বা ধর্মীয় ও জাতিগত মূল্যবোধের বিরোধী বলে প্রতিপন্ন হয় তা হলে একটি বিচার বিভাগীয় বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত করে লেখক-প্রকাশককে তাদের বক্তব্যের পক্ষে যৌক্তিকতা প্রদর্শনের সুযোগ প্রদান করা উচিত। বোর্ডের বিবেচনায় যদি রচনাটি আপত্তিকর হয় তা হলে সেটি প্রকাশনা থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তারপর বোর্ডের রায়ের উপর ভিত্তি করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

সরকার একতরফাভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সমর্থ হলে ভিন্ন মতাদর্শ প্রকাশের পথে চরম অন্তরায় সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। উদার, বাক-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ও পরমতসহিষ্ণু একটি সরকার হলে পরিস্থিতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে না। অন্যথায় জটিলতা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে।

সন্ত্রাস সর্বস্ব, নগ্নভাবে দলীয়করণকৃত, পরমতে অসহিষ্ণু এবং বিরোধীদের প্রতি খড়্গহস্ত আজকের এই অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে এই অস্ত্রটির অপব্যবহার রোধের কোন পন্থা দৃশ্যগোচর হচ্ছে না।

জীবন্ত মানুষের কবর এই জেলখানা। মানুষ এখানে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকে। এর মাঝেও কখনও অবিশ্বাস্যরূপে বৈচিত্রের সমারোহ ঘটে। এই ছাব্বিশ সেলেই একদা অভিনীত হয়েছিল তেমনি একটি হৃদয়ঘটিত নাটিকা। বিষয়টি কল্পনা বহির্ভূত হলেও বাস্তবে রূপলাভ করে কারাগারের ইতিহাসে এক নবতর অধ্যায়ের সূচনা করে।

www.pathagar.com

হান্নান একসময় আমাদের কর্মী ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করে স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করছিল। নম্র স্বভাবের অতি সুবোধ এই অধ্যাপকটিকে দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইবে না-যে কোন হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সে সম্পৃক্ত থাকতে পারে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেও একটি হত্যা মামলায় জড়িয়ে যায় ।

ঘটনা পরম্পরায় অধ্যাপক হান্নানকেও মামলায় চার্জশীট করা হয়। ফলে যা হবার তা-ই হয়। হান্নানের দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড হয়ে যায়। যদিও বাদীপক্ষ এবং এলাকার জনসাধারণ ভালো করেই অবগত যে, অধ্যাপক হান্নানকে অন্যায়ভাবে মামলায় জড়িত করা হয়েছে।

হান্নানের কপাল মন্দ। কোর্টে দাঁড়িয়ে সাক্ষীগণ যা বলে যায় তাতে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় না। মামলার গুণগত বিষয় এখানে আলোচ্য নয়। ছাব্বিশ সেলের অধ্যাপক হান্নান এই উপখ্যানের নায়ক। কারাগারে প্রেম, এটিই এখানে উপজীব্য।

হান্নানের সঙ্গে আমার পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল।

জাতীয় পার্টির সরকারের পদত্যাগের পর যখন তদানীন্তন সরকার আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তখন সর্বাগ্রে আমাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আনা হয়। পনেরো সেলে তখন থাকি। সেসময়ই কারা ইতিহাসের বৃহত্তম বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সতেরো দিনব্যাপী সে বিদ্রোহের কাহিনীও এখানে আলোচ্য বিষয় নয়।

হান্নান তখন ছাব্বিশ সেলে থাকে। ডিভিশনপ্রাপ্ত কয়েদি। জেল বিদ্রোহের ফলে সে পনেরো সেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায়। জেল অভ্যন্তরে তখন কোন রক্ষী ছিল না, কোন নিয়ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নই আসে না।

বিদ্রোহ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পরও হান্নান ব্যবস্থা করে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে জেলখানার কর্তারা তাকে ভালো জানত। সে কারণেই তার পক্ষে আমার সঙ্গে যোগযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল।

একহারা সুন্দর দীর্ঘদেহের অধিকারী হান্নান। সম্মুখের দিকে সামান্য ঝুঁকে বিনয়াবনত হয়ে চলা-ফেরা করে। মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি লেগেই আছে।

ঘটনার সূত্রপাত খুবই অভাবনীয়।

ছাব্বিশ সেলের পশ্চিম দেয়াল ঘেঁষে উর্দু রোড। পূর্বে এই রাস্তার উপর ছোট ছোট দোকান ছিল। অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেখানে এখন চার-পাঁচ তলা বিশিষ্ট্য এক-একটি ইমারত গড়ে উঠেছে। নিচের তলায় দোকান, উপরের তালাগুলোতে অধিকাংশই বাসগৃহ। দুই-একটি গার্মেন্টস কারখানাও রয়েছে। পশ্চিমের একটি বড় দালানের উঁচু তলার একটি তরুণী

www.pathagar.com

হান্নানকে কি করে যেন আবিষ্কার করে। হান্নানের প্রতি তার লক্ষ্য ও আগ্রহের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

কি করে কি হয়ে যায় কেউ ভালো করে বলতে পারে না। কবি বলেছেন, প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে ভুবনে। জেলখানাটাও ভুবনের একটা অংশ বইকি! এখানেও সদাব্যস্ত প্রেমের দেবতা তার প্রজাপতি প্রেরণ করে একটি বন্দি যুবক ও একটি মুক্ত যুবতীর হৃদয়কে একসূত্রে গ্রথিত করে দেয়। কখন এই দুটি অপরিচিত নর-নারী একে অপরের সঙ্গে কথা না-বলে, না-জেনে-শুনে পরস্পরের হৃদয়ে স্থান করে নেয়। কেবল ভাবেরই আদান-প্রদান ঘটে না, মন দেওয়া-নেওয়া সাঙ্গ হয়। হৃদয় বিনিময়ের এই কাহিনী সবিস্তারে বলা কঠিন। হান্নানকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সে স্বভাবসুলভ হাসির সঙ্গে মুখ নত করে ফেলে। প্রজাপতির নিবন্ধজনিত কাহিনী আর শোনা হয় না।

ছাব্বিশ সেলের তদানীন্তন বাসিন্দারা জানায়, প্রথমে তারা কিছু বুঝতে পারেনি। পরে তাদের মধ্যে দু'-একজন লক্ষ্য করে, হান্নান এসে বারান্দায় দাঁড়ালে বা সিঁড়িতে দাঁড়ালেই উর্দু রোডের একটি বাড়ির ত্রিতলের বারান্দায় একটি তরুণীর আবির্ভাব ঘটে।

অন্য সময় তেমন লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু হান্নানের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই তরুণীটি বারান্দায় উদয় হয়। মনে হয়, যেন উভয়ের মধ্যে ইথারের সহায়তায় একটা যোগাযোগ সাধিত হয়েছে। কিছুদিন পর্যন্ত পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়, তারপর নিরীক্ষণ ও পর্যালোচনার পালা চলে। পরে কিঞ্চিত সপ্রেম হাসি ও ইশারার প্রচলন হয়। দেখতে দেখতে তাদের মধ্যে একটা আকার-ইঙ্গিতের ভাষা চালু হয়ে যায়, যা কেবল দয়িত আর দয়িতা ব্যতীত বোধগম্য হয় না।

একজন আর একজনকে চেনে না, জানে না। এতদূর থেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণও সম্ভব নয়। তবুও হৃদয়ের উত্তাপ বিনিময় হতে কোন বিঘ্ন ঘটে না। তারা পরস্পরকে ভালোভাবেই মন আদান-প্রদান করে। এ ধরনের ঘটনা আর কখনও শোনা যায়নি। একটা সিনেমা দেখেছিলাম, যেখানে দুটি নর-নারীকে পাশাপাশি দুই ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তাদের যোগাযোগের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু একসময় দেখা গেল দেয়াল ঠুকে ঠুকে তারা নিজস্ব ভাষা প্রবর্তন করে ফেলেছে এবং অচিরেই পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে। সুদীর্ঘ কাহিনীর শেষ অঙ্কে তারা মুক্তি লাভ করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে।

হান্নানের ঘটনা প্রায় অনুরূপ হলেও উপসংহার ভিন্ন।

মানুষ অভ্যাসের দাস। দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে সে অনেক কিছুই রপ্ত করতে পারে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির ফলে অনেক কিছুই জয় করা যায়।

www.pathagar.com

অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। বসে বা দাঁড়িয়ে নিদ্রা যেতে প্রায়ই দেখা গেলেও হাঁটা অবস্থায় কাউকে নিদ্রা যেতে দেখা সচরাচর ঘটে না। কিন্তু আমি দেখেছি। জেলখানার অভ্যন্তরে দেওয়াল প্রহরারত একজন রক্ষী হাঁটতে হাঁটতে নিদ্রা যেতে পারত। দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় তার এই অবিশ্বাস্য অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। প্রথমে শুনে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে তার নাক ডাকা শুনেছি। তার হুঁশ নেই। সে চোখ মেলেই নির্দিষ্ট গণ্ডিতে একবার যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে। মনে হবে সে স্বাভাবিক কর্তব্য পালন করছে। কিন্তু তার হাঁটার পথে গিয়ে দাঁড়াতেই সে ঘাড়ের উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঘুম ছুটে যায়।

ঊর্ধ্বতন কেউ পরিদর্শনে এসেছে মনে করে সে তটস্থ হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে। পরক্ষণেই বুঝতে পারে, বন্দিদের কেউ তার অবিশ্বাস্য নিদ্রা-প্রতিভা প্রত্যক্ষ করার জন্য এসে ঘুমের ব্যাঘাত করেছে।

হান্নানও উর্দু রোডের তরুণীর প্রেমের বিষয়টিও সুদীর্ঘ ও দুঃসাধ্য প্রচেষ্টার ফসল। দূর থেকে সংকেতিক যোগাযোগ স্থাপনের এটা এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। প্রেম- প্রণয়ের ক্ষেত্রের প্রচলিত রীতি যথা, দেখা-সাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা বা পত্রবিনিময়ের সুযোগ ব্যতিরেকেই তাদের মন দেওয়া-নেওয়া সারা।

জেল-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তিতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় প্রদান করা হয়। প্রত্যেকেরই শাস্তির মেয়াদ হ্রাস পায়। দীর্ঘ মেয়াদের শাস্তিপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে দশ বছরের রেয়াত প্রদান করা হয়। ফলে অনেক কয়েদি মুক্তি পেয়ে যায়। অধ্যাপক হান্নানও যথারীতি মুক্তি পেয়ে বহির্জগতে পা ফেলে।

বিদায় মুহূর্তে কারাগারের ফেলে যাওয়া বন্ধুদের জন্য যেমন তার অপরিসীম যাতনা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি করে মনের অভ্যন্তরে অচিরেই প্রিয়া-মিলনের আনন্দানুভূতি তাকে উজ্জীবিত করে তোলে। হরিষে বিষাদের এক অপূর্ব সমন্বয় হান্নানের চেহারায় সেদিন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল।

সেবার তিন মাসের মধ্যে আমারও মুক্তির নির্দেশ এসে যায়। হাইকোর্ট আমার আটকাদেশকে বেআইনী ঘোষণা করে। আমিও যথাসময়ে মুক্তি পেয়ে যাই।

অনেকদিন পর গুলশানের নিজের বাসস্থানে বসবাসের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠি। এতদিন ছিলাম সরকারি বাসায়, মিন্টু রোড ও বেইলী রোডের বাংলোতে। আমার নিজের বাসায় বিদেশী ভাড়াটে ছিল। তাদেরকে বিদায় করে সেখানে স্থায়ীভাবে বাসের উদ্যোগ নিই।

নতুন করে ঘর-সংসার পাতার অনেক ঝামেলা। এর মাঝেই একদিন হান্নান এসে উপস্থিত। জিজ্ঞেস করি, তোমার প্রেম-কাহিনীর খবর কী?

www.pathagar.com

সে লজ্জিত হাসিতে নিবেদন করে, ভাইজান, অনেক দূর গড়িয়েছে। দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, কথাবার্তাও প্রায় শেষ। ওদের অভিভাবকদের সম্মতি আছে। এক্ষণে আমার পক্ষ থেকে অভিভাবকদের যোগাযোগের পালা। ভাইজান, আপনাকে যেতে হবে।

প্রথম থেকেই কেন যেন বিষয়টি আমার খুব একটা মনঃপুত হয়নি। তরুণ-তরুণীর প্রেম কোন নতুন বিষয় নয়। এ বিষয়ে আমার কোন সংস্কার নেই। বরং দুটি হৃদয়ের ভালোবাসার বিনিময় সুদৃষ্টিতেই দেখে থাকি।

কিন্তু হান্নানকে যতটুক জানি, সে একজন সত্যিকার অর্থে নির্বিরোধী লোক। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সরল অন্তঃকরণের একজন সৎচরিত্রের মানুষ সে। পক্ষান্তরে উর্দু রোডওয়ালী স্থানীয় এক আদি নগরবাসীর কন্যা। এরা উঠতি ধনী।

হান্নানের পরিবারে শিক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতির যে আবহাওয়া বিরাজমান, নব্য সম্পদশালী এই ঢাকাইয়া পরিবারে তা সহজলভ্য নাও হতে পারে। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে এবং প্রেমের উন্মাদনায় এই মুহূর্তে এসব প্রশ্ন বিবেচনায় না-এলেও সময়ান্তরে প্রাধান্যে আসার সম্ভাবনা। কেবল দেহগত মিলন হলেই হয় না, মন-মানসিকতা, শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টিতে সমন্বয় সাধিত না-হলে অনেক ক্ষেত্রেই দু'য়ে-দু'য়ে চার হয় না, সুষ্ঠু দাম্পত্য গড়ে ওঠে না।

হান্নানকে স্নেহ করি। তার মঙ্গল কামনা করি। কেবল ভাবি, সে যদি অন্য কোথাও মন দিত হয়ত তার জন্য শুভ হত। তাকে সব খুলে বলাও দুষ্কর। সে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাকে বারণ করার প্রশ্ন আসে না। করলেও তা গ্রহণযোগ্য না-হওয়ারই সম্ভাবনা। আবার তার ভবিষ্যত ভেবে চিন্তিত না-হয়ে পারি না। সে যে খুবই সৎ মানুষ! সব কথা সরাসরি খুলে না-বললেও আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব তাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করি। বলি, তোমরা দু'জন দুই প্রান্তের মানুষ। শেষ পর্যন্ত ব্যাটে-বলে না-হলে, মনের মিল না-ঘটলে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে। জীবন একটাই, আজকাল মানুষ আর একাধিক বিবাহে যেতে চায় না। এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে আর একবার সবকিছু ভেবে দেখার জন্য তাকে অনুরোধ জানাই।

সে বিনম্র কণ্ঠে বলে, ভাইজান, আমি ওকে কথা দিয়েছি।

আর কথা বাড়াই না। তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেদিনের মতো বিদায় করি। আমার পক্ষে তার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। অন্য কোন কারণ নেই। মন থেকে সাড়া পাচ্ছি না। তাকে সে কথা খুলে বলি। সে দুঃখিত হলেও বলে, ভাইজান, আপনি আমার জন্য এতটা দুঃশ্চিন্তা করছেন দেখে একদিক থেকে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছি। আপনি আমার সত্যিকারের শুভাকাঙ্ক্ষী।

বলি, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

হান্নান বিদায় নেয়। এরপর সে আসে একেবারে বিয়ের দাওয়াত নিয়ে। সব সুস্থির হয়ে গেছে। আমাব টেবিলে কার্ডটি রেখে সবিনয়ে বলে, কার্ড দেওয়া বাহুল্য। আপনাকে কিন্তু বিয়েতে আসতেই হবে। অন্যথায় আমি যারপরনাই দুঃখ পাব।

হান্নানকে সরাসরি প্রত্যাখান করি না। আশ্বাস দিই, একেবারে অনিবার্য না হয়ে পড়লে আমি যাব।

বিয়ের দিনও সে এক ফাঁকে এসে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়, ভাইজান, আপনি উপস্থিত না-হলে আমি ছোট হয়ে যাব!

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সব অনুরোধ উপেক্ষা করে আমি বিয়েতে অংশ নিতে যাই না। আমার স্বভাবে এই একটা বিদ্‌ঘুটে ব্যাপার রয়েছে। কোন বিষয়ে একবার যদি মন বিকল হয়ে যায়, তাকে সুস্থির করা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। হান্নানের বিয়েতে যাওয়া হয় না। বেশ কিছুদিন সে অভিমান করে থাকে। তারপর একদিন এসে উপস্থিত হয়।

বলে, ভাইজান, বিয়েতে আপনার অনুপস্থিতি আমাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে। আপনি কি একবার আমার স্ত্রীকে দেখা করবেন না? আপনি যদি আমার বাসায় না-যান, অনুমতি দিলে তাকে এখানে নিয়ে আসি!

মুখে হাসি এনে বলি, নিশ্চয়ই যাব, এখন বল বউ কেমন হয়েছে? প্রেমিকা আর স্ত্রীর মধ্যে কিন্তু দুস্তর ব্যবধান। জীবন কেমন চলছে?

সে নিচের দিকে তাকিয়ে বিনীত কণ্ঠে বলে, আপনাদের দোয়ায় ভালো চলছে। আপনি ভালোই জানেন, বউ আমার নিজের পছন্দের। সেও আমাকে পূর্বাহ্নে পছন্দ করেছে। স্বল্পদিনের বিবাহিত জীবনে এখনও কোন অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়নি।

শুনে সুখী হলাম। তোমার প্রথম বিবাহ বার্ষিকীতে যাব বা ইতিমধ্যে সন্তান জন্ম নিলে তাকে দেখতে যাব। তোমার ভাবীকে নিয়ে আমিই যাব। নতুন বউকে দাওয়াত করে আসব।

হান্নান খুশি মনে বিদায় হয়।

অনেকদিন তার দেখা নেই। নতুন জীবন। নববধুর কা-তব কান্তা শেষ হতে সময় নেয়। যৌবনের চাওয়া-পাওয়ার দাবি মিটাতেই চোখের নিমিষে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

প্রায় মাস ছ'য়েক পর হান্নানের পুনরায় আবির্ভাব। আজ তাকে অনেক বিষণ্ন এবং ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মনে হয় ইতিমধ্যে তার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে। বয়স বেশ বেড়ে গেছে বলেও মনে হয়। জিজ্ঞেস করি, কি হান্নান, তোমার এরূপ বিধ্বস্ত দশা কেন?

সে আমার সামনে একটি চেয়ারে উপবেশন করে নিশ্চুপ থাকে। বিশেষ কথা বলে না।

www.pathagar.com

আবার জিজ্ঞেস করি, বউ কেমন আছে? তোমাদের বিয়ের রেজাল্ট আউট হতে আর কত বিলম্ব? কোন সুসংবাদ আছে?

সে ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে বলে, ভাইজান, শেষ পর্যন্ত আপনার কথাই ঠিক হল। বিয়ে টিকছে না।

সেকী? এর মধ্যেই অশুভ কথা বলছ কেন? কী হয়েছে?

সে অনেক কথা, প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি। ক্রমে অনুধাবন করি তার আর আমার মধ্যে প্রচুর ব্যবধান। সংসার করতে গিয়ে উপলব্ধি করি আমাদের রুচি, পছন্দ, মানসিক গঠন সবই ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা যেন দুই মেরুর বাসিন্দা।

বিষয় কি? একটু খুলে বল তো!

আমাদের দু'জনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই অমিল। আমি যে রঙয়ের পোশাক পরিধান করতে চাই বা তাকে যেভাবে সাজাতে চাই, তার পছন্দ সম্পূর্ণ বিপরীত। জবরজং রঙ ও মূল্যবান পোশাকাদি তার কাম্য। এদিকে আমি পছন্দ করি সাধারণ সাদামাটা পরিচ্ছদ। মাংসাশী ঘরের মেয়ে সে। কাবাব, বিরিয়ানী প্রভৃতি গরম খাবার পছন্দ করে, অথচ আমার ভালো লাগে নিত্যকার মাছ ভাত শাক-সবজি ও ডাল। প্রতিটি বিষয়ে মতের ভিন্নতায় দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক আনন্দঘন মুহূর্তগুলো বিঘ্নিত হতে থাকে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার এমন কি দরজা-জানালার পর্দার রঙ নিয়েও আমাদের মতানৈক্য হয়। আমি চাই তাকে নিয়ে মহিলা সমিতির হলে নাটক দেখতে। সে চায় ধুম-ধারাক্কা ধরনের সিনেমা দেখতে। উপলব্ধি করি ক্রমেই আমাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে এবং আমরা পরস্পরের প্রতি বিষময় দৃষ্টি বর্ষণ করা শুরু করি। আমি পড়াশোনায় অধিক সময়ক্ষেপণ করি। সে সাজ-সজ্জা, ঘুম, খাওয়া না-হয় সিনেমা ও গানে মশগুল। সিনেমা-পত্রিকা ব্যতীত সে অন্য কিছু পড়তে পারে না। বলেন ভাইজান, কি করে তার সাথে জীবন কাটাব? এক কথায়-দুই কথায় প্রায়ই প্রকাশ্যে খিটিমিটি বাধতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে তার পিত্রালয়ে চলে যায়। সবকিছু নিয়ে যায়। প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

বল কি? এর মধ্যেই এতদূর গড়িয়েছে? তোমাদের কোন সন্তানাদি আসবার সম্ভাবনা নেই তো?

না ভাইজান! আল্লাহ্ তা'আলা অনেক মেহেরবান। সেদিক থেকে আমাকে ঝামেলা মুক্ত রেখেছেন। এখন তাকে পরিত্যাগ করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

হান্নানকে বুঝাবার চেষ্টা করি, একবার বিয়ে করে হুট করে বিচ্ছেদের চিন্তা বাঞ্ছনীয় নয়। আরও চেষ্টা করতে হবে সমন্বয় সাধনের। একেবারে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। এখনও সময় আছে। হয়ত ধীরে ধীরে দু'জনের মধ্যে

www.pathagar.com

একটা সমঝোতা গড়ে ওঠতে পারে। একটি সন্তান এলে দু'জনের মাঝে চেনা-জানার পরিধি ও বন্ধন আরও দৃঢ়তর হবে।

হান্নান সব শোনে। বলে, ভাইজান, সেদিনও আপনার কথা শুনিনি। আজও শোনা সম্ভব হবে না। আমি বুঝে ফেলেছি, আপাতত মন্দ মনে হলেও সমগ্র জীবন এই দুর্বহ বোঝা আমার পক্ষে টানা সম্ভব নয়।

সেদিনও হান্নান বিষণ্ন মন নিয়ে বিদায় নেয়। অনেকদিন আর আসে না। শুনেছি তার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে।

পরম করুণাময়ের নিকট একান্তে সেদিন প্রার্থনা করি, এবার যেন সে আর ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না-করে। যে তার জন্য কল্যাণ ও শান্তি বয়ে আনবে এমন কাউকে যেন আল্লাহ্ তাকে জুটিয়ে দেন।

সেদিন আজম ছাব্বিশ সেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

হঠাৎ করে সেদিন আবার তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে প্রেরণ করা হয়েছে। একটি নাট্য কন্যাসহ তাকে গুলশানের এক রেস্টহাউস থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুনেছি, পরে সে মেয়েটিকে বিয়ে করে। মামলার অভিনবত্ব দেখেই প্রতীয়মান হয় কর্তাদের ইচ্ছা হয়ত ভিন্ন। কথায় কথায় তাফালিং করার জন্য খ্যাত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইদানীং ঘোষণা দিয়েছে ময়েজউদ্দীন হত্যা মামলা তারা পুনরায় বিচারে প্রেরণ করবে। তারা অতীব ক্ষমতাশালী! ইচ্ছা করলেই সব পারে। যে মামলার বিচার হয়ে দণ্ডপ্রাপ্তগণ সাজা খেটে মুক্তি পেয়েছে এবং যেখানে রাষ্ট্রপতি অবশিষ্ট দণ্ডাদেশ ক্ষমা করেছে সেখানে চামচিকার দল জল মাপার অভিলাষ ব্যক্ত করে!

ক্ষমতা তাদের হাতে। তারা সবই পারে। দিনকে প্রয়োজনে রাতে পরিবর্তন করতেও তাদের কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

আজম জিজ্ঞেস করে, ভাই, আপনি তো একজন আইনজীবী। ওরা কি সে মামলা পুনরুজ্জীবিত করতে পারবে?

বলি, আমার বিবেচনায় সেটা সম্ভব নয়। তোর দণ্ডাদেশ রাষ্ট্রপতি মওকুফ করেছে। এখন আর কারো কিছু করার নেই। তবে বলা যায় না, এটা আওয়ামী সমঝোতার সরকার। তোরা আবার এই সরকারের বি-টিম। ভালোবেসে তোর উপর সামান্য স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিতে পারে!

আজম সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সে এখন মিজান-মঞ্জুর সরকারি জাতীয় পার্টিতে রয়েছে। সে বলে, আমাকে দল থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার না-করলে আমি ওখানে যেতাম না। আমাকে ঠেলে পাঠানো হয়েছে।

হয়ত তাই। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে অনেক কিছুই ঘটে থাকে।

আজমের সাথে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের।

www.pathagar.com

সে যা-ই হোক, আমাদের প্রচেষ্টায় একসময় রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে অবশিষ্ট দণ্ড ক্ষমা করে আজমের মুক্তির আদেশ জারি করা হয়। সহবন্দিদের কারাগারে রেখে প্রধান আসামী সর্বাগ্রে মুক্তজীবনে প্রবেশ করে।

'৯৮-তে আমি গ্রেপ্তার হবার বহু পূর্ব থেকেই আজমের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। সেদিন কাগজে তার গ্রেপ্তারের সংবাদ পড়ি। অচিরেই সে এসে ছাব্বিশ সেলে আমার সঙ্গে দেখা করে। তাকে রাখা হয়েছে পুরনো বিশ সেলে।

জিজ্ঞেস করি, তোর ডিভিশন হয়নি, নিশ্চয়ই নানা অসুবিধা হচ্ছে। বল, আমি কি সাহায্য করতে পারি?

সে বলে, ভাই, কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। সব ম্যানেজ করে ফেলেছি। আমি আর আপনাদের দেশের মিলন এক ঘরে রয়েছি। আমরা রান্না করে খাই।

সেকি? রান্না ঘর ব্যতিরেকেই রান্না! সেটা কি করে সম্ভব?

এখানে সবই সম্ভব। টাকা ফেললে হয় না-এমন কাজ নেই। ঘরেই সব আয়োজন করা হয়েছে। সপ্তাহে হাজারখানেক টাকা ঢালতে হয়। আমার মতো মিলনও জেলের অন্ধি-সন্ধি জানে। পূর্ব থেকেই সব ব্যবস্থা করা আছে।

এর মধ্যে মিলনও একদিন এসে সাক্ষাৎ করে গেছে। সে আওয়ামী লীগ করে। সে কারণে আমাকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলত। সেবার ব্যাংককে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পীদের এক অনুষ্ঠানে সেখানকার বাংলাদেশী ছেলেরা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যায়। সেই অনুষ্ঠানে মিলনের সঙ্গে দেখা। সে আমাকে অত্যন্ত সমাদর করে। অনুষ্ঠানের ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমার পরিচয় পেয়ে যখন মঞ্চে উঠে কিছু বলার জন্য এবং শিল্পীদের সঙ্গে ছবি ওঠানোর জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে তখন মিলনের সাহায্যেই তাদেরকে নিবৃত করতে সক্ষম হই। আমি সেখানে কোন প্রচার চাইনি। ছবিতে দেখা নায়ক-নায়িকাদের নাচ-গান আর অভিনয়ের প্রতিই আমার আকর্ষণ ছিল।

অনেকদিন পর মিলনকে দেখে খুশি হলাম। আওয়ামী লীগের সমর্থক হয়েও এখন সে কেন কারাগারে এই প্রশ্ন করতে সে যে কাহিনী বলল তা রীতিমতো কৌতূহল উদ্দীপক।

সে বলে, প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে বেগম জিয়া সম্বন্ধে যে অশালীন বক্তব্য রেখেছে, সে নিজে কি? সেও যে একই পথের পথিক!

অনিসন্ধিৎসু হয়ে উঠি, বিষয় কি?

সে জানায়, হাসিনা খালেদার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ইঙ্গিতে অসংগত কটাক্ষ করেছে। কিন্তু তারও যে সেসব রয়েছে সে কথা অনেকে না-জানলেও আমরা জানি।

তোমাকে জেলে পাঠাল কে?

www.pathagar.com

তার সহকারী একান্ত সচিব, সকল কাজের কাজী। এই লোকের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে আমাদেরকে এখন জেল খাটতে হচ্ছে।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই!

আজমের কাছে শুনতে পেয়েছি, মিলন একসময় আমার খুব সমালোচনা করত। এখন সে ভক্তে পরিণত হয়েছে। সে নাকি বলে, মোয়াজ্জেম ভাই চিরদিন সত্য বলেন। উত্তরাধিকারের রাজনীতির যে বিরোধিতা তিনি করেন সেটা খুবই প্রশংসনীয়।

কেবল একজন বুঝলে হবে না। এদেশের সকল মানুষ যেদিন এ সত্য উপলব্ধি করবে সেদিন কথাটি স্বার্থকতায় পর্যবসিত হবে।

মুরগী মিলন বলে পরিচিত মিলন একসময় মুক্তি পেয়ে বাইরে যায় এবং সেদিন ঢাকা কোর্ট প্রাঙ্গণে মামলায় হাজিরা দিতে গিয়ে দ্বিপ্রহরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়। তার কাজকর্মও স্বচ্ছ ছিল না। শুনেছি, নানা দুই নম্বরী ধান্দার সাথে সে জড়িত। যুবলীগের একজন মাতব্বর সদস্য, দাপটই আলাদা। স্বীয় জগতের শত্রুতার ফলেই হোক বা ইদানীং কালে তথ্যসমূহ উদ্ঘাটনের কারণেই হোক তাকে অচিরেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়।

আজ সবকিছু সুন্দর চোখে দেখার মুহূর্ত সমাগত। আজ এই মাসের শেষ দিন, এই বছরেরও শেষ দিন। শুধু তা-ই নয়, সময়চক্রে আজ শতাব্দী এবং সহস্রাব্দেরও শেষ দিন।

সারা পৃথিবী জুড়ে আগামী দিনটিকে স্বাগত জানাবার বিপুল আয়োজন। পত্রিকা পড়ে সব অবগত হই। হতদরিদ্র এই বাংলাদেশেও তার অভিষেকের কর্মসূচির অভাব নেই। কুঁজারও কখনও চিত হয়ে শোবার বাসনা জাগে। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত এই দেশের অধিকাংশ মানুষের অন্ন-বস্ত্র আর বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই। সে দেশেও রাষ্ট্রীয় কোষের অজস্র অর্থ ব্যায়ে মহা ধূম-ধামে সহস্রাব্দের সূচনালগ্ন পালনের আয়োজন করা হয়। একমণ দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চনা যেভাবে সমস্ত দুধ নষ্ট করে ফেলে, একইভাবে সমস্ত অনুষ্ঠান কলঙ্কিত হয়ে পড়ে মধ্যরাতে উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের হাতে তরুণীদের অকথ্য লাঞ্ছনায়। সমগ্র জাতি ছি-ছি করে ওঠে। বলিহারি এই তথাকথিত তরুণীদেরকে! শহীদ মিনারে, দোয়েল চত্বরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, একুশের বই

www.pathagar.com

মেলায় সর্বত্র বারংবার নিদারুণ লাঞ্ছনার স্বীকার হয়েও তাদের উৎসাহের ঘাটতি নেই। কেউ বলে, এ ধরনের আচরণের প্রত্যাশাতেই নাকি তাদের আরও আগমন। বিশ্বাস করতে মন চায় না। কিন্তু খেল দেখাচ্ছে মহিলা নেতৃত্বাধীন এই সরকার। শতেক ধর্ষণের রেকর্ড সম্বলিত ক্যাডার সরকারি ছত্রছায়ায় নারীর শাসনামলেই নারী নির্যাতনের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করতে যাচ্ছে। বাকসর্বস্ব সরকারের লম্বা-চওড়া হুমকি আর ধমকি ব্যতীত আর কোন প্রতিকার দৃষ্টিগোচর হয় না। শেষ অবধি হয়ত কিছু নির্দোষ মানুষকে জড়িয়ে মামলা ঠুকবে। এ কাজে তাদের জুড়ি নেই!

প্রচলিত বহু আইন থাকার পরও শুধুমাত্র বিরোধীদের শায়েস্তা করার মানসে নতুন করে কালাকানুন তৈরি করছে। পিতা করেছিল স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট, কন্যা করেছে জননিরাপত্তা আইন। উদ্দেশ একই। কিন্তু আল্লাহ্‌র যখন হুকুম হয়ে যাবে কোন কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। পিতা পায়নি, মেয়ে পায় কি করে! পিতার পক্ষে এটা বলা চলে, দেশ ও জাতির জন্য সংগ্রামে তাঁর অবদান ছিল। কিন্তু কন্যার কি আছে? পাপ যদি বাপকে না-ছাড়ে, মেয়েকে ছাড়বে!

নতুন শতাব্দী বা সহস্রাব্দের সূর্যোদয় আমরা দেখব না। সে-সময় আমরা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের ছাব্বিশ সেলে ছোট্ট কুঠুরিতে লক-আপে থাকব। বিশ্বের শত শত কোটি মানুষ যা সানন্দে প্রত্যক্ষ করবে, আমরা তা থেকে বঞ্চিত হব।

বিগত শতাব্দীর '৯৮ সালে সেই যে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করে আনা হয়, অদ্যাবধি আমরা সেখানেই আছি। শুনেছিলাম, পচা শামুকে পা কাটে। তা যে এমনভাবে কাটে জানা ছিল না। অভিযোগের কোন ভিত্তি নেই। জনা দুই মিথ্যাবাদী টি-বয় বা খেদমতগার যোগাড় হয়। ভয়-ভীতি প্রদর্শনে বা অর্থে বশীভূত হয়েও তারা স্বাক্ষ্য দিতে সম্মত হতে পারে। তারা পুলিশের কাছে বলেছে, ঘটনার রাতে আমাদেরকে বঙ্গভবনে দেখা গিয়েছিল। ব্যাস, আর কথা নেই।

সেই জবানবন্দির বলেই আমাদের মতো মানুষদের আজ বছরের পর বছর এই অসহনীয় কারা-নির্যাতন ভোগ করতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সময়টি ছিল সেনাপতি খালেদ মোশাররফের নিয়ন্ত্রণে। বঙ্গভবন তখন তার দখলে। '৭৫-এর নভেম্বরের প্রথম দিন থেকেই বঙ্গভবন বা রাষ্ট্রপতির সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তা সত্ত্বেও নির্জলা মিথ্যার বেসাতি করা হয়, ২রা নভেম্বর দিবাগত রাতে আমাদেরকে নাকি সেখানে দেখা গিয়েছে। দেখা যখন গিয়েছে তখন এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই জড়িত! যতই চিন্তা করি, অবিশ্বাস্য মনে হয়। এত অমূলক, ভিত্তিহীন এবং তুচ্ছ অজুহাতে এভাবে মানুষকে হয়রানি করা যায়! শুধু তা-ই না, জুজুর ভয় দেখিয়ে আর জেলহত্যার নৃশংস কাহিনী পুনঃপুনঃ

www.pathagar.com

বর্ণনা করে ওরা বিচার বিভাগকেও প্রভাবিত করে। জেলহত্যার বিচার আমরাও চাই, সর্বদাই চেয়ে এসেছি। কিন্তু কে শোনে কার কথা! আমরা জামিন পাই না।

নতুন শতাব্দী বা সহস্রাব্দকে তাই সাগত জানানো গেল না। মানব জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি আর কল্যাণে নিয়োজিত সকলের প্রতি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। বুকভরা যে অসহনীয় দুঃখ আর জ্বালা আমাদেরকে তিলে তিলে দগ্ধ করছে তা-ই নিয়ে পরম করুণাময়ের নিকট আজ শুধু এই প্রার্থনা, নির্দোষ মানুষকে এভাবে অপদস্ত ও নিপীড়ন করার ক্ষমতার এই দম্ভকে নিরুপায় আমরা সহ্য করলেও সকল ক্ষমতার অধিকারী প্রভু তুমি ক্ষমা করো না। আজকের দিনের বিদায় এবং আগামী সূর্যোদয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত শতাব্দীর অন্যতম নিকৃষ্ট অত্যাচারীদের অনিবার্য পতনের শুভক্ষণটি যেন অত্যাসন্ন হয়ে ওঠে, আজকের এই মুহূর্তে অন্তরিনাবদ্ধ অসহায় এই বন্দিদের এই আকুতি।

শুনেছি, নির্যাতীতের অন্তরনিহিত প্রার্থনা তাঁর দরবারে ব্যর্থ হয় না। আরও শুনেছি, মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ্ তা'আলার আরশের মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

কারাগার কেবল শাস্তিভোগের কেন্দ্রই নয়, অপরাধ সংশোধনের অন্যতম উদ্দেশ্য নিয়ে সভ্যতার প্রথমলগ্নে সেদিনের সমাজপতিরা এটা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু আমাদের মতো দেশে এটা সভ্য মানুষের সেই প্রচেষ্টার প্রতিফলন ঘটেনি। বরং বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। শাস্তিভোগের কেন্দ্র ঠিকই রয়েছে, অপরাধের সংশোধনের স্থলে পাকা অপরাধীতে রূপান্তরিত করার এটা একটা ট্রেনিং কেন্দ্র বললে অত্যুক্তি হবে না।

প্রথমবার কারাভ্যন্তরে ভয়-ভীতি খানিকটা দুর্বল করে দিলেও অচিরেই তা কাটিয়ে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ওস্তাদদের সাহচর্যে এসে সব দুর্বলতার অবসানই কেবল ঘটে না, যেখানে অপারগতা রয়েছে বা অপরাধ বিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যুৎপত্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে, মহাজনদের সঙ্গে বসবাস করে অচিরেই তাদের সকল ট্রেনিং সমাপ্ত হয়ে এই জগতের একজন চিহ্নিত দিকপালে পরিণত হয়। অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মুরব্বীদের দ্বারা নিশ্ছিদ্র ট্রেনিংপ্রাপ্ত নব্য অভিযাত্রীরা অধিকতর উদ্দীপনায় নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সমাজে অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

www.pathagar.com

রাজনীতির ক্ষেত্রেও তা-ই।

নিজেকে দিয়েই বিচার করতে পারি। প্রথমবার '৫২ সালে যখন এলাম, তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। হাফপ্যান্ট পরিহিত ক্ষুদে বন্দি। মাসব্যাপী প্রথম কারাবাসের পর আমার মনে হল, একেই বলে জেলখানা! সকল ভয়-ভীতির নিরসনে অচিরেই পাকা 'জেলবার্ডে' পরিণত হলাম। রাজনীতি অস্থিমজ্জাতে মিশে গেল। তারপর থেকে জেলখানা আর আমাকে পরিত্যাগ করল না। নতুন শতাব্দীর মাহেন্দ্রক্ষণেও কারা-অভ্যন্তরে বসেই জাবর কাটছি।

কারাগার যেমন অপরাধীদের আস্তানা, তেমন এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্তাব্যক্তিরাও তার চাইতে কম অপরাধপ্রবণ নয়। এটা যেন দুর্নীতির একটা আখড়া। অপরাধ জগতের হেড-কোয়ার্টার বলা যেতে পারে। দণ্ডভোগীদের শায়েস্তা করার জন্য যাদের রাখা হয়েছে বা যারা তাদের উপর বিধি-নিষেধের প্রয়োগকর্তা, তাদের অপরাধের বিচার করবে কে! ক্ষেত সামলাতে বেড়া দেওয়া গেল, বেড়া সামলাবে কে!

অভিশপ্ত এই দেশের সমাজ জীবনে ঐতিহ্যগতভাবেই এটা বিরাজমান।

নগদপ্রাপ্তির বিনিময়ে রক্ষকই ভক্ষক বনে যায়। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি যেখানে এতদ্রূপ সেখানে কারাগারগুলোর পরিস্থিতি বর্ণনাযোগ্য নয়। লোকে বলে এখানকার ইট, পাথর, টেবিল, চেয়ারও পয়সার জন্য ওৎ পেতে থাকে। কয়েদিদের মাথাপিছু বরাদ্দ সঠিকভাবে তাদের কাছে পৌঁছে না। তা না-হলে এই দুর্মূল্যের বাজারেও তাদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থে মোটামুটি সঙ্কুলান হবার কথা।

সকলেই জানে প্রথম সিংহভাগ খাবে কন্ট্রাকটার। তাকে আবার বিভিন্ন দরজা পার হয়ে অকুস্থলে পৌঁছতে হয়। বহু দেবতাকে তুষ্ট করে দু'পয়সা উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হয়। আইজি, ডিআইজি, সুপার, জেলার, ডেপুটি এবং আরও বহুবিধ কর্তাকে খুশি করে শেষ অবধি বাজারের নিকৃষ্টতম বস্তুটি কয়েদিদের জন্য ভিতরে প্রেরিত হয়। প্রায় ক্ষেত্রেই অস্বাস্থ্যকর এবং মানুষের খাদ্যের অনুপযোগী খাবারও নগদ নারায়নের জোরে উপযুক্ত বিবেচিত হয়ে যায়। চাঁদির ক্ষমতা অপরিসীম।

কয়েদিরাও মানুষ, তাদের খাদ্যদ্রব্য অস্বাভাবিক নিম্নমানের হওয়া কেবল অবাঞ্ছনীয় নয়, অমানবিকও বটে। কিন্তু কয়েদিদের খাবার পরীক্ষা করলে কোন মানদণ্ডই এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।

প্রায়ই দেখা যায় কাঁকর, ধান ও মরা চাল মিশ্রিত দীর্ঘদিন গুদামজাত থাকার কারণে ব্যবহার অনুপযোগী মোটা দুর্গন্ধময় চাল তাদের জন্য বরাদ্দ হয়ে আসছে। রান্নার গুণে সেগুলো আরও অখাদ্যে পরিণত হয়।

শাক-সবজি মৌসুম পার হয়ে গেলে মানুষ আর যখন খেতে চায় না, সেসব তখন ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। এবং একবার শুরু হলে আর

www.pathagar.com

শেষ হতে চায় না। হয় দীর্ঘদিনের শুকনো, না হয় পচনোন্মুখ সেসব তরি-তরকারি শাক-সবজি তাদের ভোগে লাগে। ডাল, দুধ, তেল, মশলা সবকিছুই সবচাইতে নিকৃষ্ট জিনিসটি এখানে আনা হবে। এসব যে কয়েদিদের খাদ্য! বাছ-বিচারের প্রশ্ন আসে না।

এ বিষয়ে ডিভিশনপ্রাপ্তরা কিছুটা ভাগ্যবান। তাদের বরাদ্দও বেশি। তদুপরি পৃথক চৌকায় রান্না হয়। দেন-দরবার করে অনেক ক্ষেত্রেই তারা সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয়। তাদের ঘাঁটানো ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ সহজেই অনুমেয়। যুগ যুগ ধরে তারাও এর জন্য কম সংগ্রাম করেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওইসব সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন সাধারণ আদম সন্তানদের। সাপ্তাহিক মাছ-মাংসের দিন তাদের ডায়েট চোখে দেখা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু'-একটি টুকরা সামান্য কালো রঙয়ের তেল-ঝোলে হাবুডুবু খায়। বরাদ্দের পরিমাপের অনেক কম ওদের ভাগ্যে জোটে। বাধ্য হয়ে ওরা কেউ কেউ নগদ টাকা দিয়ে ডায়েট ক্রয় করে খেয়ে থাকে। দশ টাকায় এক ডায়েট, বিশ টাকায় আর একটু উন্নত। প্রতিবেলার জন্য এ রেটে টাকা দিতে হয়। যাদের অর্থ রয়েছে তাদের পক্ষে এটা সম্ভব, কিন্তু অধিকাংশ হতভাগ্যকেই যা দেওয়া হয় সেটুকু নীরবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। যেন-তেন প্রকারের একটা তরকারি বা পাতলা ডাল দ্বারা তারা খাবার সমাধা করে থাকে।

সে কারণেই ডায়েট কেনা-বেচা ইদানীং চালু। পূর্বে এসব খুব একটা প্রত্যক্ষ করা যেত না। তখন টাকা-পয়সা রাখাটাই ছিল বড় অপরাধ। এখন তার উল্টা। না রাখাটাই অপরাধ। টাকা ছাড়া কাম পাস হবে না, ঘুমাবার স্থান পাওয়া যাবে না, ডায়েট মিলবে না, কর্তারা খুশি থাকবে না। তারা খুশি না থাকলে রেয়াত মিলবে না। কাজেই প্রচুর অর্থ তাদের রাখতে হয়। পূর্বকালে অনেক যন্ত্রণা করে গলায় ফোঁকর তৈরি করে কাঁচা টাকা-পয়সা রাখা হত।

আর এখন হাজার হাজার টাকা রাখা হয়। ভিতরে টাকা ছাড়া এক পা চলা সম্ভব নয়। শতকরা বিশ টাকা মাশুল দিয়ে যত খুশি টাকা রাখার ব্যাংকও জেলে মজুত আছে। এমন কোন হীন কাজ নেই যা এরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে করে না। ছোঁকরাবাজীর মতো জঘন্য পাপ এখানে ডাল-ভাত। কয়েদিদের মধ্যে এক শ্রেণীর দালাল রয়েছে যারা সুশ্রী চেহারার কমবয়সী ছেলেদের দিয়ে এ ব্যবসা পরিচালনা করে। ছাপাইয়াদের থাকার আস্তানায় একটা ঘর আলাদা করে নিয়েছে এ কাজের জন্য। ওরা বিদেশী কয়েদিদেরকে বিশেষ করে খদ্দের বানাতে চেষ্টা করে। সঙ্গোপনে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, ফকিং লাগবে?

উপার্জিত অর্থ ছোঁকরা, দালাল এবং সংশ্লিষ্ট প্রহরীর মধ্যে বন্টন হয়।

কয়েদিদের পাক্ষিক দেখা বা ইন্টারভিউ হচ্ছে ডেপুটি এবং অন্যান্যদের

www.pathagar.com

অর্থ উপার্জনের মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রতিদিন প্রায় ষাট-সত্তর হাজার টাকার আমদানী হয় বলে কয়েদিরা অনুমান করে। হাজার পনেরো অধস্তনদের মধ্যে বিতরণ করে বাকিটা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। প্রতি দেখার জন্য ষাট টাকা দিতে হয়। চল্লিশ যাবে ডেপুটির পকেটে, বাকিটা যারা স্লিপ কাটবে বা ডাকবে তাদের।

অন্যান্য খাত বাদ দিয়ে কেবল রুটিন দেখায় প্রতিদিন তাদের যা উপার্জন হয় সেটা কল্পনার অতীত। শোনা যায় কেস টেবলির কর্তা বড় সুবেদারের দৈনিক আয় কয়েক হাজার টাকা। সর্বদা গেটে অবস্থানরত সার্জেন্টের আয়ও অকল্পনীয়। অধস্তনদের আয় কম হলেও নিতান্ত কম নয়। প্রহরারত মিয়াসাবদের ভাগ্যে সামান্য কিছু জুটলেও সেটা ধর্তব্য নয়। কয়েদিদেরকে রিপোর্টের ভয় দেখিয়ে যা আয় করা যায়!

পাক্ষিক দেখার নিয়মের মাঝে অর্থবানদের জন্য কোন বিধি নেই। টাকা ফেললে দিনে দু'-তিনবার দেখার ব্যবস্থা হয়। জেল কার্যালয়ের এক অংশে অর্থের বিনিময়ে মাদকদ্রব্য সেবনেরও ব্যবস্থা আছে বলে শোনা যায়।

মাদকদ্রব্য ভিতরে নিয়ে আসলে আরও বেশি অর্থ প্রদান করতে হয়। সেক্ষেত্রে ডেপুটিদের সঙ্গে সুবেদার-জমাদারকে খুশি করতে হয়। টাকা ফেললে সাধারণ কয়েদি-হাজতীরা ডিভিশনপ্রাপ্তদের মাঝে বসেই ইন্টারভিউ করতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতি দেখায় হাজার বা বারো শত টাকা প্রদান করতে হয়।

সাধে কি আর প্রচুর ঘুষ দিয়ে এই চাকরির প্রলোভনে বুদ্ধিমানেরা ছুটাছুটি করে!

জেলখানায় প্রায় সকলেরই সশ্রম কারাদণ্ড। কিছু না কিছু কাজ করতে হয়। অন্তত কাগজে কলমে তার উল্লেখ থাকে। সুবেদার, জেলর সাহেব পরিতৃপ্ত হলে হালকা কাজ বা বিনা কাজে ঘুরে বেড়াবার ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যায়। তাদেরকে খুশি করতে না পারলে কষ্টকর দফায় ঠুকে দেওয়া হয়। অনেক দরিদ্র কয়েদি সামান্য খাবারের লোভে মেথর, ঝাড়ুদার বা সাফাইয়ের কাজ গ্রহণ করে। বাইরে তারা কখনও এসবের ধারে-কাছেও ঘেঁষত না। নিয়ম আছে, এসব কাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ না করলে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পেটের তাড়নায় ওদেরকে বাধ্য হয়ে সে কাজ করতে হয়।

যারা রান্না ঘরের সঙ্গে বা গুদামের সঙ্গে বা কোন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে জড়িত থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে তাদের পোয়া বারো। কর্তাদের সেবা করে তল্পিবাহকের সুবিধা ষোল আনা আদায় করে নেয়। বাবুর্চি, তার সহকারী এবং রান্নার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিরা সুযোগমতো ডায়েট বিক্রি করে দু'পয়সা কামিয়ে থাকে। আমাদের চোখের সম্মুখে ডিভিশনের রন্ধনশালা থেকেও সে ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটে না। সাহেবদের চোখে ধূলা দেওয়া কোন

www.pathagar.com

সমস্যাই নয়, তারা বিশেষ দৃষ্টিও দেয় না। প্রহরী তো তাদেরই দলভুক্ত। ওরা দশ টাকায়ই খুশি।

টাকা খেয়ে গুদামী মিয়াসাব বা কেরানীর পক্ষে এক সেরের স্থলে পাঁচ সের দিয়ে দেওয়াও অসম্ভব নয়। পূর্বে কয়েদিরা সিভিল পোশাক পরিধান করতে পারত না। এখন জেলের পোশাকের সঙ্গে দিব্যি নিজস্ব পোশাকের সংমিশ্রণ ঘটেছে। কর্তৃপক্ষ কয়েদি পোশাক সরবরাহ করে কুলিয়ে উঠতে পারে না। যে কয়েদির সঙ্গতি নেই, নিয়মের কড়াকড়ি কেবল তারই জন্য, প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে পারলে এখন আর এখানে তেমন অসুবিধা হয় না। অতীতে জেলখানায় উপার্জনের পথ ছিল। অর্থকরী কাজের বিনিময়ে যৎসামান্য পারিশ্রমিক দেওয়া হত। কয়েদিরা মুক্তির সময় স্বোপার্জিত সে-অর্থ সঙ্গে নিয়ে যেত। এখন বাড়ি থেকে টাকা এনে জেল খাটতে হচ্ছে। পরিস্থিতির উন্নতি অবশ্যই হয়েছে!

এখন ধূমপানে কোন অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় না। টাকা ফেললে যে কোন ব্যান্ডের সিগারেট মিলবে। পূর্বে একজন একটা বিড়ি টানলে অন্যজন তার ধুঁয়া উদ্গীরণ করে ধূমপানের সাধ মিটাত। এখন রীতিমতো ছোটখাটো বাজার বসে যায়। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কাজ চলে। অন্যান্য সব বিষয়ের মতো একটি নির্দিষ্ট শোবার স্থানের জন্যও মাসে অর্থ প্রদান করতে হয়। মানুষ কেবল বাড়ছে। এক-একটা ছোট্ট কুঠুরিতে গাদাগাদি করে ওদের অনেকজনকে রাখা হয়। হাত-পা মেলে শুতে পারে না। বাধ্য হয়ে টাকা দিয়ে শোবার স্থানের ব্যবস্থা করতে হয়।

জেলখানার মান দিনকে দিন নিম্ন দিকে গড়াচ্ছে। ইংরেজের আমল দেখিনি। শুনেছি অবস্থা অনেক উন্নত ছিল। পাকিস্তানের আমল দেখেছি বারবার, আর দেখলাম স্বাধীন দেশের কয়েদখানা। জিয়া সাহেবের আমলে দু'বার, তার স্ত্রীর সময়ে দু'বার এবং বঙ্গবন্ধু তনয়ার কালে এবার দীর্ঘকাল ধরে দেখছি। শতাব্দী পার হয়ে গেল, আমরা ঠিকই পড়ে আছি। দিনকে দিন অবস্থার অবনতি ঘটছে। সে চাকচিক্য, সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সে বাগান ও ফুলের সমারোহ এখন অতীতের কাহিনী। মাঝে মাঝে চুনকাম করে পথের প্রান্তগুলো বা গাছের গোড়াগুলোকে সাময়িক সাদা রঙ দিয়ে চর্চিত করা হয়। জেলের সামগ্রিক জরাজীর্ণ দশা দৃষ্টিগোচর হতে বাধ্য।

কয়েদিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাদের মধ্যে নানাবিধ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। খোস্-পাচড়া খুবই ব্যাপক। পেটের পীড়া, আমাশয় লেগে থাকে। অস্বাভাবিক মশার উপদ্রবে ওদের জীবন দূর্বিসহ।

জেলখানার একদার বোখার আউর পেট গড়বরের হাসপাতালের অবস্থায় নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অবশ্য কেন যেন এখন ডিভিশনপ্রাপ্তদেরকে

www.pathagar.com

সেখানে স্থানান্তরিত করতে অনীহা বোধ করে। তারা ভালোমানুষি প্রদানের উৎসাহী নয় বলেই হয়ত কর্তাদের এ মানসিকতা। ব্যক্তিগতভাবে আমি চিরদিনই চিকিৎসকদের সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে এসেছি। তাদের মধ্যেও ভালো-মন্দ রয়েছে।

সাধারণ শ্রেণীর কয়েদি-হাজতীদের ক্ষেত্রে যার অর্থ আছে তার জন্য হাসপাতাল অভয়ারণ্য। অবস্থাপন্ন লোক, কিন্তু ডিভিশন পায়নি, সে নগদ অর্থের বিনিময়ে অসুস্থ না-হয়েও হাসপাতালে স্থান পাবে। একটি খাট বা বিছানার অনেক মূল্য। লোক বুঝে, সামর্থ বুঝে, দরদস্তুর করে রেট স্থির হয়। অবস্থা বিশেষে মশারিও জোটে। অর্থ না-থাকলে মেঝেতে অবস্থান। অর্থের বিনিময়ে যত্ন কেনার সুব্যবস্থা সর্বজনবিদিত।

সেখানকার খাবারও স্বতন্ত্র। পৃথক রান্না হয়। তার জন্যও ভিন্ন করে মূল্য প্রদান করতে হয়। বর্তমান রেট, ডিম খেলে সপ্তাহে সত্তর টাকা, ডিম ব্যতীত পঞ্চাশ টাকা। হাসপাতালে একটি সিট বা চিকিৎসা বা পথ্য সবকিছুর জন্যই নগদের ব্যবস্থা করতে হয়। মেট পাহাড়া, রাইটার বা কয়েদিদের ভাষায় দালালের সহায়তায় সব ব্যবস্থা হয়ে থাকে। রোগের সার্টিফিকেট দেওয়া, কোর্টে যেতে আনফিট করা, শারীরিক অবস্থার রিপোর্ট প্রদান সব প্রশ্নেই ভালো অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হয়।

জেলখানা, তুমি কার?

যার টাকা আছে তার!

তাই আজিজ মোহাম্মদ ভাইয়ের মতো অর্থবান অতিথির যখন আগমন ঘটে তখন এদের আনন্দ আর ধরে না। শুনেছি, সামান্য সুযোগ-সুবিধা ও খানাপিনার ব্যবস্থার বিনিময়ে এক জেলর একটি কারখানার মালিক বনে গিয়েছে। আর এক অর্থশালী বন্দি নাজিউর রহমান মঞ্জু যখন হাসপাতালে ছিল তার অর্থ ব্যয়ে সেখানে ডিস্টেম্পার করার ব্যবস্থা হয়েছিল। পুরাতন পাখা বদলে নতুন সিলিংফ্যান আনা হয়েছিল। এ সময় কর্তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন ত্রুটি দেখা যায় না। চিরাচরিতভাবে তারাও বলতে পারে, ফেল কড়ি, মাখ তেল। আমি কি তোমার পর?

জেলখানায় যারা কাজ করে তাদের মন-মানসিকতারও তারত্যম ঘটে থাকে। মানব-চরিত্রের ভালো দিকগুলো বোধহয় তারা জেল গেটের বাইরে রেখে আসে। অবিরাম নোংরা ঘেঁটে মনের মধ্যে নিশ্চয়ই তার প্রভাব পড়ে থাকে। আলোর দিকে না তাঁকিয়ে অন্ধকারের দিকেই তাদের দৃষ্টি অধিকতর প্রসারতা লাভ করে। অনুধাবন ও অনুভূতি অবক্ষয়ে পর্যবসিত হয়।

বন্দিদের দেখা-শুনা করার কাজে তাদের অভিভাবকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও তারা নিজেদেরকে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মনে করে থাকে। জেলখানাটা যেন তাদের পৈত্রিক জমিদারী। তাদের সামান্য সদিচ্ছায়

www.pathagar.com

এখানকার বন্দিদের জীবন অনেকটা সহনীয় হতে পারে একথাটি তারা ভেবে দেখে না। মুখ থেকে 'হ্যাঁ' শব্দটি তিরোহিত হয়ে 'না' শব্দের প্রাবাল্য পরিলক্ষিত হয়। ঢালাওভাবে সকল কর্মকর্তা সম্বন্ধে হয়ত এ সমস্ত কথা খাটে না। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই রয়েছে। কথায় বলে, ব্যতিক্রমই নিয়মের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কর্মকর্তাদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কারণে কারাবাসিরা অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করে সেসবের উল্লেখই এখানে স্বাভাবিক। অন্যখাতে হয়ত কেউ কেউ প্রশংসার দাবিদার, কিন্তু সেসব এখানকার কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। মন্দের প্রবল স্রোতধারায় ভালো বিলীন হয়ে যায়।

ছাব্বিশ সেলে পেছনের নর্দমা বয়ে অসহ্য দুর্গন্ধ আসে। একদা সবচাইতে সুন্দর সেলটিতে এখন মানুষের কাঁচা মল-মূত্রের গন্ধে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। অস্বাভাবিক গরমের মধ্যেও পিছনের জানালাটি বন্ধ রাখতে হয়। তাতেও গন্ধ তেমন কমে না। সাপ্তাহিক পরিদর্শনে এলে আমরা সুপারকে বারবার বলেও ইস্পিত ফল লাভ করি না। এখানে-ওখানে কত কাজ হচ্ছে। এই দুর্গন্ধ বন্ধ করা মোটেই অসাধ্য নয়। কিন্তু সদিচ্ছার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অথবা আমাদেরকে কষ্ট দিয়ে ওরা কিছুটা বিমলানন্দ উপভোগ করে থাকে।

একদিন হঠাৎ নিয়ম চালু হল, আমাদের সব খাবার কেরিয়ারে করে কেস্ টেবিলে যাবে, ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখবে, তারপর সেসব ফিট হয়ে ফিরে এলে আমরা খেতে পাব। নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থা। কেউ যদি আমাদেরকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে! আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে যাতে সময়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো যায়। কিছুদিন নিরীক্ষণ করলাম। তারপর একদিন ফাইলে সুপারকে নিবেদন করলাম, কয়েদিদের দ্বারা খাবারগুলো নেওয়া-আনা করাটা নিশ্চয়ই পুরোপুরি নিরাপদ হতে পারে না। কারো অসৎ উদ্দেশ্য থাকলে কেস টেবিলে আনা-নেওয়ার পথে তা বাস্তবায়িত হতে পারে। খাবারগুলো বারবার না-টেনে একজন ডাক্তার কিচেনে এসে পরীক্ষা করে গেলেই কি সহজ হয় না! সময় কম ব্যয় হবে, ঝামেলাও কমবে।

সুপার হেসে বলে, আপনার যুক্তির জবাব জাতীয় ভিত্তিতেই কেউ দিতে পারে না, আমি কোন ছার!

দু'দিন পর সে অবশ্য অনুরোধটি গ্রহণ করে। ডাক্তার কয়েকদিন কিচেনে এসে খাবার পরীক্ষা করে যায়। কয়েকদিন পর আবার সবকিছু ভুলে যাওয়া হয়। সবই পূর্ববৎ চলতে থাকে।

জেলখানায় মাঝে মাঝেই এ ধরনের নানা হুজুগের সৃষ্টি হয়। হঠাৎ কিছু নিয়ম-রীতি জারি হল। কত না হৈচৈ! সামান্য এদিক-সেদিক হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে! দিন কয়েক পর আবার যে কে সেই। আদি নিয়ম পুনর্বহাল।

www.pathagar.com

প্রচণ্ড গরমে টিকতে না-পেরে পাখার জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হলে নিজেই কোর্টকে জানালাম। পাখা প্রদানের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করলাম। কোর্ট নির্দেশ দিল আমাদেরকে নিজেদের টেবিল ফ্যান ব্যবহার করতে দেওয়া হোক।

কর্তৃপক্ষ কোর্টের সেই আদেশ অমান্য করতে পারে না। কিন্তু আদেশটি তাদের মনঃপূত হয় না। সরকারের কাছে সেই আদেশ পাঠিয়ে একটা বাহানা সৃষ্টি করে দীর্ঘকাল ধরে আমাদেরকে পাখা থেকে বঞ্চিত রেখে আনন্দ পায়। পরে যখন কোর্টে আমরা আদালতের আদেশ অমান্যের প্রশ্ন তুলি তখন স্পেশাল পিপি সিরাজুল হকের মধ্যস্থতায় পাখা সরবরাহের ব্যবস্থা হয়।

কর্তৃপক্ষকে বলতে ইচ্ছা করে, সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি! কিন্তু ইচ্ছা করলেও বলা চলে না। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। মনের ব্যথা গোপন করে বরং ফ্যানের জন্য সুপারকে ধন্যবাদই জানাতে হয়।

রোজা আসায় নিবেদন করি, বাবুর্চি এসে যদি ভোররাতে আমাদের ভাতটা রান্না করে দিয়ে যায়, তা হলে সেহরিতে আমাদের কিছুটা সুবিধা হয়। অতীতে এমন হয়েছে।

সুপার প্রথমে স্বীকার করে কাজটা অসম্ভব নয়। কিন্তু পরিষদবর্গ হয়ত তাকে ভিন্ন পরামর্শ দেয়। পরে সে অপারগতা প্রকাশ করে। দুপুরে প্রস্তুত করা ইফতারি, রাতের খাবার ও সেহরী একসঙ্গে পরিবেশন করা হয়। ভোররাতে সেসব খাওয়ার যোগ্য থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়। কষ্ট করে আমরা রোজা করছি।

মানুষকে কষ্ট দিয়ে ওদের কি সুখ বুঝি না!

রোজার শুরুতে সালেহা একটা বড় ফ্লাস্ক নিয়ে এসেছিল। শীতে গরম পানি রাখা যাবে। সেটা আমাকে দেওয়া হয় না। সুপার বলে, ওটা ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক। তাকে বলি, সব ফ্লাস্কই ভ্যাকুয়াম ফ্লাস্ক। আপনার তো কোন অসুবিধার কারণ নেই, কোন বিদ্যুৎ খরচের প্রশ্নও জড়িত নেই। তবুও কেন দিচ্ছেন না? রোজাদারকে কষ্ট দিলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন না।

সে জুৎসই উত্তর দিতে না পেরে তাড়াতাড়ি সরে পড়ে।

এক ডেপুটি আমার এলার্ম ঘড়িটিও আটকে দিয়েছিল। সুপারকে বলে তার সুরাহা করতে হয়। আরেকজন মশার কয়েল দিতে অস্বীকৃতি জানায়। উপস্থিত আইবির লোককে খুশি করার মানসে আমার স্বাক্ষাৎপ্রার্থীদের সঙ্গে অহেতুক অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করে। প্রতিকার মিলে না। মানুষকে কষ্ট

www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য এদের বিশেষ কোন ট্রেনিং দেওয়া হয় কিনা জানি না। তবে এটা ঠিক, একসময় আমরা ক্ষমতার শিখরে ছিলাম। আমাদেরকে কিঞ্চিৎ টাইট দিয়ে, মাথার উপরে ডাণ্ডা ঘুরিয়ে, ক্ষমতা প্রদর্শন করে ওরা নিশ্চয়ই খানিকটা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করে থাকে।

এদের মনোবৃত্তি অনুধাবন বেশ কষ্টকর। জেল লাইব্রেরীতে আমার লেখা 'নিত্য কারাগারে' বইটি রয়েছে। বইটির আগ্রহী পাঠকের অভাব নেই। অতিরিক্ত ব্যবহারে প্রথম দিকের কয়েকটি পৃষ্ঠা বিনষ্ট হয়েছে। লাইব্রেরীয়ান আমাকে সে কথা জানাতে সালেহাকে বলেছিলাম, নতুন সংস্করণের দুটি বই জেল লাইব্রেরীতে দিও।

সে বই নিয়ে আসে।

ওরা নোকতা তোলে, একটা দরখাস্ত দিয়ে বই দুটি জেল লাইব্রেরীকে দানের জন্য সুপারের অনুমতি চাইতে হবে।

বলি, এই বই আপনাদের লাইব্রেরীতে ক্যাটালগভুক্ত। নতুন বই নয়। এর জন্য আবার দরখাস্ত কেন?

তারা বলে, দরখাস্ত দিন।

আমি জানিয়ে দিই, দরখাস্ত দেওয়ার অভ্যাস আমার নেই।

তারা বই দুটি অবশ্য ফেরত দেয় না। যতদূর বুঝি, পরিবার-পরিজন নিয়ে তা পড়ছে।

তবুও পড়ুক, দুই নম্বরী করে হলেও বই পড়া ভালো।

জেলখানার একটি সেল রয়েছে পিজি হাসপাতালে। তৈরি পুত্রের পিতা হওয়া খুবই সহজ। পিজি হাসপাতালও কলমের এক খোঁচায় গাল ভরা এক নাম নিয়ে বঙ্গবন্ধু হাসপাতাল হয়ে গেল। সারা দেশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখ, বঙ্গবন্ধু কিছু নির্মাণ করে গিয়েছেন কিনা, নতুবা তোমরা কিছু একটা নির্মাণ করে পিতার নামে উৎসর্গ কর কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু সাইনবোর্ড পাল্টাবার যে দৃষ্টান্ত তোমরা স্থাপন করলে সময়ে অন্যেরা যদি তা অনুসরণ করে তখন গাল ফুলিয়ে গোস্বা করে বল না, অমুকের প্রতি অসম্মান করা হল, তমুকের অবদানকে খাটো করা হল। এসব আহজারি তখন তোমাদের মুখে শোভা পাবে না।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। যুক্তির কোন কথা কর্কশকণ্ঠি মুখরা রমনীর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। সে যা-ই হোক, আমরা হাইকোর্টে জামিনের প্রার্থনা করলে আমাদের আইনজীবীগণ মামলার গুণগত দিকসমূহের বাইরেও আমাদের বয়স ও নানাবিধ ব্যাধির উল্লেখ করে মানবিক কারণে জামিনের পক্ষে জোর আবেদন জানায়।

তারা আমাদের দরখাস্ত নামঞ্জুর করে আদেশ প্রদান করে যাতে আমাদেরকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

কথায় আছে, তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল, আনিয়া দিল আধখানা বেল। বিষয়টা অনেকটা সেরকমই দাঁড়ায়। জামিনের পরিবর্তে পিজির প্রিজন সেলের একটা খাটিয়া পেলাম। নাকের বদলে নরুন।

ছাব্বিশ সেলে দিনমানে অন্তত হাঁটা-চলার ব্যবস্থা রয়েছে। ডায়াবেটিসের রুগীর জন্য সেটা অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু হাসপাতালের প্রিজন সেলে ছোট্ট একটি ক্যাবিনে সর্বক্ষণ শুয়ে থাকতে হবে। জামিনের পরিবর্তে তারা আমাদেরকে অধিকতর কষ্টদায়ক প্রিজন সেলে প্রেরণের আদেশ দিয়ে আমাদেরকে বলে দিল, বয়স হয়েছে? স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না? যাও, লোহার কটে গিয়ে শুয়ে থাক।

হাইকোর্টের আদেশ। তদুপরি আমরা বন্দি, করার কিছু নেই। ওখানে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়লাম। পিজি হাসপাতাল নতুন নামকরণের পর রাজনৈতিক আবর্তের এক বিশেষ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। দাদা-দিদিদের খুবই রমরমা। বেছে বেছে সমমনা চিকিৎসক-নার্সদের সেখানে আনার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এতদিন করাইয়ের মাঝে ভাজা-ভাজি হচ্ছিলাম, এবার সেটি উল্টে দিয়ে আমাদেরকে জ্বলন্ত উনুনে নিক্ষেপ করা হল। অবশ্য ভাগ্যক্রমে যে প্রফেসরের অধীনে আমাদের ভর্তি করা হয়েছিল সেই সিরাজুল হক সাহেব নিজে এবং তার সহকারী ডাক্তার আরেফীন সহানুভূতি ও চিকিৎসকোচিত মনোভাব নিয়েই আমাদের গ্রহণ করে। কিন্তু সমস্ত প্রতিষ্ঠান জুড়ে বৈরীতার পাশাপাশি যেখানে অব্যবস্থা, বিশৃঙ্খলা এবং নিয়ম-নীতি না-মানার আওয়ামী প্রতিযোগিতা সেখানে মুষ্টিমেয় সদিচ্ছাপ্রসূত চিকিৎসকের কতটুকুইবা করণীয় রয়েছে। তাছাড়া সেটাও জেল। কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ কারা-কর্তৃপক্ষের, চিকিৎসার দায়িত্ব হাসপাতালের। দ্বৈত শাসনের মধ্যে কত যে বিড়ম্বনা আর বেড়িজাল তার কোন সীমা নেই।

ডাক্তার সাহেবরা বিধান দিয়ে যায়, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ লিখে যায়। জেল কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জমাদার আর ইনচার্জ মিয়াসাব গলদঘর্ম হয়ে ছুটোছুটি করে সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য। তারা ছোট চাকুরি করে, কোথাও বিশেষ পাত্তা পায় না। আমাদের কাছে এবং ডাক্তার সাহেবদের কাছে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। প্রতিটি বিষয়ের জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে টাকা জমা দিতে হয়। টাকা জমা করে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করে ডাক্তার-টেকনিশিয়ানদের উপস্থিতির নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করে আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাসমূহ সমাধা করতে ওদের নাভিশ্বাসের উপক্রম হয়। আমরা আবার পর্দানসীন। চলনদার ব্যতীত চলতে পারি না। কারা-রক্ষীদের বাইরেও সাদা পুলিশ এবং মেট্রোপলিটান পুলিশের একবহর আমাদেরকে প্রহরা দিয়ে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নিয়ে যায়। হাসপাতালে আগত রোগী এবং দর্শনার্থীদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নিজেদেরকে চিড়িয়াখানার আজব জন্তু বলে মনে হয়।

ডাক্তার হাসপাতালে বসে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেও ওষুধ আসে জেলখানা

www.pathagar.com

থেকে। স্বল্পশিক্ষিত এইসব কারা-রক্ষীরা প্রায়ই গোলমাল করে ফেলে। একটা আনতে আর একটা নিয়ে আসে। প্রায়ই গোলযোগের সূত্রপাত হয়। জরুরি ভিত্তিতে ঔষধের প্রয়োজন হলেও কখন কবে জেলখানার ব্যূহ থেকে মিয়াসাব ওষুধ নিয়ে উপস্থিত হতে পারবে সেটা কারো পক্ষেই সঠিক অনুমান সম্ভব নয়। জেল কর্তৃপক্ষের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে রোগ নিরাময় হবে, এটা আশা করা সমীচীন নয়।

চিকিৎসা বিভ্রাটের চূড়ান্ত যদি কোথাও প্রত্যক্ষ করতে হয়, সেটা এই হাসপাতালের প্রিজন সেলে। সকল সংজ্ঞাতেই আমরা ভিআইপি। আমাদের বিষয়েও যে চড়কি খেলা দেখেছি, সাধারণ কয়েদিদের ভাগ্যে যে চরম দুর্ভোগ ঘটে থাকে তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। জেলের সুপার, জেলর বা অন্য কর্তারা পারতপক্ষে এদিকটায় পা মাড়ায় না। কখনও পরিদর্শনে এলে এমন সময় বেছে নেয় যখন আমরা লক-আপে ঘুমিয়ে। কোন অভিযোগ অনুযোগ করতে পারি না।

জেলখানায় আমাদেরকে ধোপা, নাপিত, খবরের কাগজ, কাজের লোক দেওয়ার বিধান রয়েছে। এখানে কিছুই নেই। নিজেকে কাপড় কাঁচতে হবে, বিছানা করতে হবে, থালা-বাটি ধুতে হবে। সমস্ত কাজ নিজেদের হাতে করতে হবে। রোগী হয়েছ তো কি হয়েছে? বয়স বৃদ্ধির ফলে এসব কাজের অযোগ্য হয়েছ তো কি করা যাবে? নিজেদেরকেই সব করতে হবে। সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন অবিবেচ্য। একদিন অনেক ঝামেলা করে সুপারকে ধরা গেল। ফালতু দেওয়ার কথা বললাম।

সে জবাব দিল, জেলের বাইরে কয়েদি পাঠানো অবৈধ।

বলি, এটা তো জেলেরই অংশ। এখানে কয়েদিরাই রোগী। জেল কোডের নিয়ম অনুসরণ করুন।

সে সম্মত হয় না। সুবিধামতো এটা কখনও হাসপাতাল, আবার আমাদেরকে বিধি-নিষেধের আওতায় ফেলে ছোট্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখার বেলায় এটা প্রিজন সেল।

দু'দিক থেকেই তারা সুবিধা ভোগ করবে। আমরা সবদিক থেকেই থাকব অসুবিধায়।

সুবিধা একটাই, নগদ নারায়নের বদৌলতে ইচ্ছা করলে প্রতিদিন অনানুষ্ঠানিক ইন্টারভিউর ব্যবস্থা করা যায়। টাকা ফেললে সবরকম খাবার-দাবার এমন কি বাড়ির রান্নাও সেবন করা যায়। আমার এসব মনঃপূত ছিল না। দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন নয়। প্রতি আনঅফিসিয়াল দেখায় দু' শ' টাকা হাতে তুলে দিলে ওরা বেজায় খুশি। এই ওপেন সিক্রেট কারবার করতে ওদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। সকলে মিলে সারা সপ্তাহের আয় ওরা ভোগ করে নেয়। এখানে ডিউটি পড়লে ওরা বাড়তি আয়ের আশায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সুযোগ পেলেই এ ধরনের ইন্টারভিউর প্রতি ওদের আগ্রহের অন্ত নেই। এসবি, মেট্রোপুলিশ এবং বিশেষ করে কারারক্ষীরা এ সময়ে ফসল তোলার জন্য অতিশয় উদগ্রীব।

বিএনপি'র এক ডাঙ্গর নেতা একবার ওদের সবাইকে হাত করে এক রাতে তার স্ত্রীকে রেখে দিয়েছিল। প্রিজন সেলে দুটি মাত্র কেবিন। প্রতিটিতে দুটি শয্যা। সে রাতে সহযাত্রী পাশের কামরায় অবস্থান নিয়ে দীর্ঘদিন পর প্রায় যুবক সেই নেতাকে স্ত্রীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমা যাপনের সুযোগ করে দেয়।

বিষয়টি প্রকাশ হয়ে গেলে, কারারক্ষী এবং অন্যান্যরা একবাক্যে সাফাই দিতে থাকে, রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়েছিল। ডাক্তার-নার্স প্রভৃতির ডামাডোলে কী করে তার স্ত্রী স্বামীর শয্যাপ্পার্শ্বে রয়ে যায় তারা বুঝে উঠতে পারেনি।

বজ্র আঁটুনির ফসকা গেঁড়ো। দায়িত্ব নির্দিষ্ট করতে গেলে কান টানলে মাথাও চলে আসবে। অগত্যা বিষয়টি হজম করে যাওয়াই সুবিবেচনাপ্রসূত হয়।

বিলেতী ডিগ্রীপ্রাপ্ত ভদ্রলোক বিএনপি পরিত্যাগ করে জাতীয় পার্টিতে এসে মন্ত্রী হয়েছিল। সময়ে পুনরায় বিএনপিতে প্রত্যাবর্তন করেছে। সুযোগ-সন্ধানী মানুষ। সেটা সহজেই বুঝা যায়। আমরা যেখানে একটা দেখার ব্যবস্থা করতে ইতস্তত করি, সেখানে সে স্ত্রীর সঙ্গে নিশিযাপনের ব্যবস্থা করতেও পিছ পা হয় না।

সরকার আমাদেরকে হাসপাতালে রেখে শান্তি পাচ্ছে না। কিনা কি করে ফেলি! তাছাড়া তাদের ভাষায় হাসপাতালের শয্যায় আয়েস করে শুয়ে থাকলে কারানির্যাতন ভোগ হল কোথায়! তারা অস্থির হয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করে। তারা তো একপায়ে দণ্ডায়মান। পাঁচ মাস পর আমাদেরকে পুনরায় জেলখানায় ফেরত প্রেরণ করা হয়।

এই প্রিজন সেলে বসেই আমি আমার জীবনের সবচাইতে বড় আঘাত পাই। আমার পিতৃতুল্য অগ্রজ, আমার জীবনের আলোরদিশারী, আমার প্রিয় বড়দা শাহ্ আলম সাহেব শেষ রমজানের দিন ইহলোক ত্যাগ করেন। আমার শ্রেষ্ঠ বান্ধব চলে গেলেন। কিন্তু নিয়ম থাকার পরও একটি ঘণ্টার জন্যও আমাকে প্যারল প্রদান করা হয় না। আমি তাঁর শেষযাত্রায় শরিক হতে পারিনি। অমানবিক নিষ্ঠুরতার এর চাইতে নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ আর কী হতে পারে!

পিজিতে অবস্থানের দিনগুলো আমাদের কিছুটা সহনীয় হয়েছিল মঞ্জুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন নুরুল হুদা হিরুর সেখানে পূর্ব থেকে অবস্থানের কারণে। আর এক হত্যা মামলায় সেও অভিযুক্ত। সারনিয়াবাত হত্যা মামলায় তাকে আসামী করা হয়েছে। অনেক প্রতিকূলতার মাঝে হিরুর

www.pathagar.com

সতত সহায়ক উপস্থিতির ফলেই আমরা সেখানে কিছুটা স্বস্তি খুঁজে পেয়েছিলাম। তাকে পুনরায় একা রেখে আমরা পুরনো ঠিকানায় ফিরে আসি।

ছাব্বিশ সেলের উপাখ্যান

এখানেই শেষ করতে চাই। অনেক রথি-মহারথিদের সান্নিধ্যে সেই ছাত্রাবস্থা থেকে এখানে অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। স্কুল জীবনে প্রথম কারাগারে প্রবেশ করে আজ জীবনসায়াহ্নে এসে পৌঁছেছি। কবে এখান থেকে মুক্তি পাব জানি না। এখান থেকেই মহামুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে কিনা তাও জানি না। সবকিছুর জন্যই পরম করুণাময় সর্বনিয়ন্তার উপর নির্ভর করে আছি।

যতবার জেলে এসেছি, প্রতিবারই উপলব্ধি করেছি, এই পুরনো এলাকায় খিঞ্জি পরিবেশে এতবড় কারাগার মানায় না।

কারাগারের দক্ষিণ প্রান্তের রিজার্ভ পুলিশের লাল দালানটি এখন আমাদের বিচারালয়। আমাদেরকে আনা-নেওয়ার সময় সমগ্র এলাকা বন্ধ হয়ে যায়। এমনিতেই নিরেট যানজটে পুরনো ঢাকা বিপর্যস্ত। তার উপর আমাদেরকে কেন্দ্র করে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ও আনুষঙ্গিক আয়োজনে সমগ্র এলাকা বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের দুর্গতির সীমা থাকে না।

ইতিপূর্বেও বহুবার ভেবেছি, জেলখানা স্থানান্তরিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে সম্ভবত তেমন করে আর পশ্চাতে ফিরে তাকাইনি। তা না-হলে যখন ক্ষমতায় ছিলাম, তখন এটার একটা বিহিত করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এটা সবসময়ই লক্ষ্য করেছি, জেলে অবস্থানের সময় যে ইচ্ছা বা সঙ্কল্প সর্বক্ষণ উদিত হয়, জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বহির্জগতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা মন থেকে উবে যায়।

খুব কম রাষ্ট্রনায়ক বা সরকার প্রধানই এসেছে যারা একসময় কারাগারে অবস্থন করে যায়নি। দু-দুটি পরাধীনতার কারণে সেটা ছিল অনেকটা স্বাভাবিক। সকলেই জেল খেটে গেছে, কিন্তু এর সংস্কার বা উন্নয়নের দিকে তেমন দৃষ্টিপাত করেনি।

'৯২ সালে সরকার পদত্যাগের পর যখন প্রথম আমি এখানে এলাম এবং কারাবিদ্রোহের কবলে পতিত হলাম, তখন কয়েদিদের অনেকেই আমার উপর ক্রোধান্বিত ছিল এই কারণে যে, বহুবার জেল খেটেও জেলের জন্য এই লোক কিছুই করেনি। কথাটায় কিছু সত্যতা রয়েছে।

তাই সেদিন তাদের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আমিও সতেরো দিন প্রায় অনশনে ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে তাদের কেউ-কেউ আমাকে

www.pathagar.com

হত্যার উদ্যোগ নিলেও আমি তাদেরকে রেখে শেরাটনের খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলাম। আর তাতেই তাদের চোখ খুলে গিয়েছিল। তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল যে, তারা যাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে চায়, সে আদৌ ততটা মন্দ লোক নয়। ভ্রান্ত ধারণার অবসানে ভক্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। ওরাই তখন পালা করে আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সেল থেকে বের হলে বহু কয়েদির সশ্রদ্ধ অভিবাদন তখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে।

আমি সরকারি কর্মকর্তাদেরকে বলেছিলাম, জেলের সকলে অনশন করবে আর আমি শেরাটনের খাবার খাব এত অমানুষ হয়ে উঠতে পারিনি। আপনারা যদি আমার কথা বিবেচনা করেন, তা হলে যত শীঘ্র সম্ভব কয়েদিদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে জেলে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনুন।

কয়েদিরা সে কথা শুনতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল। পরে তাদেরকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছিলাম, আমি এবং আমার মতো আরও পুরনো জেলবার্ড কেউ কেউ কারা সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম। কিন্তু তা বাস্তবায়ীত করা সম্ভব হয়নি।

এরশাদ সাহেব অনেক কাজ করেছেন, দেশের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন এ কথা স্বীকার না-করলে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু কারাগারের উন্নয়ন ও সংস্কারের বিষয় কিছু করেননি। যখনই এ সম্বন্ধে কথা উঠেছে, বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের প্রশ্ন উঠেছে এবং আমরা সেই সুযোগে সংস্কারের কথা জোর দিয়ে উত্থাপন করেছি, তিনি কেন যেন এদিকটাতে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন না। বলতেন, আপনারা জেলখাটা মানুষ। ওসব নিয়ে আপনারা ভাবুন। আমার কাজের অন্ত নেই।

বলেছি, স্যার, কিছুই বলা যায় না। আজ যে ক্ষমতায়, কাল সে রাজপথে। রাজনীতি করছেন, এমনকি জেলেও যেতে হতে পারে।

তিনি হেসে অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করতেন। সেই জেলখানাতেই তাকে জীবনের অর্ধযুগ একসঙ্গে কাটিয়ে যেতে হয়েছে। এখন তাঁর ধারণার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়েছে।

একবার ক্যাবিনেটে বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এখান থেকে সরিয়ে কাশীপুরে স্থানান্তরের পরিকল্পনা আলোচিত হয়।

আমি উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম। প্রস্তাব করেছিলাম, একটি কারা-কমিশন গঠন করা হোক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবেন তার প্রধান। প্রটোকল ভঙ করে আমি সদস্য হতে প্রস্তুত। জেলখানা সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলার আছে।

সেদিন নিবেদন করেছিলাম সুস্থ মানুষের বাসোপযোগী আধুনিক কারাগারের পত্তন দিতে হবে। শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং তার মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে একজন সংশোধিত মানুষ হিসাবে সমাজে উপহার দেওয়ার উদ্দেশ নিয়ে কারা-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

আধুনিক সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যথা, লাইট, ফ্যান, বিছানা, রেডিও, টিভি, মনুষ্য উপযোগী খাদ্য, পথ্য, চিকিৎসা এবং খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে উপার্জনমুখী জীবিকার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। এগুলো কেবল গালভরা বুলি নয়, বাস্তবে প্রতিফলিত করাও সম্ভব। যেভাবে সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্য বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে রাখা হয়, সেভাবেই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে কয়েদিদেরকেও রাখা সম্ভব এবং তাদের থেকে উৎপাদনমুখী প্রত্যাশাও অমূলক নয়। কারারক্ষীদের চাকরির মান অন্যান্য পুলিশদের সমপর্যায়ে নিয়ে আসা বিধেয় হবে। চাকরির ক্ষেত্রে তারা যেন কোন প্রকারের হীনম্মন্যতায় না ভোগে।

এরশাদ সাহেব সব শুনে বলেছিলেন, হ্যাঁ, সেভাবেই নতুন কারাগার নির্মাণ করতে হবে। শুধু পুরুষদের জন্য নয়, পাশাপাশি শিশু এবং মহিলাদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু তাঁর আশা এবং ইচ্ছা মনেই রয়ে গেল। বাস্তবায়িত হবার সময় আর হল না। তার পূর্বেই বিদায়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে।

বিবেকের কাছে দায়ী থেকে যাই। সময় থাকতে কেন উদ্যোগ নেইনি, এই অনুতাপ রাখার স্থান নেই। সুদীর্ঘ কালের লালিত ঋণ পরিশোধের সুযোগ নিতে সক্ষম হই না।

ভাবি, এই একটি ক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতা যদি অন্য কেউ এসে স্বার্থকতায় পর্যবসিত করত, আমাদের চাইতে বেশি সন্তুষ্ট সেদিন আর কেউ হত না।

কাগজে পড়লাম, বর্তমান সরকার পৃথক মহিলা জেল নির্মাণের চিন্তা ভাবনা করছে। সরকার প্রধান মহিলা। বিগত দুই মেয়াদেই বাংলাদেশে প্রমীলা শাসন চলছে। কিছুই বলা যায় না। এরশাদ সাহেবের বেলায় যেটা সত্যে পরিণত হয়েছিল সেটা আর কারো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না-একথা হলপ করে বলা যায় না। জলে নামলে কাপড় ভিজবে না, এটা কি করে হয়! বহু নির্দোষ মানুষকে ক্ষমতার মদমত্ত হয়ে চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। একবার ভেবে দেখেছে কি তাদের ভাগ্যেও কখনও সেটা ঘটতে পারে! সময়ে সাবধান হয়ে এ পদক্ষেপ নিয়ে থাকলে মন্দের ভালো।

অবশ্য এরা যত গর্জে তত বর্ষে না। কথার ফুলঝুড়ি ছড়াতে, পরিকল্পনার আশার বাণী শোনাতে এদের তুলনা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ঘোষণার বাগাড়ম্বরেই এদের প্রতিশ্রুতির পরিসমাপ্তি ঘটে। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন খুবই সহজ। দ্বারোদ্ঘাটন অনেক কঠিন। পরিকল্পনার পরী একসময় আকাশে উড়ে যায়, কল্পনা ইথারে ঘুরে বেড়ায়।

জেলখানার পেছনের অংশের দেওয়াল খানিকটা ভেঙে একটা সংযোগ রাস্তা বের করে সেটি উদ্বোধন করতে এসে উদ্ধত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সেকি তর্জন-

www.pathagar.com

গর্জন। জেলখানা স্থানান্তরের দাবি বহু দিনের। পুরাতন ঢাকাবাসীর এটা অনেকদিনের আকুতি। সেসব কথায় না-গিয়ে, ঢাকার যানজটের সুরাহার কথা বিবেচনায় না-নিয়ে জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ও জয় হাসিনা সম্বলিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদম্ভে ঘোষণা দেয়, বঙ্গবন্ধু এখানে জেল খেটেছে, আমার পিতাকে এখানে হত্যা করা হয়েছে, কাজেই জেলখানা এখানে রাখব না।

আওয়ামী স্টাইলের ঘোষণা শুনে আমরা হাসি। জানি না-সর্ব শক্তিমান তখন কি ভাবছেন!

অবশ্য কোথাও যদি একটা তৈরি করা জিনিস ওরা দেখতে পেয়ে যায় তা হলে আর কথা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার স্বত্ব স্বামীত্ব দাবি করে তৎক্ষণাত পিতার নামে, না-হয় মায়ের নামে, নিদেনপক্ষে ভাই বা ভাতৃবধূর নামে নামকরণ করে ফেলতে কালক্ষেপণ করে না।

পিজি হাসপাতালের মতোই যমুনা সেতুরও গালভরা নাম দিয়ে বগল বাজাচ্ছে। যমুনা সেতুর পশ্চাতে যে মানুষটির সবচাইতে বেশি অবদান তিনি হলেন যমুনার ওপারের মানুষ এরশাদ সাহেব। বিএনপি সরকারের আমলে সেতুর উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল নাম হচ্ছে কন্যার পিতার। 'যার বিয়া তার খবর নাই, পাড়াপড়শীর ঘুম নাই।' তাই দেখতে পাই যমুনা সেতু উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে উপবিষ্ট। বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে কেঁদে বুক ভাসিয়া দেয় তার ঐকমত্যের যোগাযোগমন্ত্রী। তার চোখের জলে যমুনার পানি বুঝি বেড়ে যায়! পানি চুক্তির ব্যর্থতা যদি তার চোখের পানিতে কিছুটা সুরাহা হয়!

কাঁদুক, ওদের কাঁদতে দেওয়া যাক। যোগাযোগমন্ত্রী কাঁদুক, প্রধানমন্ত্রী কাঁদুক, মন্ত্রিসভার সকল সদস্য মিলে হাপুস নয়নে কাঁদুক, আপত্তি নেই। কেঁদে কেঁদেই তো ক্ষমতায় আরোহণ করেছে, কেঁদে কেঁদেই একদিন বিদায় নিতে হবে!

জনগণকে না কাঁদালেই হল। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর উচ্চাঙ্গের বোলচালে ভবি আর ভুলবার নয়। বাপ-চাচারা গেল তল, সেদিনের উচ্চিংড়েটা বলে কত জল!

দেখা যাক, এদের জেনানা কারাগার কবে নির্মিত হয়ে বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। মহিলা প্রধানমন্ত্রীর আমলে তার এবং তার সমগোত্রীয়দের ভবিষ্যত চিন্তা করে যদি একটা প্রমীলা কারাগারও তৈরি করা না-যায় তা হলে আমাদের মতোই অনুতাপের আর পরিসীমা থাকবে না। সেন্ট্রাল জেলের মহিলা ওয়ার্ডেই স্থান লাভ করে তখন সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ছাব্বিশ সেলে বসে ছাব্বিশ দ্বিগুণে বায়ান্ন রকমের ভাবনা উদয় হয়। কিন্তু আকাশ-কুসুম ভেবে লাভ নেই।

পবিত্র কোরানে এসেছে, "ওয়ানতাখিরু ইন্না মুনতাখিরুন"—আর তোমরাও অপেক্ষা করতে থাক, নিশ্চয়ই আমরাও অপেক্ষারত আছি।

॥ ছাব্বিশ সেলে আর নয় ॥

www.pathagar.com

প্রতিভা

ISBN 984-776-179-5